বিলুপ্ত রাজধানী

উৎপল চক্রবর্তী

অমরভারতী
৮সি ট্যামার লেন, কলকাতা—৭০০ ০০৯

প্রকাশক
শ্রীঅধীরচন্দ্র পাল
অমর ভারতী
৮সি ট্যামার লেন,
কলকাতা—৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল, ১৯৯০

প্রচ্ছদ
উৎপল চক্রবর্তী

অলংকরণ
উৎপল চক্রবর্তী, নীহার ঘোষ, রাজারাম, শ্রীমহাদেব,
অনিন্দ্য সিংহ, পূর্ণেন্দু মন্ডল, টানটু পান, রমা সাহা

অক্ষর বিন্যাস
ডিজাইনার
৮সি ট্যামার লেন,
কলকাতা—৭০০ ০০৯

মুদ্রণ
ইন্দ্রলেখা প্রেস
১৬ হেমেন্দ্র লেন স্ট্রীট,
কলকাতা—৭০০ ০০৯

উৎসর্গ

প্রয়াত

বাবা অমলচন্দ্র চক্রবর্তী

মা সবিতা চক্রবর্তী

বোন সুনন্দা ও সুছন্দা

ভাই সুদীপ্ত-র

স্মৃতির উদ্দেশে—

ভূমিকা

'খ্যাতি বা পুরস্কার কামনার ঊর্ধ্বে যাঁরা স্বেচ্ছায় উভয় বাংলার গ্রাম-গ্রামান্তরে চিন্ময় বঙ্গের মহৈশ্বর্য সন্ধানে ব্যাপৃত, সেই অকীর্তিত, আদর্শবাদী, দেশপ্রেমী গবেষকদের উদ্দেশে'—এই ক'টি আন্তরিক কথা সবিনয়ে লিখেছিলাম 'দেখা হয় নাই' বইটির উৎসর্গপত্রে। তারপর বেশ কিছুকাল গত হয়েছে। কিন্তু এই অনাদৃত সংস্কৃতি-সন্ধানীদের কথা তখন যে-প্রেরণায় বেশি করে মনে পড়ছিল, তা আজও আমার চিন্তাক্ষেত্রে অম্লান।

এই ভূমিকা রচনার সেটাই প্রধান কৈফিয়ৎ, কেননা আমার ধারণায় বর্তমান গ্রন্থকার সেই অবহেলিত দলেরই একজন।

বাংলার লুপ্ত রাজধানীগুলির সামগ্রিক বিবরণ অদ্যাবধি একত্রে প্রকাশিত হয়নি। অথচ এবকম একটি গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। একথা অবশ্য সত্য যে, ইতিহাস রচনাব আধুনিক পদ্ধতিতে রাজারাজড়াব কাহিনির থেকে জনসাধারণের জীবনযাত্রার প্রণালীই বেশি গুরুত্ব পেয়ে থাকে। কিন্তু সেজন্য প্রথমটি একেবারে অপাঙ্‌ক্তেয় এমন কথা কেউ বলবেন না, কেননা সেখানেও ঐতিহাসিক উপাদানের অভাব নেই।

দীর্ঘকালের একনিষ্ঠ অধ্যবসায় এ পরিশ্রমে বাংলার লুপ্ত রাজধানীগুলির বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ করে এবং বর্তমান গ্রন্থে এক চিত্তাকর্ষক আঙ্গিকে তা পরিবেশন করে শ্রীযুক্ত উৎপল চক্রবর্তী বঙ্গসংস্কৃতি-প্রেমীমাত্রেরই অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হলেন।

আশা করি, তাঁর আহৃত তথ্যাবলী উত্তরকালে বাঙালীর পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার সময় যথাযথ মর্যাদা পাবে।

আমি সুখী হব, যদি অনুরূপ বিভিন্ন প্রয়াসে তিনি আজীবন ব্রতী থাকেন। চিত্রশিল্পী ও কবি হিসাবে ইতঃপূর্বেই তিনি যে কৃতিত্বের অধিকারী তা এ বিষয়ে তাঁর সহায়ক হবে সন্দেহ নেই।

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

২/২, একডালিয়া রোড,

কলকাতা-৭০০ ০১৯

বিষয়-সূচি

প্রাচীন বাংলা
জনপদ বিভাগ

চম্পা
গঙ্গা
অঙ্গ
গৌড়
কর্ণসবর্ণ
ময়ূরাক্ষী
সিদ্ধল
কেন্দুবিল্ব
দামোদর
রূপনারায়ণ
রাঢ়
যমুনা
উপবঙ্গ
তাম্রলিপ্তি
কপিশা
সুবর্ণরেখা
প্রাচীন
রাঢ়া
পূর্ব সাগর

প্রাচীন শহর
পাণ্ডুয়া
উঃ
সুলতান দীঘি
আদিনা মসজিদ
কোতওয়ালি
প্রাচীন মালদা
জামি মসজিদ
নিমাসরাই রে. স্টে.
মালদা রে. স্টে.
বাঁধ
প্রাচীন রেস রোড
আধুনিক রাস্তা
ফুটপাথ
মসজিদ
বড় জলাশয়
রেলপথ

BALLĀL BĀRĪ
OLD GANGES R
Causeway of Ghiās-ud-din
ANGREZĀB
(OR ENGLISH BA
MAHANANDA
Kamalā Bārī
MAKHDUM SHĀH
Sagar Dighi
Sadullahpur
Phulwari-Gate
Gangā Snān
Dharmpur
Guamālti
Patāl Chandi-Gate
Degaoh
Phulbārī
Piyāsbāri
Ramkel
Bara Sona Masjid
Kumbhir Pīr Dighi
Dākhil Gate
Firūz Minar
CITADEL PALACE
Chamkatti-Masjid
Belbārī-Madrasah
Qadam Rasūl
Chhota Sāgar Dighi
Tāntipārā Masjid
Lattan Masjid
Bridge
Kotwāli Gate
Mandīpūr
Balua Dighi
BHAGIRATI
Niāmat Ullah's Shrine
গৌড়
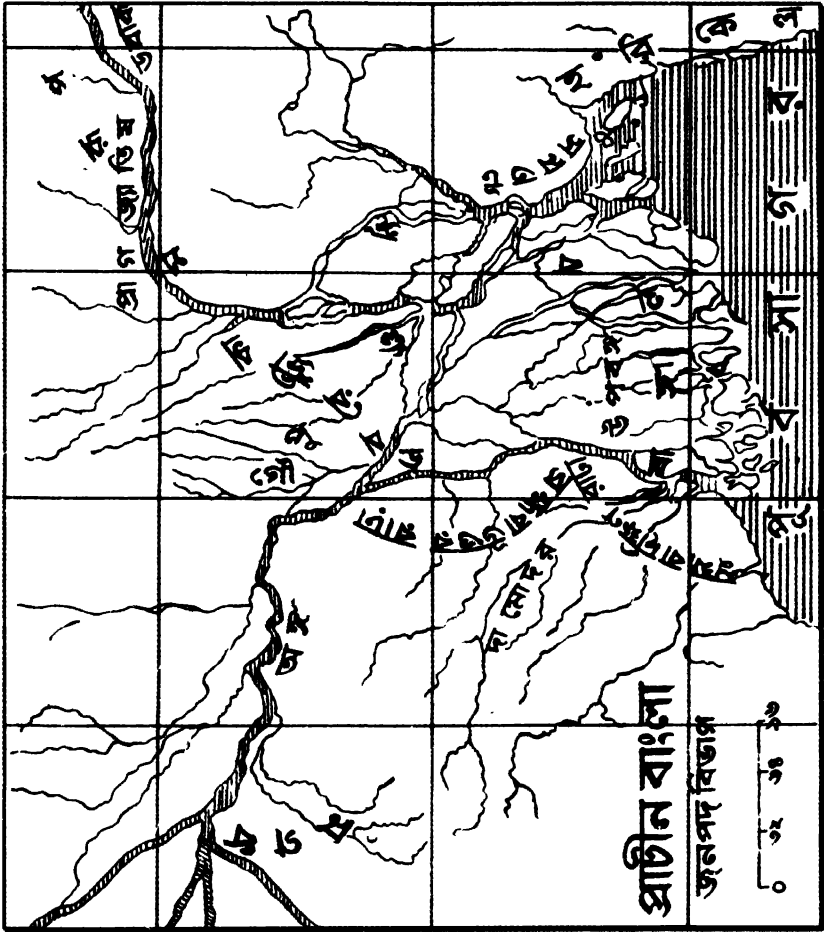
চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত ভাস্কর্য

চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত ভাস্কর্য

মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত ভাস্কর্য
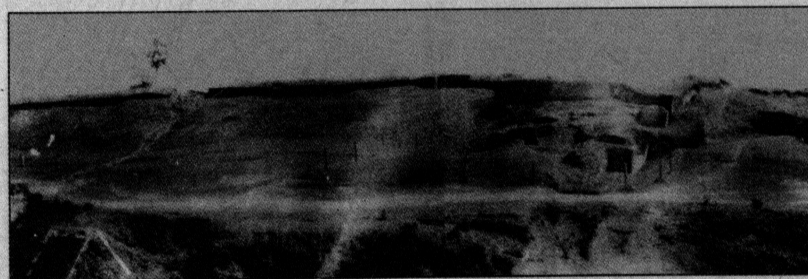
মহাস্থানগড়ের ধ্বংসাবশেষ, বগুড়া, বাংলাদেশ
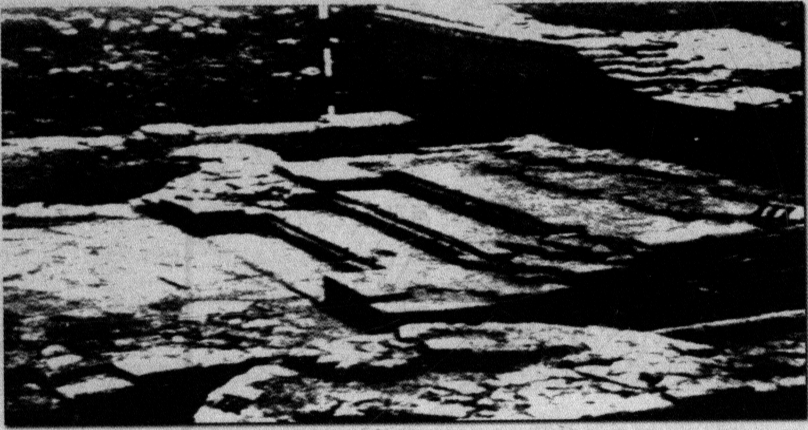
রক্তমৃত্তিকা বৌদ্ধ বিহারের সিঁড়ি (৫ম-৬ষ্ঠ শতাব্দী), কর্ণসুবর্ণ

মহিষমর্দিনী মূর্তি (৮ম শতাব্দী), কর্ণসুবর্ণ
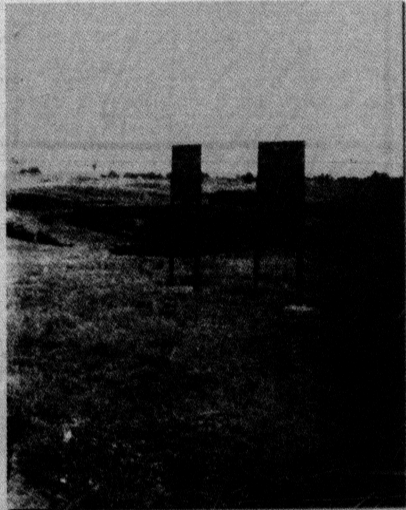
রাজবাড়ী ডাঙ্গা, কর্ণসুবর্ণ
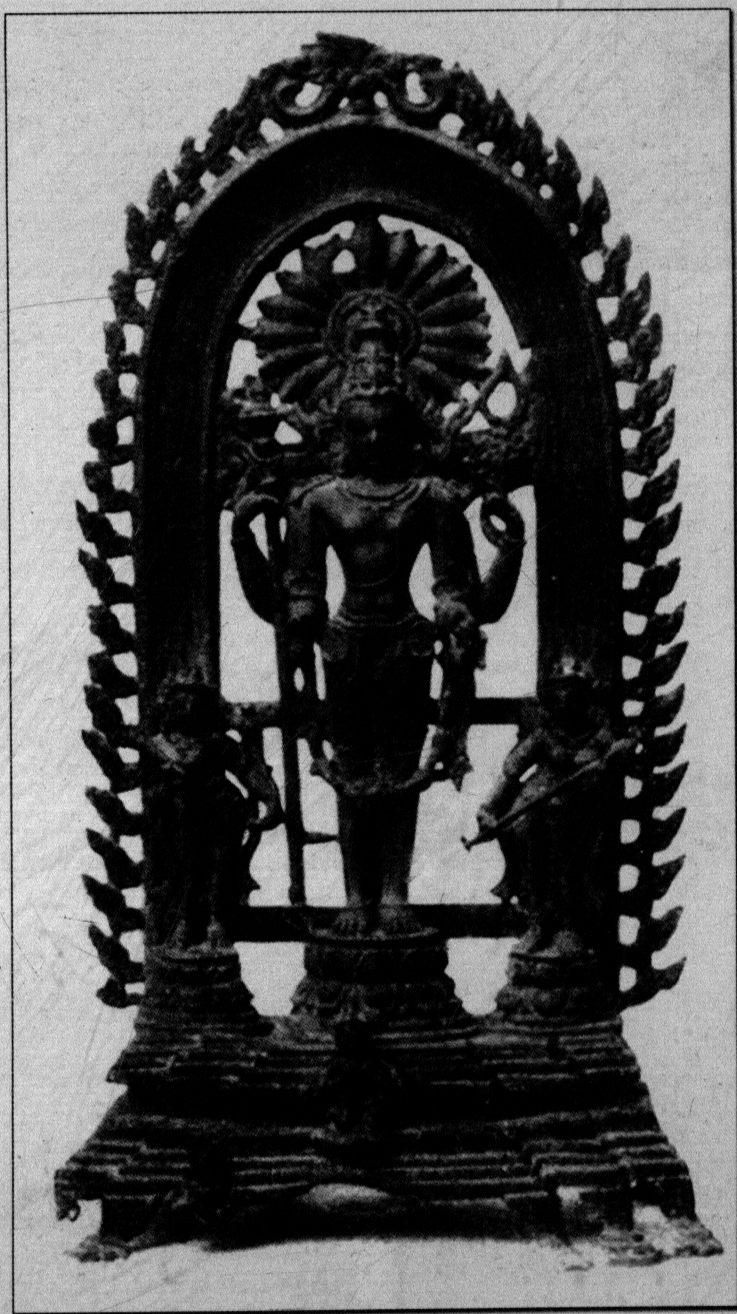
বেলআমলা গ্রামে প্রাপ্ত মূর্তি, দক্ষিণ দিনাজপুর

বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি, রাজসাহী
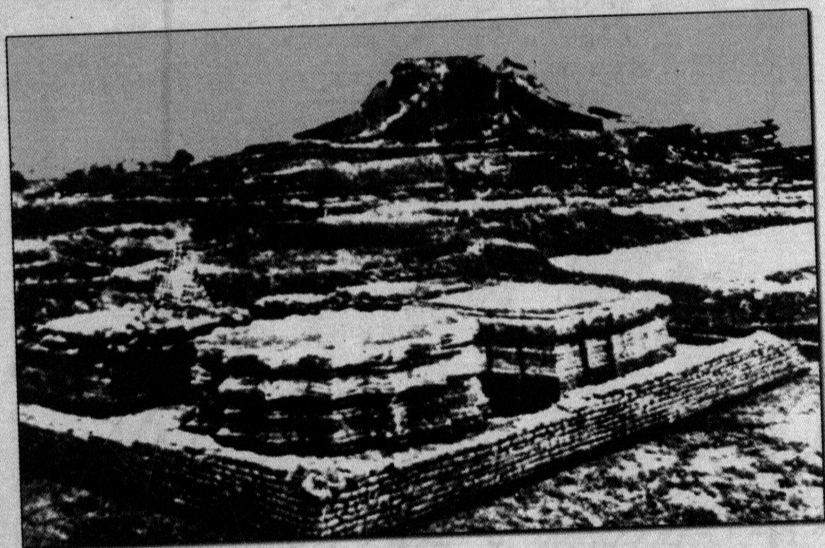
পাহাড়পুর মহাবিহারের ধ্বংসস্তূপ, বাংলাদেশ

নিমাইশাহের দরবার নিকটবর্তী পাদপীঠ

জীবৎকুন্ড, মহাস্থানগড়, বগুড়া

বাণগড়ের ধ্বংসাবশেষ; ১৯৩৪ থেকে ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত
বাণগড় খননকার্যে পাঁচটি প্রাচীন যুগের নিদর্শন পাওয়া যায়
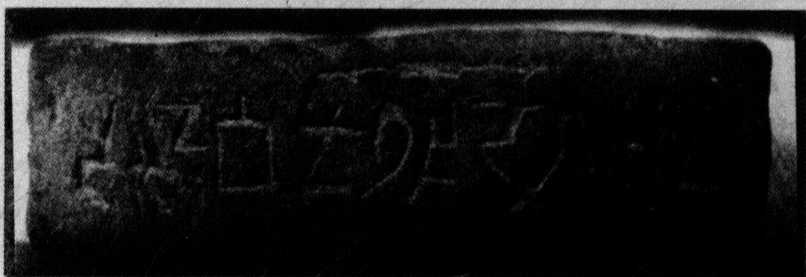
পাদপীঠে উৎকৃর্ণ ব্রাহ্মীলিপি (৬ষ্ঠ-৭ম শতাব্দী), মহীপাল

বৌদ্ধদেবী হারিতি (৮ম শতাব্দী), মহীপাল

প্রজ্ঞাপারমিতা (৮ম-১০ম শতাব্দী), মহীপাল
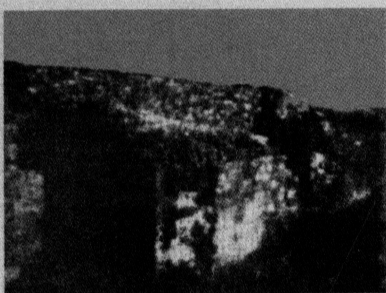
দেবীকোট, দিনাজপুর

আদিনার ডঙ্কা, পাণ্ডুয়া

একলাখি সমাধি-সৌধ, পাণ্ডুয়া
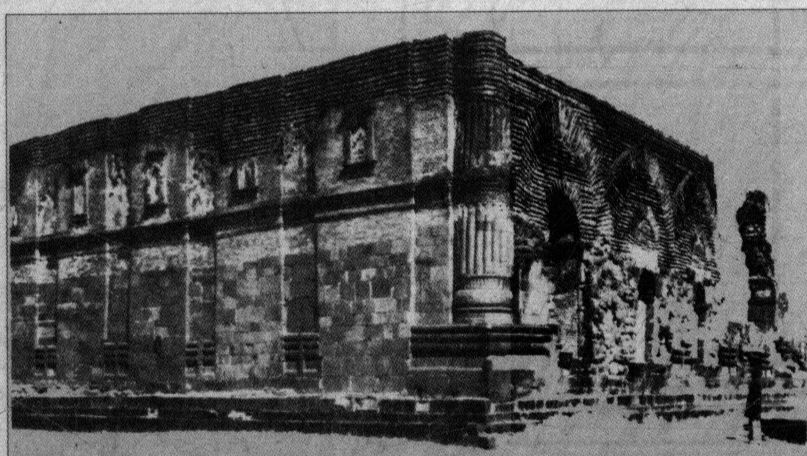
আদিনা মসজিদ, পাণ্ডুয়া

আদিনা মসজিদের ভাস্কর্য
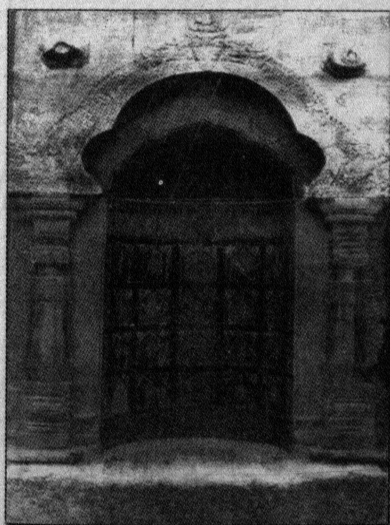
আদিনা মসজিদের মধ্যস্থ কারুকার্য

আদিনা মসজিদের বেদী
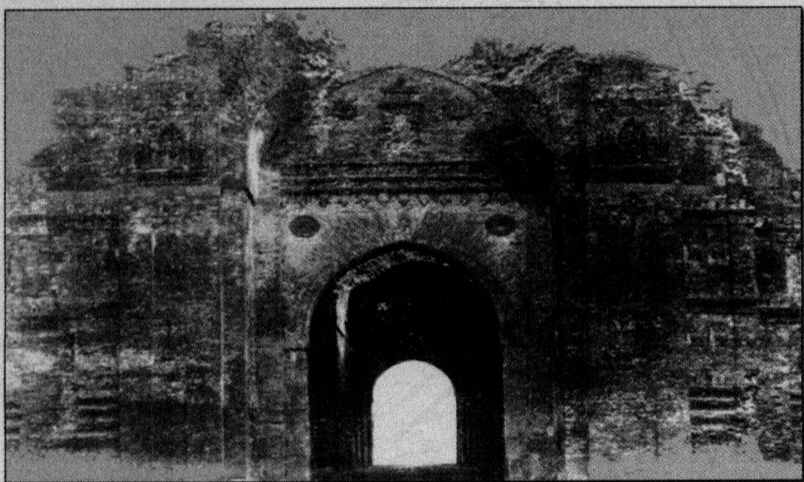
দাখিল দরওয়াজা, গৌড়
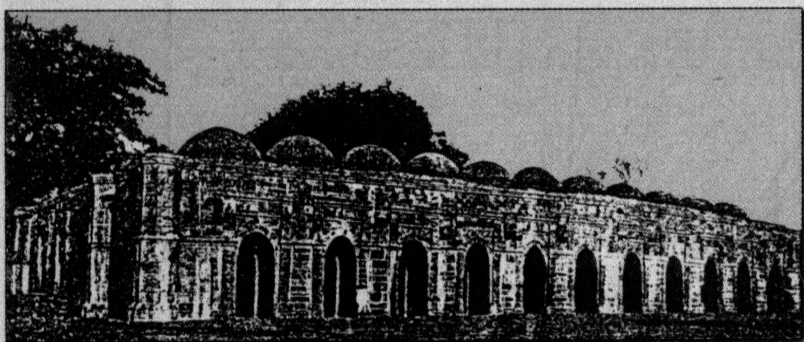
বড়ো সোনা মসজিদ, গৌড়

লুকোচুরি দরওয়াজা, গৌড়

খননের পর রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তর-চিত্র, গৌড়
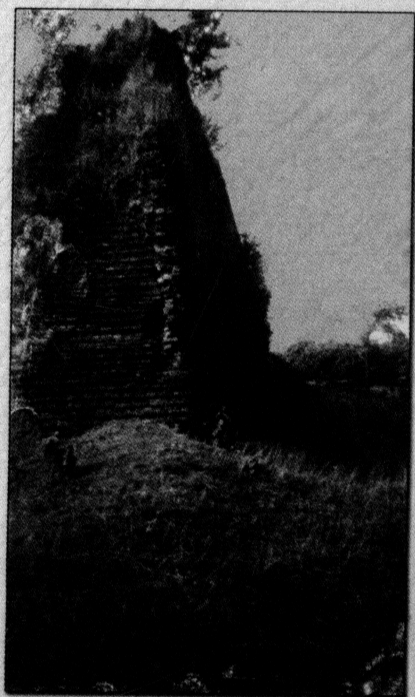
বাইশগজী প্রাচীর, গৌড়
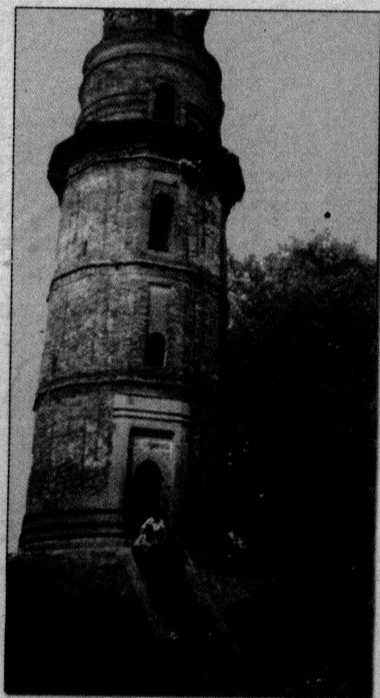
ফিরোজ মিনার, গৌড়
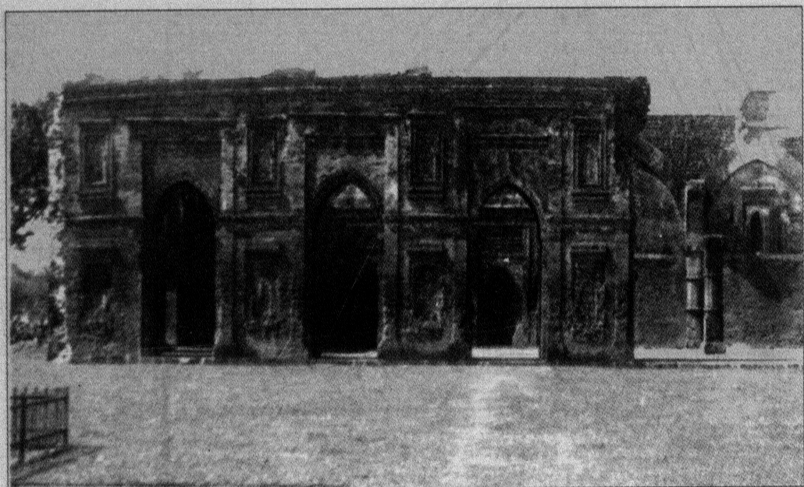
তাঁতিপাড়া মসজিদ, গৌড়
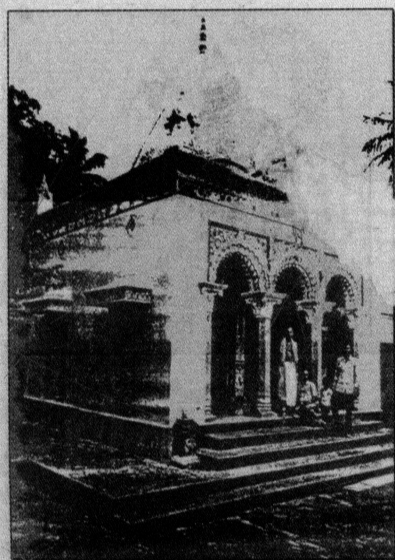
মদনমোহন মন্দির, গৌড়
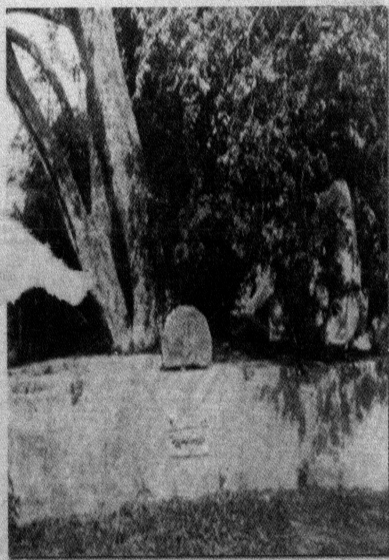
শ্রীচৈতন্যদেবের বিশ্রামস্থল, রামকেলি
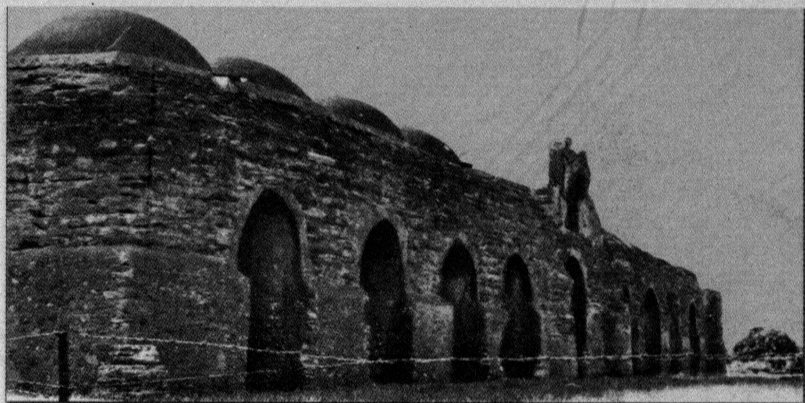
গুণমন্ত মসজিদ, গৌড়
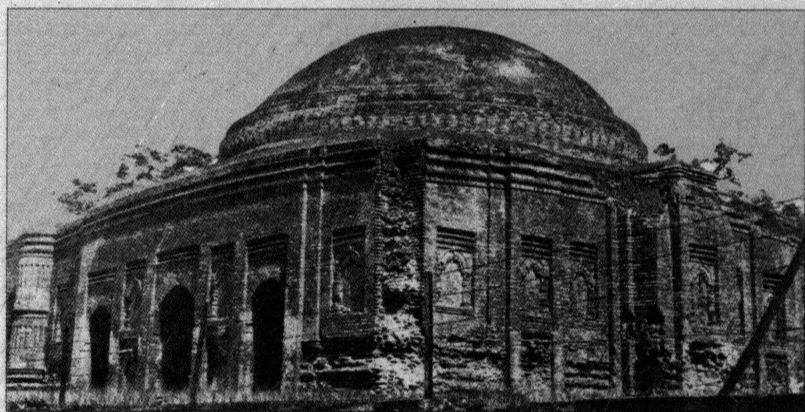
লোটন মসজিদ, গৌড়
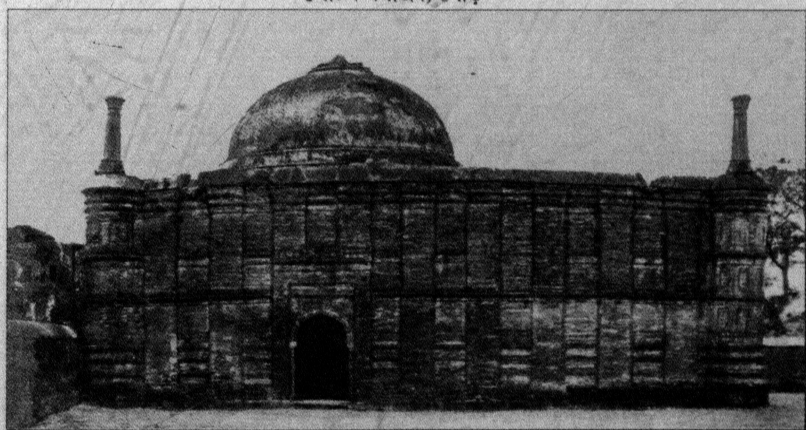
কদমরসুল মসজিদ, গৌড়
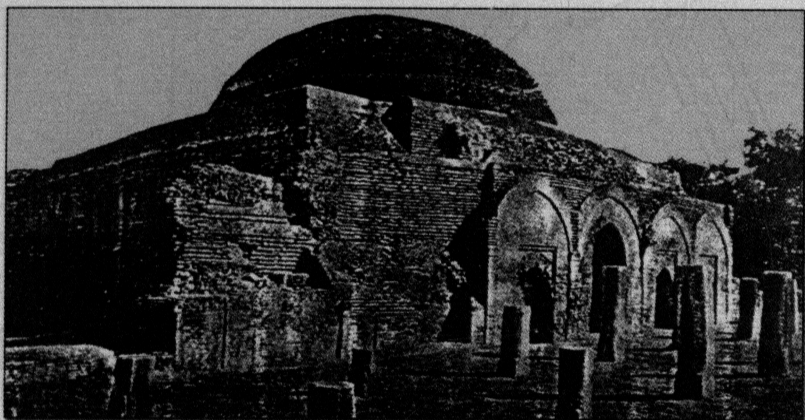
চিকা মসজিদ, গৌড়
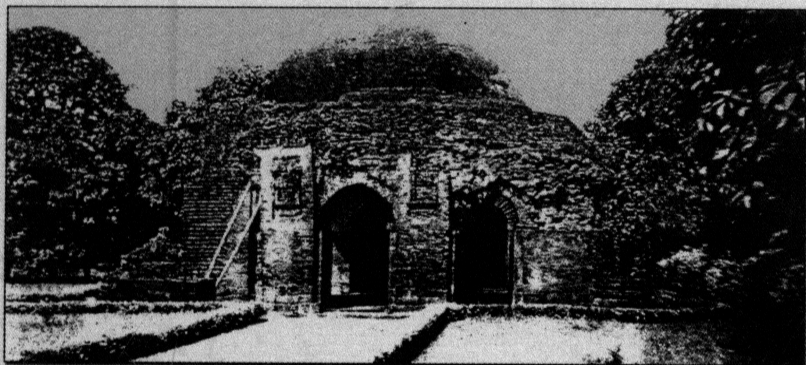
চামকাটি মসজিদ, গৌড়

গুমটি গেট, গৌড়
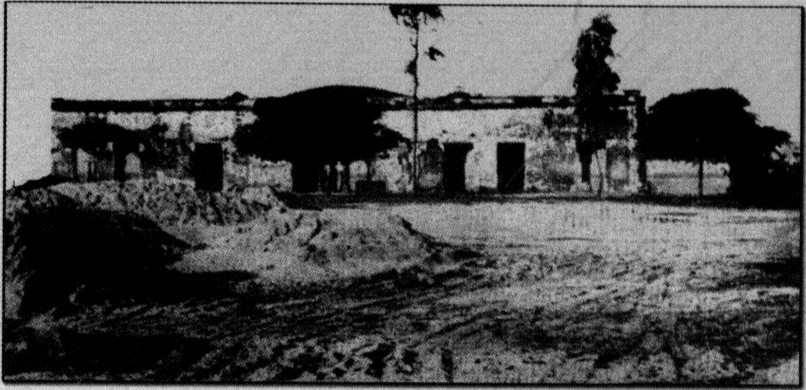
সিংহীদালান, রাজমহল

সিংহীদালানের অভ্যন্তরভাগ, রাজমহল
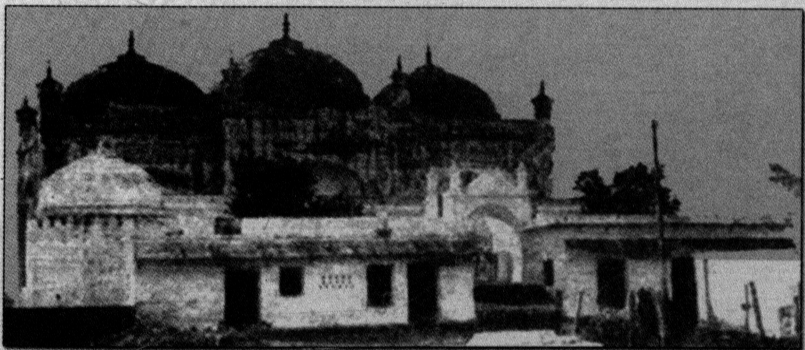
আকবরী মসজিদ, রাজমহল
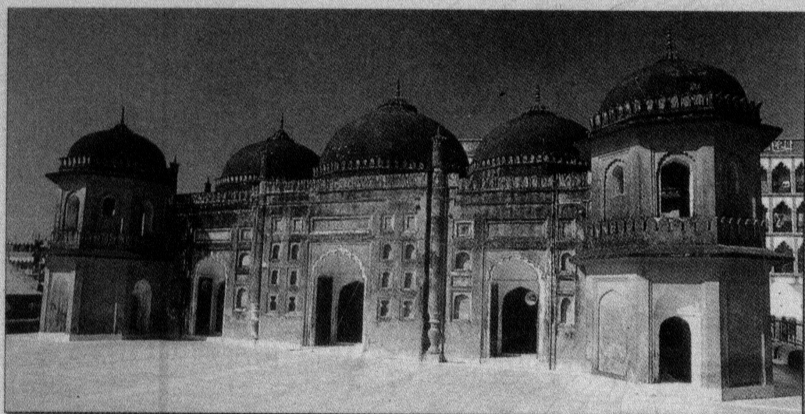
সাতগম্বুজ মসজিদ, ঢাকা

কাটরা মসজিদ, মুর্শিদাবাদ
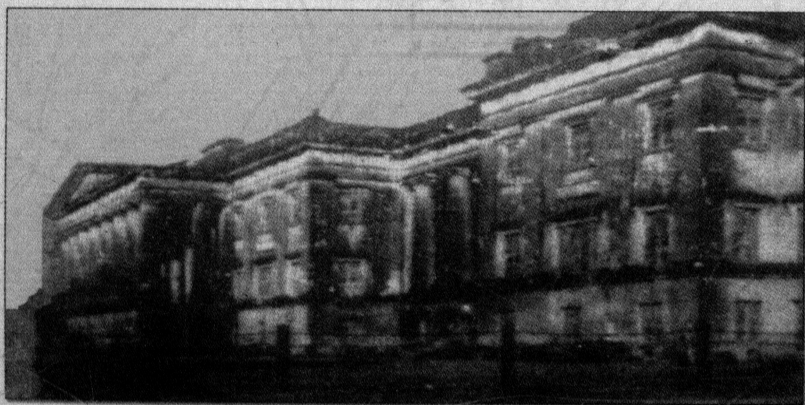
হাজারদুয়ারী, মুর্শিদাবাদ
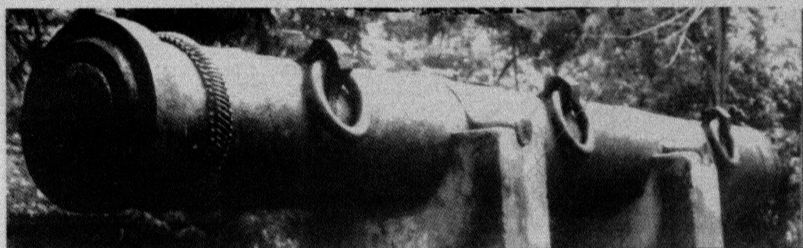
জাহানকোষা কামান, মুর্শিদাবাদ
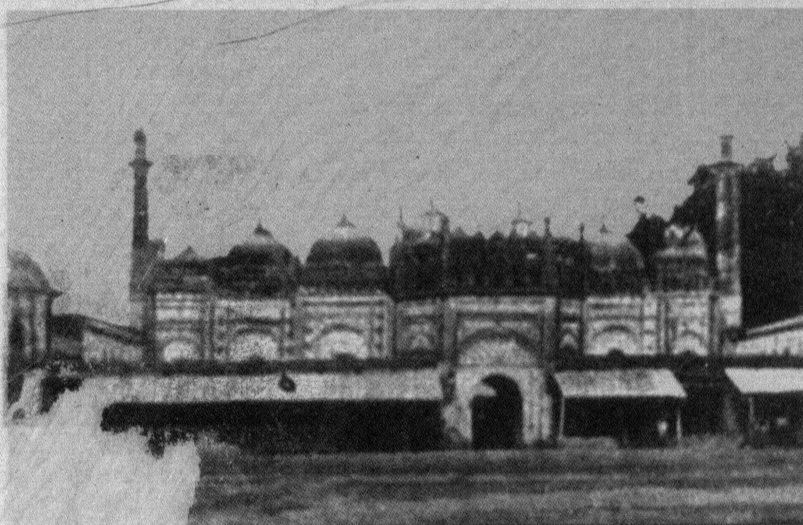
মোতিঝিল, মুর্শিদাবাদ

মীরমদনের সমাধি, ফরিদতলা, মুর্শিদাবাদ

শুশুনিয়া পাহাড়
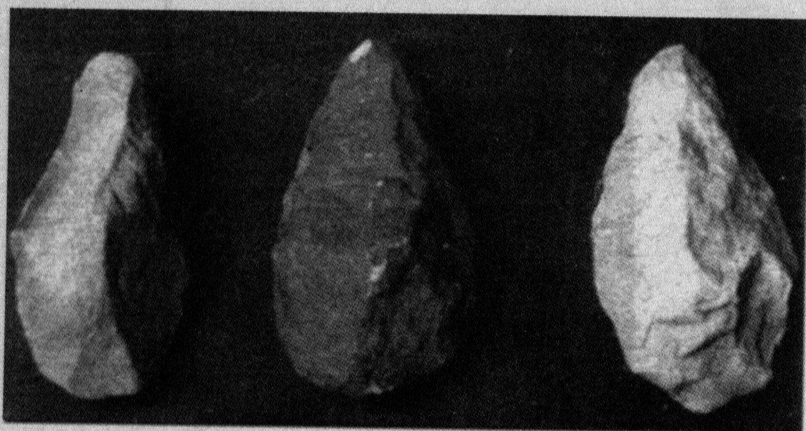
শুশুনিয়া পাহাড়ে প্রাপ্ত পাথরের অস্ত্র
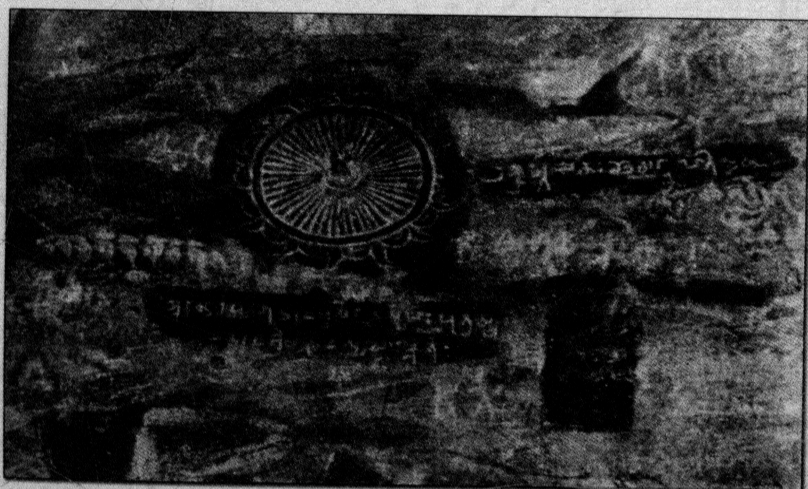
মহারাজ চন্দ্রবর্মার শিলালিপি, শুশুনিয়া
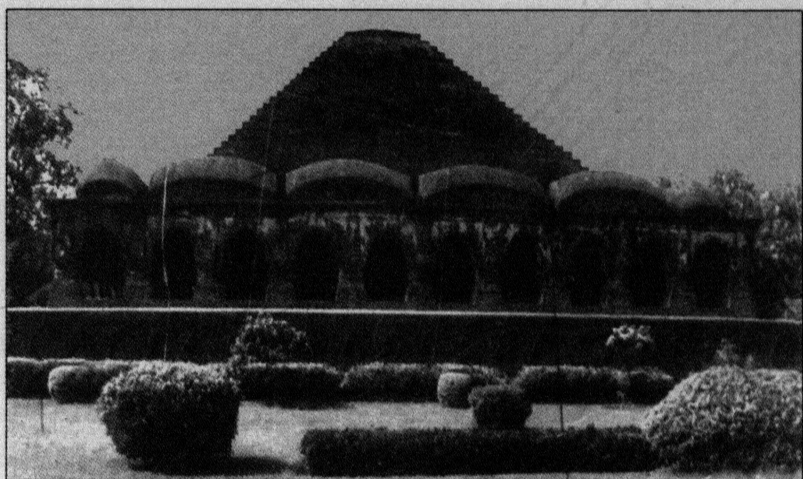
রাসমঞ্চ, বিষ্ণুপুর

জোড়বাংলা মন্দির, বিষ্ণুপুর (ইনসেটে জোড়বাংলা মন্দিরের দেওয়াল-ভাস্কর্য)
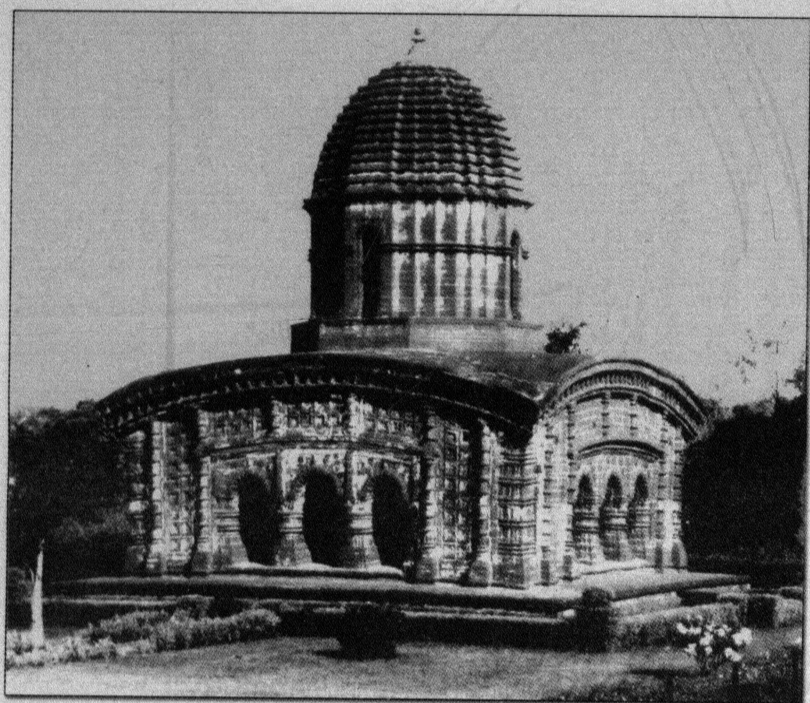
নন্দলালা মন্দির, বিষ্ণুপুর
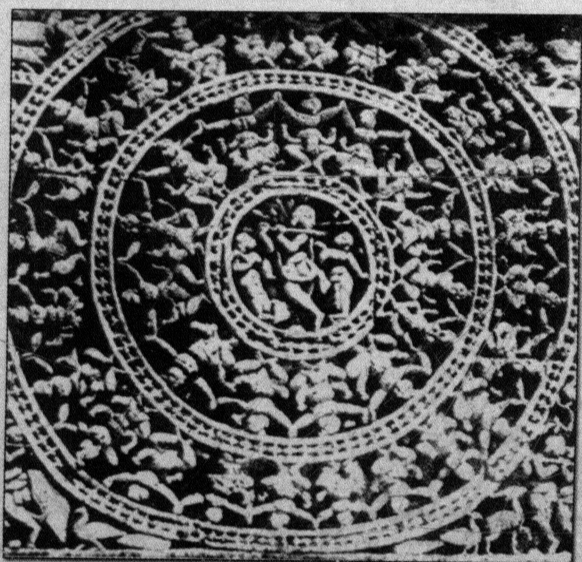
রসমনডালা শ্যামারাই মন্দিরের দেওয়াল-ভাস্কর্য, বিষ্ণুপুর

স্নানাগার, আদিনা/ স্কেচ উৎপল চক্রবর্তী

গুমটি দরওয়াজা/ স্কেচ রমা সাহা
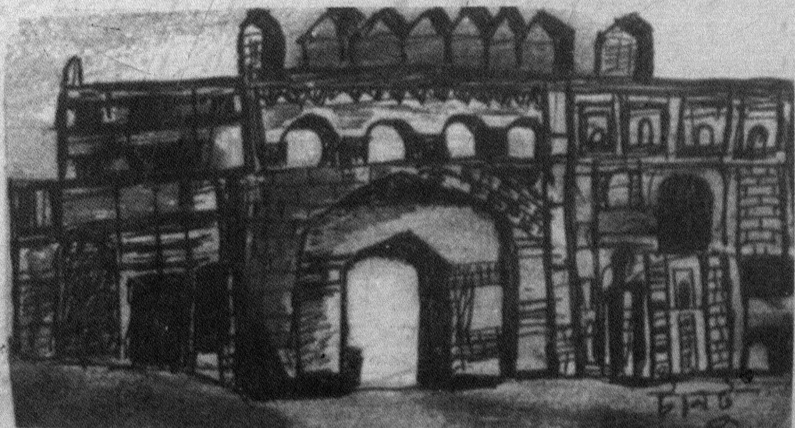
লুকোচুরি দরওয়াজা/ স্কেচ টানটু পান

আদিনা মসজিদ/ স্কেচ শ্রীমহাদেব
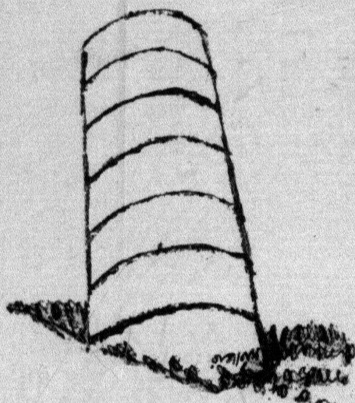
আদিনার মিনার/ স্কেচ রাজারাম

দাখিল দরওজা/ স্কেচ অনিন্দ্য সিংহ
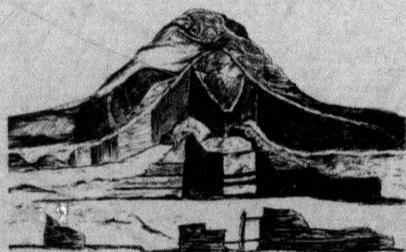
পাহাড়পুর মহাবিহার/ স্কেচ অসিত দাস

রামকেলি মন্দির/ স্কেচ পূর্ণেন্দু মণ্ডল

ও আমার দেশের মাটি

জন্ম যদি তব বঙ্গে......

'বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ'—আবেগ কম্পিত উচ্চারণে এ ধরনের দেশাত্মবোধক গানের সুর আমরা মাঝে মাঝেই বাতাসে ছড়াই, অনুভব করতে চাই মাতৃভূমির প্রতি আমাদের প্রগাঢ় প্রণয়ের ভাষা, প্রত্যাশা করি স্বজন-পরিজনের চৈতন্যেও সঞ্চারিত হবে এই স্বদেশ-প্রীতির অঙ্গীকার।

'আবার আসিব ফিরে ধান সিঁড়িটির তীরে এই বাংলায়'—নিজের দেশ ও মানুষের প্রতি এমন এক নিবিড় মমতার উপলব্ধিও একদিন উচ্চারিত হয়েছিল কবি জীবনানন্দের চেতনায়। সন্দেহ নেই, পৃথিবীর সব দেশের অধিবাসীরাই নিজের মাতৃভূমির প্রতি শ্রদ্ধা জানান এই ভাষাতেই। বাংলা যাঁদের মুখের ভাষা, বুকের রুধির, এদেশ যাঁদের গর্ব, এ মাটি যাঁদের কাছে সোনা তাঁদের অনুভবেও ওই উপলব্ধির স্পন্দন অনুক্ষণ বাজে। সেই স্পন্দনই গ্রন্থিত হয় কবিতায়-গানে, লৌকিক-অলৌকিক নানা গাঁথায় আর ইতিহাসে।

কিন্তু এ দেশের প্রকৃত ইতিহাস আজো শিশু ও বয়স্ক পাঠ্য কাহিনিতে মুখ ঢেকে আছে। আমরা পড়েছি বঙ্কিমচন্দ্রের খেদোক্তি— বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই।' শুনেছি আত্মগ্লানি উন্মোচক সেই অমোঘ সত্যভাষণ 'বাঙ্গালী আত্মবিস্মৃত জাতি।'

গ্লানি মোচনের প্রচেষ্টা যে একেবারেই হয়নি তা নয়। বঙ্কিমচন্দ্র কথিত 'সুবর্ণের মুষ্ঠি', সেই রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস', রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গালার ইতিহাস', নগেন্দ্রনাথ বসুর 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস', দীনেশচন্দ্র সেনের 'বৃহৎ বঙ্গ', রজনীকান্ত চক্রবর্তীর 'গৌড়ের ইতিহাস', রমাপ্রসাদ চন্দের 'গৌড়রাজ মালা', রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের 'বিশাল বাঙ্গালা', দুর্গাচরণের 'বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস', রমেশচন্দ্র মজুমদারের 'বাঙ্গালার ইতিহাস', ধনঞ্জয় দাশ মজুমদারের 'বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস', নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙালির ইতিহাস' এবং অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনয় ঘোষ, সতীশচন্দ্র মিত্র, নিখিলনাথ রায় প্রমুখের লেখা বিভিন্ন জেলার ইতিহাস—এসবই এক একটি মহৎ উদ্যমেরই কৃতিত্ব, আমাদের কৃত্যসূচিরই মূল্যবান রূপায়ণ। কিন্তু এসব সত্ত্বেও ইতিহাস সচেতন ব্যক্তি মাত্রেরই মনোবেদনার কারণ এই যে, এখনো অনেক কাজ বাকি, এখনো অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে অনেক ভূখণ্ডের রহস্য, অনুদ্‌ঘাটিত রয়ে গেছে বাংলার ইতিহাসের অনেক অধ্যায়ের বিস্তৃত কাহিনি, অ-পঠিত রয়ে গেছে অনেক পুঁথি, অনেক শিলালেখ-র ভাষা, উৎখননের অপেক্ষায় স্তব্ধ আছে অনেক ইতিহাসগর্ভ জনপদের প্রান্তর।

এই বিশাল কাজ কার অপেক্ষায় পড়ে আছে? একি শুধুমাত্র কয়েকজন ঐতিহাসিকের দায়িত্ব? বাংলার ইতিহাস কে লিখবে?

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, 'তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলে লিখিবে—যে বাঙ্গালী তাহাকেই লিখিতে হইবে।'

আমি ইতিহাসবিদ্ নই, কিন্তু সন্দেহ কি আমি বাঙালি। আমার পিতৃভূমি বাংলাদেশের বগুড়া জেলার কুশুম্বি গ্রাম—যে জেলার অতীত নাম ছিল পুণ্ড্রবর্ধন, জন্মেছি বালুরঘাটে—যা ছিল প্রাচীন বরেন্দ্রভূমির অন্তর্গত, কৈশোর-যৌবনের অধিকাংশ দিনই কেটেছে মালদহে—যা ছিল গৌড় নামে পরিচিত। কর্মসূত্রে আছি বাঁকুড়ায়—যার নাম রাঢ়ভূমি।

এসব ইতিহাসগর্ভ স্থান শৈশব থেকেই আমার মনকে এদেশের গৌরবময় ঐতিহ্যের প্রতি এক মোহ ভালোবাসা অনুসন্ধানের মিশ্র অনুভূতি রচনা করেছে—যার অনিবার্য প্রভাবে বাংলার জেলায় জেলায় আমি ঘুরে বেড়িয়েছি।

এই যে দু'চোখ ভরে দেশকে দেখা, তার ধুলোমাটি গায়ে মেখে অন্তরঙ্গভাবে কাছে পাওয়া, দেশের সকল মানুষের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ছন্দে নিজের প্রাণচাঞ্চল্যকে মিলিয়ে নেওয়া—এর একটা বিশেষ তাৎপর্য অবশ্যই আছে। তারই ফলে ভালোলাগার ওই ভ্রমণ হয়ে উঠেছে এক কর্তব্যেরই পরিক্রমা। মনে হয়েছে বাংলার বর্তমান রাজধানী যেমন কলকাতা, তেমনি আদিযুগ থেকে বাংলার রাজধানী কোথায় কোথায় ছিল, কেন সেগুলো ধ্বংস হয়ে গেল, আজ তার রূপই-বা কেমন—এসব জানাটাও জরুরী। আর এসবের বিবরণ লিখে ফেলাটাও পালনীয় এক সূচি। দায়িত্বের সূচি। আর সেই প্রয়াসেরই ফসল এই গ্রন্থ 'বিলুপ্ত রাজধানী'।

ইচ্ছে ছিল বাংলার রাজধানীগুলো পর্যায়ক্রমে যেভাবে গঙ্গে, কর্ণসুবর্ণ, বাণগড়, মহীপাল, নুদীয়া, রামাবতী, দেবীকোট, সোনারগাঁ, পাণ্ডুয়া, গৌড়, তাণ্ডা, রাজমহল, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ হয়ে বর্তমানে কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়েছে—সেই পর্যায় অনুসরণ করেই গ্রন্থটির অধ্যায়গুলো বিন্যস্ত করব। এছাড়াও নদিয়া, বিজয়পুর, বিষ্ণুপুর, পুণ্ড্রবর্ধন, মুঙ্গের, সপ্তগ্রাম, পুষ্করণা, মহীপাল, বিক্রমপুর, সোনারগাঁ ইত্যাদি স্বল্পস্থায়ী রাজধানীগুলোর এবং রাজধানীর মতো বড়ো জনপদগুলোর বিবরণও লিপিবদ্ধ থাকুক, এমন বাসনারও রূপায়ণ ঘটুক —এই ছিল উদ্দেশ্য। কিন্তু নানা কারণে 'বিলুপ্ত রাজধানী'র প্রথম সংস্করণে এই পর্যায়ক্রমিক বিন্যাস বজায় থাকেনি। ঢাকা সহ যে জায়গাগুলো বাংলাদেশের অন্তর্গত, তাই প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণও হয়ে ওঠেনি ওই অধ্যায়গুলো। মাটির ওপরে ছড়ানো কিছু প্রত্নসাক্ষ্য ছাড়া গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জিত তাণ্ডা আর কিছুই দেখাতে পারেনি আমাকে। ত্রুটি যদি কিছু ঘটে থাকে তা এইটুকুই। কিন্তু বর্তমান সংস্করণের সেই ত্রুটি সংশোধন করার একটি প্রয়াস করা হলো। গঙ্গে থেকে মুর্শিদাবাদ রাজধানী পরিবর্তনের ধারাবাহিকতাই অনুসরণ করা হয়েছে এই সংস্করণে।

আমি ইতিহাস লেখক নই, কৌতূহলী পর্যটক মাত্র। তাই কোনো গবেষণাধর্মী দুরূহ ভাষায় কণ্টকিত তথ্য ও তত্ত্বভারে আকীর্ণ পাদটিকা সমৃদ্ধ সাধারণ পাঠকের কাছে দুষ্পাঠ্য কোষগ্রন্থ রচনার বাসনা বা ক্ষমতা কিছুই প্রভাবিত করেনি এই গ্রন্থটিকে। এই দেশের রূপটি দেখা, দেখতে দেখতে ভালোলাগা আর সেই ভালোলাগার রেশটুকুই পাঠক মনে সঞ্চারিত করে তাঁদেরও ওই স্থানগুলো দেখার আগ্রহকে উজ্জীবিত করাই এ গ্রন্থ রচনার প্রধান উদ্দেশ্য।

সংশয় ছিল আমার অপটু লেখনী বিষয়বস্তুকে সুপাঠ্য ও কৌতূহলদ্দীপক করে তুলতে পারবে কিনা। কিন্তু সংশয়ের সকল কুণ্ঠা বিস্মিত হয়েছে গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশের পর। অসংখ্য সহৃদয় পাঠক-পাঠিকার চিঠি, দেশ, আনন্দবাজার, যুগান্তর, অমৃত, সত্যযুগ প্রভৃতি পত্রিকার সু-সমালোচনা, বিশেষজ্ঞদের মন্তব্য উৎসাহিত করেছে সেই বিস্ময়কে। অনুমান করি লেখার গুণে নয়, বিষয়বস্তুর অভিনবত্বই আকর্ষক হয়েছে। বাংলাভাষায় ঠিক এ ধরনের বই নেই। এখন অবশ্য কয়েকটি গ্রন্থ রচিত হয়েছে।

এই গ্রন্থ রচনার অন্যতম প্রেরণা আমার স্বর্গত পিতা অমলচন্দ্র চক্রবর্তী, যিনি বিদ্যালয় পরিদর্শনকালে প্রত্নসামগ্রী সংগ্রহ করে তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার রাজসাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতিকে দান করেছেন। ইতিহাস আর কিংবদন্তীর গল্প সংগ্রহ করে শুনিয়েছেন আমাদের। মহাস্থানগড় যে জেলায় সেই বগুড়া আমাদের পিতৃভূমি। বাবার কাছেই আমাদের গ্রাম কুশুম্বির পুকুর থেকে পাওয়া প্রত্নবস্তুর কথা শুনেছি। বালুরঘাটে আমার মামারবাড়িতে সংরক্ষিত ছিল পাল ও সেন যুগের অনেক মূর্তি, যা সংগ্রহ করেছিলেন আমার বড়োমামা আইনজীবী কমলেন্দু চক্রবর্তী। তিনি কোটীবর্ষ, বাণগড় নিয়ে অনেক প্রবন্ধও লিখেছেন বালুরঘাটের বিভিন্ন পত্রিকায়। কলেজ, মিউজিয়াম ও বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতিতেও দান করেছেন অনেক মূর্তি ও মুদ্রা।

প্রখ্যাত সাহিত্যিক সুবোধ ঘোষের লেখা 'কিংবদন্তীর দেশে' আমাকে প্রভাবিত করেছিল গভীরভাবে। বাংলার মাঠ, ঘাট, প্রান্তরের হাওয়ায় হাওয়ায় ভেসে বেড়ানো সেইসব গল্প আশ্চর্য মোহময় ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছিলেন তিনি। এই গ্রন্থ রচনায় সচেতনভাবেই সেই ভাষা বিন্যাসের প্রভাব পড়েছে অনিবার্যভাবে।

আমার সৌভাগ্য, বিভিন্ন সময়ে প্রখ্যাত গবেষক ইতিহাসবিদ্ বিনয় ঘোষ, অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঁকুড়ার মানিকলাল সিংহ, চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত, বালুরঘাটের অচিন্ত্যকৃষ্ণ গোস্বামী, চিত্ত দত্ত, কালিয়াগঞ্জের ধনঞ্জয় রায়, মালদহের যতীন গঙ্গোপাধ্যায়, সুধীর চক্রবর্তী, প্রবাল রায়, কমল বসাক, গোপাল লাহা, সৌমেন পাণ্ডে, মহদীপুর স্কুলের ইতিহাস উৎসাহী শিক্ষকবৃন্দ, হাবড়ার গৌরীশংকর দে, হুগলির সৌমিত্রশংকর সেনগুপ্ত, বাঁকুড়ার পার্থ দে-র সান্নিধ্য লাভ করে, বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করে প্রভূতভাবে সমৃদ্ধ হয়েছি।

এই গ্রন্থ রচনার প্রাক্‌পর্বে বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থানে ভ্রমণের সময় সঙ্গী হয়েছেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে আমাদের শিল্পচর্চা কেন্দ্র অভিব্যক্তির রাজারাম, বৃন্দাবন, সুধাংশু, কুচু, টান্টু, সুধীর, প্রদীপ, অধীর রায়, তপন চৌধুরী, অসিত দাস, পূর্ণেন্দু, অনিন্দ্য, জ্ঞানশংকর, সুমন্ত মজুমদার, অরূপ সিংহ, কাশীনাথ দাস, অসিত বেড়ে, সুভাষ চক্রবর্তী, আশিস মিশ্র, মোহন সিংহ, অপূর্ব গোস্বামী, অর্ধেন্দু দেব, গৌতম দে, চন্দন জোয়ারদার, তুষার ভট্টাচার্য, ঈশ্বর ত্রিপাঠী, গৌতম চক্রবর্তী প্রমুখ সুহৃদবর্গের নাম কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণীয়।

আলোকচিত্র সরবরাহ করে, ছবি এঁকে দিয়ে সহায়তা করেছেন দীপালোক, দেবোপম, নীহার ঘোষ, বিদিশা ও বিপাশা ঘোষ, সৌমিত্র সেনগুপ্ত, শ্রীমহাদেব, টানটু, রমা সাহা, রাজারাম, অনিন্দ্য সিংহ, পূর্ণেন্দু মন্ডল, সুশীল সাহা, বাংলাদেশের খুলনার অধ্যাপক মহম্মদ কায়কোবাদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশের রাজসাহী বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি প্রমুখ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান। এঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন না করা অপরাধ হিসেবেই গণ্য হবে।

আমার মা প্রয়াত সবিতা চক্রবর্তী খুবই যত্নের সঙ্গে আমার সংগ্রহের প্রত্নবস্তুগুলোকে সংরক্ষণ করেছিলেন। আমার ভাই প্রয়াত কবি সুদীপ্তর উদ্যমেই মূলত বিলুপ্ত রাজধানী বই হিসেবে প্রথম প্রকাশ পায়। প্রকাশক অধীর পালের সহৃদয় সহযোগিতায় তাঁর প্রকাশনালয় অমর ভারতী থেকে এখন নব কলেবরে 'বিলুপ্ত রাজধানী' প্রকাশিত হচ্ছে। এঁদের কাছে আমি ঋণী।

বিলুপ্ত রাজধানীর কিছু অধ্যায় প্রথমে প্রকাশিত হয় সাহিত্যিক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত অধুনালুপ্ত 'অমৃত' পত্রিকায়। পরবর্তীকালে সুখ্যাত সাহিত্যিক রমাপদ চৌধুরী আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয়তে কয়েকটি অধ্যায় প্রকাশ করেন। আমি ঋণী এঁদের কাছেও।

গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশের পর দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যায় গ্রন্থটি। ইতিমধ্যে আবিষ্কৃত হয়েছে অনেক প্রত্নবস্তু। সংযোজিত হয়েছে নতুন তথ্য। উৎখনন আবিষ্কার করেছে বহু ঐতিহাসিক জনপদ। সেগুলো এই গ্রন্থে সংযোজিত না হলে গ্রন্থটির অপূর্ণতা প্রকট হবে এই ভেবে সেইসব নবাবিষ্কৃত তথ্য ও আলোকচিত্রের সংযোজন সহ গ্রন্থটি নতুন কলেবরে প্রকাশ করা হল। তবে এও স্মরণে রাখি যে এই গ্রন্থই শেষ কথা বলবে না। এরপরেও আগামীদিনে আবিষ্কৃত হবে নতুন তথ্য, প্রত্নসম্পদ, হারানো জনপদ। বস্তুতপক্ষে এমন সম্ভাবনা সীমাহীন বলে, সে অর্থে, এই নতুন সংস্করণটিও সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ —তা লেখা যাবে না। তবু অদ্যাবধি স্বীকৃত, আবিষ্কৃত তথ্যসম্ভারে সম্পূর্ণতা আনার প্রয়াস করা গেছে সাধ্যমতো। কৃতজ্ঞতা জানাই সেইসব গ্রন্থকারদের যাঁদের বই প্রভৃত সহায়তা করেছে এই গ্রন্থ রচনায়। কৃতজ্ঞ আমি বিলুপ্ত রাজধানীগুলোর বর্তমান অধিবাসীদের কাছে! আবহমান বাংলা ও বাঙালির কাছে।

'আমাদিগের সর্বসাধারণের এই জন্মভূমি—ইহার গল্প করিতে কি আমাদের আনন্দ নাই? আইস, আমরা সকলে মিলিয়া বাঙালিরা ইতিহাসের অনুষ্ঠান করি। যাহার যতদূর সাধ্য, সে ততদূর করুক। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবাল কীট বহু যোজনব্যাপী দ্বীপ নির্মাণ করে। একের কাজ নহে, সকলে মিলিয়া করিতে হইবে। কাজ সহজ নয়। কিন্তু বাঙালির কাজ বাঙালি না করিলে কে করিবে!'

বঙ্কিমচন্দ্রের মননে উদ্ভাসিত এই সত্যের স্পষ্ট নির্দেশেরই প্রেরণায় রচিত হয়েছে এই গ্রন্থ। তাঁর আহ্বানে সাড়া দেবার এ এক বিনীত উদ্যম মাত্র। প্রত্যাশা এই যে, গ্রন্থপাঠের পর যদি সকলের কর্তব্য আর গভীর মমতার হাত রক্ষা করতে এগিয়ে আসে ওই ঐতিহ্যময় ঐশ্বর্য সংরক্ষণে, যোগ্যজন রচনা করেন এদেশের সম্পূর্ণ ইতিহাস, ভ্রমণার্থী উৎসুক হন ওই স্থানগুলো দর্শনে, আমার দেশের মাটির রূপটি দেখতে, তবেই এই শ্রমের সার্থকতা। এই গ্রন্থ দেশ ও মানুষের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা নিবেদনের দলিল।

অভিব্যক্তি
ছান্দার, বাঁকুড়া

উৎপল চক্রবর্তী

আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।
—রবীন্দ্রনাথ

'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর......'

কতদিন, কতজন, কখনো পরম বিজ্ঞতায়, কখনো আন্তরিক বিস্ময়ে প্রশ্ন করেছেন : কেন মশাই, এত পয়সা খরচ করে এই পোড়া দেশের মাঠ-ঘাট, বন-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ান? ইতিহাসের নমুনা দেখতে চান, সংগ্রহ করতে চান তো বাংলার বাইরে যান। দিল্লি, আগ্রা, ফতেপুর সিক্রি, নালন্দা, রাজগীর কত নাম করব! সেসব ছেড়ে এই বাংলাদেশে কেউ বেড়ায়, না বেড়াবার মতো জায়গা আছে?

কোনো উত্তর দিইনি। আমি জানি, এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে নেই। যাঁরা প্রশ্নকর্তা, তাঁরা কেউ ইতিহাসবেত্তা নন, ঘুরে বেড়াবার যে আগ্রহ তাও তাঁদের অনান্তরিক। জানি, আন্তরিক যদি বা হন, তবু দেখার চোখ নেই তাঁদের। আর, সম্ভবত সেই কারণেই যাঁরা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দেখেন তাঁরা এবং মনে করেন পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।

কতটুকু দেখেছেন তাঁরা এই পোড়া দেশের? কতটুকু খোঁজ রাখেন তাঁরা এই বাংলাদেশের সুপ্রাচীন ইতিহাসের? বহু শিক্ষিত-জনকেই জিজ্ঞাসা করেছি, বলুন তো এখন পশ্চিম বাংলার রাজধানী যেমন কলকাতা, বাংলাদেশের যেমন ঢাকা—সেরকম কোন্ কোন্ জায়গা প্রাচীনকালে অখণ্ড বাংলার রাজধানী ছিল?

যদি বা কেউ গৌড় বা মুর্শিদাবাদের নাম করেন, কিন্তু কোন্‌টির পর কোন্‌টি অনেকেই তা বলতে অপারগ। আর শুধু গৌড় বা মুর্শিদাবাদই তো প্রাচীন রাজধানী নয়—এ দেশের ইতিহাস আরো প্রাচীন। হাজার বছর আগে কোন্ জায়গা ছিল এ দেশের রাজধানী?

বলতে পারেন না তাঁরা। প্রশ্নের অনাবশ্যকতা নিয়ে বিতর্ক তোলেন। আমাকে আবার নীরবতা পালন করতে হয়। আমি জানি, ওই অজ্ঞতায় তাঁরা স্বেচ্ছাবন্দী।

পরিত্রাণের পথ তাঁদের নিজেদেরই আগ্রহে বের করতে হবে, চোখে আঙুল দিয়ে দেখালেও কিছু হবার নয়।

যাঁরা ইতিহাস বিষয়ে বিশেষভাবে সচেতন, তাঁদের অধিকাংশেরই আগ্রহের কেন্দ্র বাংলা নয়। বৃহত্তর ভারতের দৃশ্যমান ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলো সকলের দৃষ্টি-আকর্ষক। বারংবার তাই তাঁরা ছুটে যান দিল্লি, আগ্রা, কোনারক, খাজুরাহো...... অথচ এই বাংলাদেশের কত বিস্তীর্ণ প্রান্তরের একান্তে পড়ে আছে পাথরে গড়া এক একটি আশ্চর্য মূর্তি, অরণ্যের নিরাপদ আশ্রয়ে লুকিয়ে আছে এক একটি দুর্গের ভগ্নাবশেষ, কত রাজপ্রাসাদের শেষ চিহ্ন! —কত মন্দির, মসজিদ, মিনার, গড়ের পাথরে ইঁটে কারুকার্যে লিপিতে খোদিত আছে এই

দেশের ইতিহাস—কয়জন এসবের টানে ছুটে যান সেইসব অমূল্য প্রত্নসম্পদ অবিষ্কার, পর্যবেক্ষণ, সংরক্ষণ বা অনুসন্ধানের জন্যে?

বিশ্বাস করা কঠিন, তবু সত্য। সারা ভারতবর্ষে যত পাথরের মূর্তি বা পোড়ামাটির কাজ বা মন্দির, মসজিদ অথবা মুদ্রা, শিলালেখ-র অস্তিত্ব আছে, পরিমাণে বা সৌন্দর্যে বাংলায় যা আছে তাও কিছু কম উল্লেখযোগ্য নয়। এখনো বাংলার মাটির গভীর গোপনে সমাহিত আছে কত অসংখ্য ঐতিহাসিক সম্পদ। অকস্মাৎ কখনো কৃষকের লাঙ্গলের ফালে বা শ্রমিকের কোদালের ডগায় উঠে আসে বিস্মৃতপ্রায় ইতিহাসের এক একটি অধ্যায়ের নীরব সাক্ষ্য, পণ্ডিতজন ছুটে যান সেখানে—লিখিত হয় বাংলার ইতিহাসের এক একটি ছিন্ন অধ্যায়।

কিন্তু বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে, গভীর একনিষ্ঠতায়, এই দৈবের দান ছাড়াও, এসব আবিষ্কারের প্রচেষ্টা এদেশে আশ্চর্যজনকভাবে অনুপস্থিত। যা কিছু হয় তাও যথেষ্ট নয়, আর যা আবিষ্কার হয়ে গেছে—তার সংরক্ষণের ব্যবস্থাও যথাযথ নয়। সরকারি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ উপযুক্তভাবে সক্রিয় নন, ঐতিহাসিকেরা যথেষ্ট আগ্রহী নন, আর সাধারণ মানুষ! ইদানিং সেই সচেতনতার লক্ষণ অবশ্য বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থানে সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

ইতিহাস শিখেছেন তাঁরা বই পড়ে।—কি লেখা আছে তাতে?

প্রায় হাজার বছর আগে পাল রাজাদের রাজধানী বাণগড়, লক্ষ্মণসেনের লক্ষ্মণাবতী বা তারও আগে কুষাণ, সুঙ্গ, গুপ্ত যুগের 'গঙ্গে' বন্দর সম্বন্ধে কতটুকু লেখা আছে সেসব বইতে?

ঘরের পাশে বেড়াচাঁপা, কিছু দূরের সপ্তগ্রাম, ওই সিঙ্গুর, মহানাদ, আর পুষ্করণা, বিষ্ণুপুর, বাণগড়, দেবীকোট, পাণ্ডুয়া, গৌড়, কর্ণসুবর্ণ বা তাণ্ডা কোথায়—এই বাংলার বর্তমান রাজধানী কলকাতা থেকে কতদূর—কে তার খবর রাখে! অথচ ওই জায়গাগুলো প্রত্যেকটিই এক সময় ছিল বাংলার রাজধানী।

কিভাবে সেগুলো গড়ে উঠেছিল, কেনই বা তার পতন হল—কোন্ বিদ্যালয়ে পড়ানো হয় সে-সব? বাংলার মানুষ বাংলার ইতিহাস শিখবেন কোথা থেকে?

তাই জানি, বিজ্ঞজনের সেই প্রশ্নটির কোনো উত্তর দিতে নেই। দিলীপকুমার রায়ের একটি গানের কলি মনে পড়ে, 'ওরা জানে না তাই হাসে।' আমিও হাসি। আর ঝোলা কাঁধে বেরিয়ে পড়ি সেই বিলুপ্ত রাজধানীগুলোর ডাকে। ম্লান বিবর্ণ এক একটি ঐশ্বর্যের শ্মশানভূমি, বিপুল সম্পদ বুকে আঁকড়ে ধরে যেন মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রাপ্ত আশঙ্কা-জর্জর অপরাধীর মতো নীরবে প্রতীক্ষমান—কালের অনিবার্য প্রহার নেমে আসছে যুগের পর যুগ ধরে।

অবলুপ্তির শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে যেন প্রাণপণে রক্ষা করার চেষ্টা করে চলেছে তারা, ঐতিহাসিক চিত্রগুলো যেন বিলুপ্ত হয়ে না যায়।

আর অসহায় সেই হাহাকারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বারবার মনে হয়েছে, এখনো সময় আছে। এই চিহ্নগুলো, এই বিপুল ঐশ্বর্য যদি এখনো যথোচিত যত্ন নিয়ে সংরক্ষণ না করা যায়, তবে কিছুদিনের মধ্যেই স্তব্ধ হয়ে যাবে প্রাচীন বাংলার এই সচল হৃদপিণ্ডগুলো—যেমন চিরদিনের মতো নীরব হয়ে গেছে গঙ্গে বন্দর, রামাবতী, তাণ্ডা।

কত প্রাচীন এই বাংলাদেশ?

ইতিহাস নীরব। শুধু পুরাণ উপকথায় ছড়িয়ে আছে বঙ্গ-প্রসঙ্গ। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সেসব-ই এই পোড়া দেশের বিপক্ষে। ঋগ্বেদে কোনো উল্লেখই নেই, ঐতরেয় ব্রাহ্মণে

আছে বটে কিন্তু 'দস্যু', 'অসুর' বিশেষণে বঙ্গবাসী চিহ্নিত। এদেশের ভাষা নাকি পাখির ভাষা—কেউ বুঝতেই পারে না। মহাভারতের ভীম বলেছেন, 'ম্লেচ্ছ', ভাগবত পুরাণে 'পাপ', বৌধায়ন ধর্মসূত্রে 'আর্যসংস্কার বহির্ভূত'। এদেশে এসে ঘুরে গেলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হত অন্য প্রদেশের মানুষকে।

মহাভারতের আদি পর্বে এ দেশ উদ্ভবের এক বিচিত্র কাহিনিরও উল্লেখ আছে। বৃহস্পতির শাপে অন্ধ দীর্ঘতামস ঋষিকে তাঁর স্ত্রী প্রদ্বেষী বড়োই অযত্ন করতেন। এতে দীর্ঘতামস ক্ষুব্ধ হয়ে স্ত্রীকে অভিশাপ দেন। স্ত্রীও কিছু কম যান না। ছেলেদের সহায়তায় স্বামীর হাত-পা বেঁধে তাঁকে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেন। বদ্ধ অন্ধ দীর্ঘতামস ভাসতে ভাসতে বলী রাজার ঘাটে গিয়ে লাগেন। অ-পুত্র বলী রাজা দীর্ঘতামসকে মুক্ত করেন একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে। রানি সুদেষ্ণাকে অনুরোধ করেন ঋষির ওরসে পুত্রবতী হতে। রানি গররাজী, যেহেতু ঋষি অন্ধ। ছল করে শূদ্রাণী দাসীকে পাঠালেন তিনি দীর্ঘতামসের শয্যায়। এই শূদ্রাণীর ছেলেদের পরিচয় ক্রমে বলী রাজা জানতে পেরে রানি সুদেষ্ণাকে এবার আদেশ দিলেন পুত্রবতী হতে। দীর্ঘতামসের ঔরসে রানি সুদেষ্ণার তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করল —অঙ্গ, বঙ্গ এবং কলিঙ্গ।

কাশীরাম দাস লিখেছেন—

'অঙ্গদেশে বসাইল জ্যেষ্ঠ পুত্র অঙ্গ।
কলিঙ্গ কলিঙ্গদেশে, বঙ্গদেশে বঙ্গ ॥'

কিন্তু পৌরাণিক এই বঙ্গদেশের সঠিক অবস্থান আজ আর জানার উপায় নেই। কোথায় বা ছিল তার রাজধানী—তা'ও নয়। ঐতরেয় আরণ্যক গ্রন্থে বলা হয়েছে 'বয়াংসি বঙ্গামগ্ধাশেরপাদাঃ'—বঙ্গ ও মগধ প্রতিবেশী রাষ্ট্র। আর পরবর্তীকালের ইতিহাসের যা সাক্ষ্য—তাতে মোটামুটি বোঝা যায় বঙ্গ-উপবঙ্গ-প্রবঙ্গ মিলিয়ে যে অঞ্চল তা এখানকার পূর্ববঙ্গ অঞ্চল। অর্থাৎ সমগ্র বঙ্গদেশের এক প্রান্তমাত্র। আর সে বঙ্গের রাজধানী সোনারগাঁ না কোটালীপাড়া—কে তা জানাবেন?

বস্তুত সারা বাংলা তখন বঙ্গ, গৌড়, পুণ্ড্র, রাঢ়, সমতট ইত্যাদি ভিন্ন নামে চিহ্নিত ছিল। রাজধানীও ছিল ভিন্ন ভিন্ন।

বঙ্গ যদি পূর্ববাংলা হয়—তবে পুণ্ড্র ও গৌড় সাধারণভাবে উত্তরবঙ্গকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল। পাণিনি, কৌটিল্য, বাৎস্যায়নের লেখাতে গৌড়ের উল্লেখ থাকলেও ঠিক কোন্ জায়গাটি গৌড়, তা বলা নেই। পরবর্তী ইতিহাস বলে—প্রাচীন মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমানই হল প্রাচীন গৌড়—আর তার রাজধানী হল চম্পা। এ কোন্ চম্পা? ভাগলপুরে এর অবস্থিতি, না বর্ধমান শহরের উত্তর-পশ্চিমে দামোদরের বামতীরে চম্পানগরীই সেই চম্পা? কে জানে! আরো পরবর্তীকালে শুধু মালদহের গৌড় লক্ষণাবতী-ই আজো গৌড়ের শেষ সাক্ষী হিসেবে অপেক্ষমান।

আর রাঢ় সম্ভবত বর্তমান পশ্চিমবাংলারই পূর্ব নাম। কিন্তু এর রাজধানী ছিল কোথায়? প্রাচীন জৈনগ্রন্থ আয়ারাঙ্গ বা আচারাঙ্গ সূত্র বলে দিনাজপুরের কোটিবর্ষই এর রাজধানী। সেই কোটিবর্ষই কি বর্তমান দক্ষিণ দিনাজপুরের বাণগড় অঞ্চল? কিন্তু রাঢ় তো দ্বিধা-বিভক্ত ছিল— উত্তর-পূর্ব রাঢ় ও দক্ষিণ-পশ্চিম রাঢ়। আর বর্ধমান, হুগলি, হাওড়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর, পশ্চিম মুর্শিদাবাদ-এর অন্তর্গত ছিল। তাহলে পরবর্তীকালের রাজধানীর নাম কি?

মধ্যবাংলার যে অংশ সমতট নামে পরিচিত ছিল তার রাজধানী কি হরিকেল না চন্দ্রদ্বীপ?

এত জিজ্ঞাসার কোনো সঠিক উত্তর আজ অবধি যথেষ্ট নয়। যদিও গবেষকদের নিরন্তর প্রয়াস এখন অনেক সংশয়েরই অবসান ঘটিয়েছে। শুধু প্রকৃতি যদি হঠাৎ প্রসন্না হয়ে হারানো ইতিহাসের একটি লুপ্ত অধ্যায়ের স্মারকচিহ্ন মানুষের হাতে তুলে দেন, তবে নিশ্চিত বিশ্বাসে সেকথা লিপিবদ্ধ করেন ইতিহাসবেত্তাগণ।

কিন্তু 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'—এ কি শুধু গানের বাণী?

সুপ্রাচীন এই বাংলার প্রাচীনতম হৃদকেন্দ্রটি কোথায় ছিল, কিভাবে বাংলার বিভিন্ন বিভাগগুলো প্রথমে 'গৌড়' নামের ছত্রছায়ায়, পরে 'বঙ্গ' নামের ব্যাপ্তিতে আত্মগোপন করল—সেই রোমাঞ্চকর ইতিবৃত্তের বিবরণ ছড়িয়ে আছে ওই বিলুপ্ত রাজধানীগুলোরই প্রতিটি অণুতে অণুতে। এই ইতিবৃত্তের প্রত্যক্ষ পরিচয় নেওয়া কি আমাদের কর্তব্য নয়? শুধু গান করলেই দায়িত্ব শেষ?

মেগাস্থিনিস, ফা-হিয়েন, হিউ-এন-সাঙ, ইবন বতুতা, ওয়াংতো ইউয়ান, মা-হোয়ান, ফেই-শিন, নিকলো কন্তি, ভারথেমা, বাররোসা, তাভেরনিয়র, জো-আঁ-দে-বারোস—নামী অনামী কত পর্যটক এবং ইতিহাস লেখক ইং ইয়াই সেং, হ্যামিলটন, কানিংহাম, ক্রেটন, ল্যব্রঁ, ফেরিয়া-ই-সুসা, জিয়াউদ্দিন, বারণী, মিনহাজউদ্দিন সিরাজ বিভিন্ন যুগে এই রাজধানীগুলোতে এসেছেন। সুদূর গ্রিস, চিন, পর্তুগাল থেকে তাঁদের জাহাজ এসে ভিড়েছে তাম্রলিপ্ত, সপ্তগ্রাম, গঙ্গে, চট্টগ্রাম বন্দরে।

সুজলা সুফলা এ দেশের রাজধানীগুলোর ঐশ্চর্য, সৌন্দর্য, বিশালতা দেখে মুগ্ধ হয়েছেন তাঁরা। বাংলার নদী, মাঠ, ক্ষেত ভালোবেসে আবার ফিরে আসার বাসনা নিয়ে লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁদের দু'চোখ ভরে দেখার ইতিবৃত্ত।

কত যুগ পার হয়ে গেছে, তারপর কত ভাঙাগড়ার অনিবার্য আন্দোলনে বাংলাদেশের ইতিহাস বিবর্তিত হয়ে চলেছে। রাজধানীগুলোর গৌরবের আলো ঐশ্চর্যের উজ্জ্বলতা ম্লান হয়ে গেছে।

একদা সমৃদ্ধ জনপদ মরুভূমির শূন্যতা বুকে নিয়ে কোথাও আত্মগোপন করেছে গভীর অরণ্যের আড়ালে, কোথায় নিঃশব্দে নিজেকে সমাহিত করেছে মাটির গভীর গোপনে!

বিশ্বাস হয় না, ভাবতে গেলে বিষণ্ণতায় ঢেকে যায় কল্পনা—এইসব রাজধানীগুলোও একসময় আজকের কলকাতার মতো এমন 'কল্লোলিনী তিলোত্তমা' ছিল। ধনে-জনে প্রাণ-স্পন্দনে মুগ্ধ মানুষকে আহ্বান করেছে সাদরে সুরম্য অট্টালিকা, সুসজ্জিত বিপণীশ্রেণি, প্রশস্ত রাজপথ, উৎসব কোলাহল মুখর জনজীবন। সবকিছুই আজ কালের মন্ত্রবলে এক মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেছে। আজ সেই অট্টালিকার ভগ্নাবশেষে নিশ্চিত ধ্বংসস্তূপে নখ বসায় বট-অশ্বত্থের চারা। বিপণীশ্রেণির দ্রব্যসম্ভারের চিহ্নমাত্রও খুঁজে পাওয়া যায় না কোথাও। প্রশস্ত রাজপথের কঙ্কালে নির্ভয়ে পদচারণা করে সরীসৃপ বা হিংস্র শ্বাপদ। জনজীবনের কোলাহলের পরিবর্তে গভীর রাতে মুখর হয়ে ওঠে ফেরুপাল আর শেয়ালের আর্তস্বর।

কলকাতায় পথ হাঁটি। আচমকা এক এক সময় মনে হয়, হয়তো হাজার হাজার বছর পর আমারই মতো কোনো পর্যটক কলকাতার ধ্বংসস্তূপে অন্বেষী পদচারণা করবেন—খুঁজে

বেড়াবেন বিলুপ্ত এই রাজধানীর ইতিবৃত্ত—হয়তো আজকের এই প্রাণচঞ্চল মহানগরী ঢেকে যাবে গভীর অরণ্যে বা প্রোথিত হয়ে যাবে মাটির আড়ালে। হয়তো...। আবার মনে হয়—

হয়তো তা হবে না। আধুনিক বিজ্ঞান নগর রক্ষার জন্য উপযুক্তভাবেই প্রস্তুত। এবং এই প্রস্তুতির অভাবের জন্যই প্রাচীন রাজধানীগুলো হারিয়ে গেছে এমন করে।

আর তাই বারংবার পর্যটকদের পর্যটক মন সেইসব আত্মার আত্মীয় হয়ে উঠেছে, যাঁরা এক সময় বিলুপ্ত রাজধানীগুলোর রূপে-গুণে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও সর্বত্র পৌঁছবার রাস্তা আজ আর খোলা নেই। আজ সহজে যেতে পারি না পৌণ্ড্রবর্ধনের কেন্দ্রস্থল মহাস্থানগড়ে, যা এখন বাংলাদেশের বগুড়া জেলার নিভৃতে অপেক্ষমান, যেতে পারি না খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের সমাচারদেব গোপচন্দ্রের মুদ্রা যেখানে পাওয়া গেছে সেই ফরিদপুরের কোটালিপাড়ায়। সহজে যাওয়া যায় না ঢাকার সোনারগাঁ বা বিক্রমপুরে— সদাশঙ্কিত, মৃত্যুভয়ে-ভীত, দুর্বলচিত্ত রাষ্ট্রনায়কদের সৃষ্ট কৃত্রিম রক্ষাকবচ ভিসা-পাশপোর্টের অত্যধিক বাড়াবাড়িতে।

একসময় এই 'বঙ্গ' ছিল ব্রাত্য, পাণ্ডববর্জিত দেশ। বাঙালিরা ছিলেন উপহাসের পাত্র। ইতিহাসের চাকা আবর্তিত হয়ে চলেছে। গৌড়-বঙ্গ-পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ব পাকিস্তান, পূর্ববঙ্গ, বাংলাদেশ—কে জানে ইতিহাস কোন্ অমোঘ নির্দেশে এগিয়ে চলেছে। আজ আর সেই 'বঙ্গ' ব্রাত্য নয়—ব্রতী। সমগ্র পৃথিবীর উদ্দীপনা উজ্জীবনের একটি মন্ত্রপূত নাম, বাংলাদেশ।

তাই ইচ্ছে করে বারবার প্রাচীন ইতিহাসের ওই সব আদিম ভূমিকে স্পর্শ করি। প্রণাম করি বর্তমান ইতিহাসের নায়ক-ভূমিকে। বাংলারই সেইসব বিলুপ্ত রাজধানীতেই তাই পা রাখি—সম্পূর্ণতার স্বাদ অপূর্ণতায় আরো তৃষ্ণার্ত হয়ে ওঠে। একদা সমগ্র বাংলাদেশের যেগুলো রাজধানী ছিল সেগুলোর কাছে গিয়ে তাই তৃষ্ণা মেটাতে হয়।

গঙ্গে-পুণ্ড্রবর্ধন-কর্ণসুবর্ণ-বাণগড়, মহীপাল, রামাবতী, নুদীয়া, সোনারগাঁ, দেবীকোট, পাণ্ডুয়া, গৌড়, তাণ্ডা, রাজমহল, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ—প্রাচীন বাংলার এইসব বিলুপ্ত রাজধানীগুলোর কাছে গিয়ে শুনে নেবার চেষ্টা করি তাদের পুরাবৃত্ত, দেখে নেবার চেষ্টা করি আমাদের লুপ্তপ্রায় সম্পদগুলো, অনুভব করবার চেষ্টা করি আমাদের প্রাচীন গৌরবের স্মৃতিকে। একই প্রেরণায় যেতে হয় বাংলার মূল রাজধানীগুলির পাশাপাশি যেসব সমৃদ্ধ জনপদ-বন্দর গড়ে উঠেছিল ইতিহাসের এক একটি পর্বে, সেইসব ইতিহাস-গর্ভ স্থানে। মনে হয় বাংলার সকল মানুষ যদি গভীর মমতা নিয়ে এই স্মৃতিচিহ্নগুলো বাঁচিয়ে রাখেন, যদি সে কারণে আন্তরিক আগ্রহ নিয়ে এদের সম্মুখে একবারও দাঁড়ান, তবে তিনিও কবির মতো গভীর বিশ্বাসে বলবেন—

'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর।'—

গঙ্গে

প্রণমি তোমারে আমি, সাগর উত্থিতে, ষড়ৈশ্বর্যময়ী, অয়ী জননী আমার—
—অক্ষয়কুমার বড়াল

এই সেই গঙ্গে!

পেরিপ্লাস-এর গ্রন্থ আর টলেমির ভ্রমণ বৃত্তান্তে গঙ্গারাষ্ট্রের রাজধানী সুবিশাল গঙ্গে বন্দর।

আমি জানি না, কোনো ঐতিহাসিক এখনো কোনো সুনিশ্চিত প্রমাণ পেয়ে স্থির সিধান্তে পৌঁছতে পেরেছেন—এই সেই বিখ্যাত গঙ্গে কি না। শুধু স্থানটির প্রাচীনত্ব অসংখ্য ঐতিহাসিক নিদর্শনের ভগ্নাংশ, অদূরে বিদ্যাধরী নদীর অবস্থিতি, স্থানীয় বিভিন্ন অঞ্চলের নাম—অনুসন্ধিৎসু মানুষের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করেছে, ঐতিহাসিককে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ নিবিষ্ট হতে অনুপ্রাণিত করেছে আর আকর্ষণ করেছে অসংখ্য পর্যটককে, হাজার হাজার বছর ধরে পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে যাঁরা ছুটে এসেছেন এই ইতিহাস সমৃদ্ধ জলাভূমিতে।

আজ আমি পা রাখলাম সেখানে।

একবিংশ শতাব্দীর পশ্চিমবাংলার রাজধানী কলকাতা থেকে মাত্র তেইশ মাইল উত্তরে। শ্যামবাজার খালধার থেকে ডি-এন ১৮ বাসে উঠলে ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই পৌঁছে যাওয়া যায় আনুমানিক ৩৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে খ্রিস্টীয় ১ম, ২য়, ৩য় শতকের বাংলার রাজধানী 'গঙ্গে'তে—যার আধুনিক নাম বেড়াচাঁপা বা দেবালয় বা চন্দ্রকেতুরগড় বা দেগঙ্গা। না, এখনো কোনো শীলমোহর, কোনো শিলালেখ, কোনো তাম্রশাসনে উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া যায়নি, যা থেকে নিঃসংশয় হওয়া যায় এই বেড়াচাঁপাই সেই 'গঙ্গে'। তবু মাটির গভীর গোপনে সংগুপ্ত এমন বহু প্রমাণ আজ উম্মুক্ত—যা থেকে প্রায় নিঃসন্দেহ হয়েছেন ঐতিহাসিকেরা, ভারতবর্ষের প্রাচীনতম স্থানগুলোর মধ্যে বেড়াচাঁপা অন্যতম এবং পার্শ্ববর্তী গ্রাম 'দেগঙ্গা',. গঙ্গানদীর অন্যতম শাখা বিদ্যাধরীর গতিপথ ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে অনেকেই প্রায় নিশ্চিত হয়েছেন এই বেড়াচাঁপাই সেই 'গঙ্গে' বন্দর।

অনেক ঐতিহাসিক এসেছেন বেড়াচাঁপাতে নানাবিধ প্রমাণ পেয়ে। তাঁদের সন্দেহ আরো ঘনীভূত হয়েছে, মৌর্য-সুঙ্গ-কুষাণ-গুপ্ত-পাল-সেন বা মুসলমান যুগের বিভিন্ন ঐতিহাসিক নিদর্শন প্রায় সুনিশ্চিত করেছে তাঁদের। রোমাঞ্চিত হতে হয়, ভাঙা মন্দিরের ভিত, পোড়ামাটির মূর্তি, গড়, দিঘি আর মৃৎপাত্রের টুকরো দেখে। অভিভূত হয় কল্পনা, প্রায় দু'হাজার বছর আগে এই বেড়াচাঁপাই ছিল প্রাচীন ভারতের প্রাচীন বাংলার সভ্যতার অন্যতম একটি পীঠস্থান।

ওই বিদ্যাধরীর জলস্রোত বেয়েই ভেসে আসত গ্রিস, রোম, মিশর, চিন থেকে পণ্যবাহী জাহাজ, এই বন্দর থেকেই বিদেশে রপ্তানী হত সোনা, মণিমুক্তো, বিচিত্র সূক্ষ্ম রেশম, কার্পাস বস্ত্র, নানা রকমের মশলা আর গন্ধদ্রব্য। বিশ্বাস করতে গিয়ে বিস্ময়ে উত্তাল হয়ে ওঠে কল্পনা, আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের সময় এইটিই ছিল বিশাল গঙ্গারাষ্ট্রের রাজধানী, পরাক্রান্ত 'গঙ্গানগর'—পেরিপ্লাস আর টলেমি যাঁর বর্ণনা দিতে গিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন তাঁদের ভ্রমণ বৃত্তান্তে; লেখক দিয়োদোরাস, কার্টিয়াস, প্লুতার্ক, সলিনাস, প্লিনি, টলেমি, স্ট্র্যাগে প্রমুখরা প্রশংসায় মুখর হয়েছিলেন এরই সমৃধ্বি বর্ণনায়; বিশেষণের মুক্ত-প্রয়োগে অকুণ্ঠিত ছিলেন পরবর্তীকালের ভারতীয় ঐতিহাসিকগণও।

আজ আমি পা রেখেছি সেই বেড়াচাঁপায়। হাজার হাজার বছর ধরে পরিভ্রমণরত পর্যটক আত্মার সঙ্গী হয়ে আমি বিস্ময়-ব্যাকুল চোখে দেখছি বেড়াচাঁপাকে।

এর নাম বেড়াচাঁপা কেন?

জিজ্ঞেস করেছি স্থানীয় এক অপরিশীত বৃধ্ব মানুষকে। উত্তেজিত উৎসাহে তিনি শুনিয়েছেন এক আশ্চর্য অলৌকিক কাহিনি!

বহুকাল আগে, আজ থেকে প্রায় পাঁচশো বছর আগে এখানে এসেছিলেন পীর গোরাচাঁদ। এদেশে মুসলমান ধর্ম প্রচারের জন্য যে কয়েকজন পীর এসেছিলেন—ইনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। অসামান্য ক্ষমতাবান ছিলেন এই পীর। সেই ক্ষমতারই প্রমাণ দেবার জন্য তিনি একবার লোহার বেড়ার ওপর চাঁপাফুল ফুটিয়েছিলেন। সেই থেকেই এর নাম বেড়াচাঁপা।

—আর ওই যে মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ দেখছেন, বললেন সেই গ্রাম্য বৃধ্ব—এমন অসংখ্য মন্দির ছিল আগে এখানে। সেই থেকেই এর নাম দেবালয়। আর রাজা চন্দ্রকেতু এখানে রাজত্ব করতেন বলে এর আর এক নাম চন্দ্রকেতুরগড়। চন্দ্রকেতুরগড় বা বেড়াচাঁপার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ সর্বপ্রথম কবে সচেতন হয়ে ওঠেন? যতদূর জানা গেছে, ১৯৪৮ সালে আশুতোষ মিউজিয়ামের পক্ষ থেকে প্রথম এবং পরে ১৯৫০ সালে ও ১৯৫৬ সালে ব্যাপক অনুসন্ধান চালানো হয়। অবশ্য এরও প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে বিখ্যাত বিদেশি পুরাতাত্ত্বিক লঙহার্স্ট এই জায়গায় প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠেন। তার কিছু পরে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই স্থানটি বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করে এক বিস্তৃত বিবরণ লিপিবধ্ব করেন। 'যশোহর ও খুলনার ইতিহাস' প্রণেতা সতীশচন্দ্র মিত্রই সম্ভবত সর্বপ্রথম চন্দ্রকেতুরগড়ের সুউচ্চ ঢিবি, পার্শ্ববর্তী গ্রামের 'দেগঙ্গা' নামটি বিশ্লেষণ করে এইটিই গ্রিক বিবরণীতে উল্লিখিত বিশাল 'গঙ্গে' নগরীর ধ্বংসাবশেষ বলে ইঙ্গিত করেন। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধীক্ষক শ্রীপরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় এ-বিষয়ে বিস্তৃতভাবে লিখেছেন নানা পত্র-পত্রিকায়। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যখন এসেছিলেন তখন চন্দ্রকেতুরগড়ের খননকার্য শুরু হয়নি। তবু স্থানটির প্রাচীনত্ব সম্পর্কে তিনি নিঃসংশয় হয়ে লিখেছিলেন, 'মুর্শিদাবাদের মহীপাল ও রাঙ্গামাটি, নদিয়ার বল্লাল ঢিবি, হুগলির সপ্তগ্রাম ও মহানাদ, যশোহরের ভরত ভায়না, ঢাকার সাভার ধামরাই, রামপাল, সোনারঙ্গ প্রভৃতি স্থানের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের তুলনায় চব্বিশ পরগনার চন্দ্রকেতুরগড় অতি প্রাচীন।'

১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে ভূতত্ত্ব-বিভাগের চিত্রকর নৃপেন্দ্রনাথ বসু তাঁকে এই জায়গাটি সম্বন্ধে অবহিত করেছিলেন এবং তিনি তাঁর পার্শি শিক্ষক মৌলবী খয়রউল আলম ও ঐতিহাসিক হেমচন্দ্র দাশগুপ্তের সঙ্গে এখানে এসেছিলেন।

তখন বারাসত-বসিরহাট লাইট রেলওয়ে চালু ছিল। বেড়াচাঁপা স্টেশনে নেমে এক মাইল দক্ষিণ-পূর্বে গিয়ে তিনি চন্দ্রকেতুরগড়ের ধ্বংসাবশেষের মুখোমুখি হয়েছিলেন। অবশ্য তখন তিনি দু-একটি পুকুর ও কতকগুলো মাটির ঢিবি ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাননি। কিন্তু যেসব প্রাচীন ঐতিহাসিক সামগ্রী তিনি স্থানীয় ব্যক্তিদের কাছে দেখেছিলেন সেগুলো তাঁর মতে 'অত্যন্ত আশ্চর্যজনক ও পুরাতন'।

চন্দ্রকেতুরগড় দূর থেকে উঁচু পুকুরের পাড় বলে ভ্রম হয়, কিন্তু আসলে এটি একটি পুরনো দুর্গের ভগ্নাবশেষ। লক্ষ করলে এর এক অংশে দুর্গের প্রধান বা সিংহদ্বারের চিহ্নও স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়। সিংহদ্বারের ধ্বংসাবশেষের কাছ থেকে অনেক দূর পর্যন্ত ছোটো বড়ো ঢিবি দেখে সহজেই অনুমান করা চলে এর বিস্তার বহুদূর পর্যন্ত ছিল। গড়েরই কিছু দূরে একটি প্রকাণ্ড দিঘি আছে 'ধনপোতা' নামে। লোকে বলে রাজা চন্দ্রকেতু বিদেশি আক্রমণের সময় এখানেই তাঁর ধনরত্ন পুঁতে রেখেছিলেন।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বেড়াচাঁপা স্টেশনের কাছে একটা চালকলে তিনটি খুব পুরনো প্রত্নবস্তু দেখেছিলেন। প্রথমটি হল একটি চারপেয়ে পাথরের চৌকি—বিহারে বা মধ্যপ্রদেশে এগুলোকে বলে 'গোরেয়া'। নালন্দা, তক্ষশিলা ইত্যাদি প্রাচীন জায়গাগুলো খননের সময় এই জাতীয় অজস্র 'গোরেয়া' পাওয়া গেছে। বাংলায় সম্ভবত একমাত্র বেড়াচাঁপা থেকেই এটি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া একটি অত্যন্ত প্রাচীন ছোটো মৃন্ময়ী 'মাতৃমূর্তি' পাওয়া গেছে, যা বাংলার চন্দ্রকেতুরগড় ছাড়া আর কোথাও নেই; কেবল কৌশাম্বী, কান্যকুব্জ ইত্যাদি প্রাচীন জায়গাতেই এর নিদর্শন কিছু পাওয়া যায়। হাজার হাজার বছর আগে এই জাতীয় মূর্তি ভূমধ্যসাগর থেকে ভারতবর্ষ পর্যন্ত মাতৃমূর্তিরূপে পূজিতা হত। মহেন-জো-দাড়ো এবং হরপ্পাতেও এই জাতীয় মূর্তির সন্ধান পাওয়া গেছে। এছাড়া একটি কালো পাথরের স্তম্ভের ভগ্নাবশেষও তিনি দেখেছিলেন। এর পালিশ অনেকটা অশোকের স্তম্ভগুলোর পালিশের মতো সুন্দর এবং মসৃণ।

আশুতোষ চিত্রশালার ব্যাপক অনুসন্ধান ও খননের ফলে চন্দ্রকেতুরগড়ের প্রাচীনত্ব এবং ঐতিহাসিকতার প্রমাণগুলো সকলের সামনে আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রচুর রৌপ্য-লাঞ্ছিত মুদ্রা, খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের পোড়ামাটির শীল, রোমান পানপাত্র, গ্রিক প্রভাবিত পোড়ামাটির মূর্তি, মৌর্য-সুঙ্গ-কুষাণ যুগের বহু টেরাকোটা, কিছু খেলনা-রথ যার ভেতর হাতি, ভেড়া এবং ঘোড়ার মূর্তি আছে এবং যা বৈদিক দেবতা ইন্দ্র, অগ্নি ও সূর্যের বাহন হিসেবে পরিচিত। এছাড়াও অসংখ্য মিথুনমূর্তি পাওয়া গেছে যেগুলো আনুমানিক খ্রিস্টপূর্বাব্দ প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীর।

গুপ্ত যুগের তিনটি স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গেছে চন্দ্রকেতুরগড় থেকে। নিকটবর্তী হাতিপুর গ্রামের পুকুর থেকে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ও কুমারদেবীর বিবাহের দৃশ্যসম্বলিত একটি এবং আর একটি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের নামাঙ্কিত মুদ্রা সংগ্রহ করেন গ্রামবাসীগণ। হাবড়া শ্রীচৈতন্য মহাবিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রীগৌরীশঙ্কর দে মহাশয় গ্রামবাসীর কাছ

থেকে আর একটি স্বর্ণমুদ্রা সংগ্রহ করতে পেরেছেন, যার এক পিঠে ধনুর্ধর মূর্তি, অপর পিঠে লক্ষ্মীমূর্তি এবং 'সমুদ্র' কথাটি লেখা আছে। দুর্লভ এই মুদ্রাগুলো একমাত্র বেড়াচাঁপাতেই পাওয়া গেছে—স্থানটির প্রাচীনত্বের এ-ও এক প্রমাণ।

আর একটি পোড়ামাটির সূর্যের রথ পাওয়া গেছে যার সঙ্গে তুলনীয় একমাত্র পশ্চিম ভারতের পর্বতগুহায় পাথরে খোদাই ছবিগুলো। খনা-মিহিরের ঢিবির কাছ থেকে একটি লাল পাথরের বুধমূর্তি পাওয়া গেছে যা মথুরার শিল্পীদের দ্বারা তৈরি বলে বিশ্বাস করা হয়। একটি মহাবীরের মূর্তি সংগ্রহ করেছেন শ্রীগৌরীশঙ্কর দে—যেটি সর্বপ্রথম এখান থেকেই পাওয়া যায়। পাওয়া গেছে রোমান মহিলার আবক্ষমূর্তি। রোমের সঙ্গে যোগাযোগের স্মারক চিহ্ন হিসেবে মিলেছে তৈলস্ফটিক, নীল কাচ ইত্যাদি। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগের প্রমাণও এইসব প্রত্নসামগ্রী।

এছাড়াও প্রাচীনকালে মন্দিরগুলো কিভাবে তৈরি হত তার ছোটো ছোটো পোড়ামাটির নমুনাও অসংখ্য পাওয়া গেছে। ১৯৫৭ সালের মার্চ মাসে দু'সপ্তাহ ব্যাপী খনন ও অনুসন্ধানের ফলে একটি আশ্চর্য আবিষ্কার চন্দ্রকেতুরগড়ের প্রাচীনত্বকে আরো স্পষ্ট করে তুলেছে। দেখা গেছে বিভিন্ন যুগের সভ্যতার স্তরগুলো এই জায়গাটির মাটির নীচে প্রায় অক্ষত অবস্থাতেই আছে। মৌর্য-সুঙ্গ-কুষাণ যুগের ঘরবাড়ির চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে। স্পষ্ট দেখা যায় মাটি, কাঠ, বাঁশ, টালি দিয়ে তৈরি সেইসব ঘরবাড়ি। এমনকি একবার আগুন লেগে নগরীর অনেক বাড়ি যে নষ্ট হয়েছিল তাও পরিলক্ষিত হয়। মৌর্য যুগের একটি পয়ঃপ্রণালীর চিহ্নও আবিষ্কৃত হয়েছে ওই খননের ফলে।

চন্দ্রকেতুরগড়ের উৎখননকারীদের মতে, এই এলাকায় জনবসতি গড়ে উঠেছিল খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম থেকে অষ্টম শতকে। একে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল বিশাল জনবসতি। ভাগীরথীর প্রধান উপনদী বিদ্যাধরী এবং ছোটো পদ্মানদীর পাড়ে গড়ে ওঠা এই নগরীর সঙ্গে বরেন্দ্রভূমির প্রাচীন নগরবিশেষ, বাণগড়, মহাস্থানগড় ইত্যাদির বেশ সামঞ্জস্য আছে। দেবালয়, হাদিপুর, শানপুকুর, ঝিকড়া এইসব গ্রাম নিয়ে প্রায় দুই বর্গমাইল এলাকা জুড়ে প্রত্নক্ষেত্র বিছিয়ে রেখেছে চন্দ্রকেতুরগড়। উৎখনন দেখিয়েছে, প্রাক্ গুপ্তযুগ স্তরে কাঠ ও বাঁশের তৈরি ঘর, টালির ছাদ, মাটির দেওয়ালের নিদর্শন। গুপ্তযুগে ইটের বাড়ি তৈরির সূচনা। প্রাচীর বেষ্টিত এলাকার মধ্যে এই পাকাবাড়ির নমুনা মিলেছে। হাদিপুর অঞ্চলে কঞ্চির বেড়া, টালির ছাদ, মাটির মেঝে, শস্যাগার, ইঁদারা, মৃপাত্র, তামার পাত্র, টেরাকোটার অসংখ্য মূর্তি, হাতির দাঁতের সূচও পাওয়া গেছে।

এই বেড়াচাঁপা থেকে দশ মাইল দূরে গোপালপুর গ্রামে মৌর্যযুগের কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে আর আট মাইল দক্ষিণে খাস-বালান্দা গ্রামে গুপ্তযুগের একটি মন্দির আবিষ্কৃত হয়েছে যা পরবর্তী মুসলমান যুগে মসজিদে রূপান্তরিত হয়েছিল।

এই বালান্দাই কি বালবল্লভী রাজ্য—যেখানে মন্ত্রী ছিলেন মহাপণ্ডিত ভবদেব ভট্ট? নেপালি পুঁথিতে উল্লিখিত বালান্দা মহাবিহার-ই কি এই খাস-বালান্দার মন্দির? আর কিছু দূরবর্তী ভাঙ্গড় গ্রামে পাওয়া বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রী মূর্তি—এই কি বিহারের প্রধান মূর্তি? হয়তো তাই। আর তাই সুঙ্গ-কুষাণ-গুপ্তযুগের ঐতিহ্যবাহী ওই বিদ্যাধরীর তীরে ধারাগ্রামে

পালযুগের নিদর্শনও উৎকীর্ণ রয়েছে মূর্তিতে। উপেক্ষা করতে পারেননি পাল সম্রাটগণ এই বিশাল নগরীকে। কিন্তু সেনযুগের কোনো চিহ্ন নেই বেড়াচাঁপাতে, আছে পরবর্তী মুসলমান যুগের মসজিদ আর অলংকৃত টেরাকোটা, আছে অজস্র কিংবদন্তীর গল্প।

ওই খাস বারান্দারই নিভৃত সমাধিতে ঘুমিয়ে আছেন পীর গোরাচাঁদ—যিনি এসেছিলেন রাজা চন্দ্রকেতুর রাজ্যে ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে।

কে এই রাজা চন্দ্রকেতু? ইতিহাস নীরব। কোথাও কোনো শিলালিপি, কোনো তাম্রশাসন উৎকীর্ণ করেনি এই রাজার কোনো দর্পিত দানের স্বাক্ষর, কোনো দ্বিগ্বিজয়ের ইতিবৃত্ত।

শুধু বেড়াচাঁপার মানুষ আগ্রহী শ্রোতার কাছে বললেন এক আশ্চর্য কাহিনি। তাঁরা বললেন, বিধর্মী শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন রাজা চন্দ্রকেতু। সঙ্গে নিয়েছিলেন একটি সাদা এবং একটি কালো পায়রা। বলে গিয়েছিলেন রাজা, 'রানি, আমি যদি যুদ্ধে জিতি তবে সাদা পায়রা উড়ে আসবে তোমার কাছে। যদি হারি তবে কালো পায়রা।' প্রতীক্ষা করছিলেন রানি। যুদ্ধে জিতেও ছিলেন রাজা চন্দ্রকেতু। কিন্তু ঘটনাচক্রে ছাড়া পেয়ে উড়ে এল কালো পায়রাটি। পরাজয়ের নিশ্চিত চিহ্ন দেখে দিঘির জলে আত্মহত্যা করলেন রানি। বিজয়ী রাজা ফিরে এসে এই মর্মন্তুদ দৃশ্য দেখে নিজেও আত্মহত্যা করলেন। ফলে রাজ্য অধিকার করে নিলেন মুসলমান শাসকেরা।

কবে কোথায় কোন্ দিঘির জলে আত্মবিসর্জন দিয়েছিলেন রানি আজ আর কেউ তা জানেন না, কোন্খানে ছিল রাজা চন্দ্রকেতুর প্রাসাদ তাও আজ অজানা, শুধু সকলের মনে আজো বিজয়ীর আসনে বসে আধিপত্য করছেন রাজা চন্দ্রকেতু। আর যে পীর গোরাচাঁদ একদিন অলৌকিক চাঁপাফুল ফোটানোর খেলায় বিস্মিত করেছিলেন এ রাজ্যের অধিবাসীদের তিনিও আজ অতীত। অদূরে খাস-বালান্দায় তাঁর সমাধিকে ঘিরে বছরে একটি দিন বিরাট মেলা বসে। দূর-দূরান্ত থেকে ভক্তজন আসেন সেই মেলায়, আসে ওই বিদ্যাধরী বেয়ে পণ্যবাহী নৌকোর মিছিল।

না, সেই বিদ্যাধরীর প্রবল প্রবহমানতা আজ আর নেই। হারিয়ে গেছে মৌর্য-সুঙ্গ-কুষাণ-গুপ্ত-পাল আর মধ্যযুগের সম্রাটদের লীলাভূমি সুবিশাল 'গঙ্গে' বন্দর। ইংরেজ আমলের সেই ছোটো রেলপথও আজ নেই। এখন শ্যামবাজার, বসিরহাট, ইটিণ্ডাঘাট যাবার বাস রাস্তা প্রাচীন এই জায়গাটির বুকের ওপর দিয়ে বহন করছে অগণিত যাত্রী আর পণ্যসামগ্রী।

আজ এখানে ব্লক উন্নয়ন অফিস, পলিটেকনিক্যাল স্কুল, ছাত্র ও ছাত্রীদের উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ব্যাঙ্ক, পশু-চিকিৎসা কেন্দ্র, ব্যক্তিগত উদ্যোগে সংগ্রহশালা হল হয়েছে। বৈদ্যুতিক আলো উদ্ভাসিত করেছে সভ্যতার আলোয় একদা উজ্জ্বল মহানগরী গঙ্গে, আজকের এক নগণ্য গ্রাম বেড়াচাঁপাকে। মহানগরীর সেই প্রশস্ত চিহ্নও নেই, নেই কলকোলাহল মুখর নগরজীবনের চঞ্চল-চাপল্য। শান্ত-স্নিগ্ধ এই গ্রাম বেড়াচাঁপা শুধু এখন রথযাত্রা আর বাসন্তী পুজোর দিন আনন্দে উদ্বেল হয়ে ওঠে। গ্রামবাসীগণ বলেন, চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোর সমারোহ বর্ণাঢ্যতার সঙ্গে এখানকার বাসন্তী পুজোর উৎসবকে অনায়াসে তুলনা করা যেতে পারে। প্রধান সড়কের একপাশে আছে কালীবাড়ি, নিত্য পুজো হয় সেখানে। দূরের বিদ্যাধরী যেন অতীত স্মৃতির এক অশ্রুরেখার মতো ম্লান; বিষণ্ণ। গ্রিস-রোম-মিশর-চিনের সপ্তডিঙ্গা আর এসে পৌঁছয় না বেড়াচাঁপার ঘাটে, বিদেশি পর্যটক আর বণিকের

পদচিহ্ন, বিস্ময় বিমুগ্ধ উচ্চারণ আর কেনা-বেচার কলরোলে মুখর হয় না গঙ্গে বন্দর, এক সময়ে পদ্মা-ইছামতী-কালিন্দী-রায়মঙ্গল হয়ে সমুদ্রগামী হতেন জনপদ বীরেরা যে বন্দর থেকে। তবে এখনো সেই ঐতিহ্যের ক্ষীণধারা যেমন বিদ্যাধরীর স্তিমিত প্রবাহ বহন করে চলেছে, তেমনি মাঝে মাঝে গাড়ি হাঁকিয়ে আসেন সৌখিন বিদেশি পর্যটক আর দেশি সংগ্রাহকেরা। কিন্তু গঙ্গে বন্দর দেখতে নয়, বহুমূল্য ব্যয় করে প্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শন সংগ্রহ করতে। বন্দরের কাল শেষ হয়েছে যে!

আসেন কৌতূহলী অনুসন্ধিৎসু মানুষ, বিচক্ষণ ঐতিহাসিকগণ। তাঁরা এর প্রায়-বিলুপ্ত চিহ্নগুলোর এমন দ্রুত নিশ্চিহ্ন হবার সম্ভাবনা দেখে আতঙ্কিত ও আশঙ্কিত হন। স্থানীয় কয়েকজন ব্যক্তি সাধ্যমতো যত্ন ও গভীর মমতায় অনেক নিদর্শন সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। বস্তুত তাঁদের যদি এই উদ্যম না থাকত, আজ অতীত গরিমায় সমৃধ বেড়াচাঁপার কোনো চিহ্নই হয়তো পাওয়া যেত না। তাঁদের কাছে সমগ্র জাতিরই কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি অবিলম্বে এখানে একটি ট্যুরিস্ট লজ এবং মিউজিয়াম তৈরি করেন তবে বাংলার প্রাচীনতম এই রাজধানীটির অস্তিত্ব দীর্ঘকাল ধরে মানুষের শ্রধা বিস্ময় কৌতূহলকে আকর্ষণ করতে পারবে।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। আজ সারাদিন বেড়াচাঁপার ধ্বংসস্তূপের কাছে শুনে নেবার চেষ্টা করেছি এর বৈভব আর বিত্তের কাহিনি, এর পরাজয় আর পতনের ইতিবৃত্ত। এতবড়ো একটি রাজ্য তার সমস্ত ঐশ্বর্যকে হারিয়ে আজ এমন উপেক্ষা অনাদরে কেন নগণ্য গ্রাম হয়ে গেল তার কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা করছি।

বাংলাদেশে আবহমানের ইতিহাস বলে কোনো শক্তিশালী সম্রাটের পরাজয়, সিংহাসনের অধিকার নিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্ব, বিদেশি শত্রুর পদসঞ্চার, নদীর গতিপথ পরিবর্তন বা কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়—এরই ফলে বারবার বাংলার রাজধানীগুলো একস্থান থেকে অন্যস্থানে সরে গেছে খ্রিস্টীয় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকে। বাংলার রাজধানী গঙ্গের ঐশ্বর্য-সমৃধি উপেক্ষণীয় ছিল না, কিন্তু চতুর্থ শতক থেকেই দেখা যাচ্ছে পুষ্করণা, সমতট, বঙ্গ—এই তিনটি নাম বাংলার রাজধানী হিসেবে উল্লিখিত। তবে কি বিদ্যাধরী তখন গতিপথ পরিবর্তন করেছে! আর তার ফলে গঙ্গে বন্দর পরিত্যক্ত হয়ে নতুন রাজধানী স্থাপিত হয়েছে পুষ্করণায় বা সমতটে বা বঙ্গতে। নাকি এই তিনটি স্থানই কি ছিল সমগ্র বাংলার রাজধানী! নিশ্চয়ই তা নয়। তা হলে?

ইতিহাস বলে, পরবর্তী ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত সমগ্র বাংলার রাজধানী হিসেবে আধিপত্য পায় পুণ্ড্রবর্ধন। সপ্তম শতকে শশাঙ্কর গৌড়তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে পর্যন্ত এই পুণ্ড্রবর্ধন-ই প্রাচীন বাংলার উল্লেখযোগ্য রাজধানী। রাজধানী পরিবর্তনের এই বিচিত্র ধারার কারণ কিভাবে খুঁজে পাবো আমি? রাষ্ট্রবিপ্লব না প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বিদেশি অধিকার না নদীর গতি পরিবর্তন—গঙ্গে থেকে রাজধানী সরে যাবার কারণ কি? আজ সারাদিন তারই কোনো নিদর্শন খুঁজে পাবার চেষ্টা করেছি অবিরাম।

এখন অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। এবার ফিরতে হবে আমাকে। না, কোনো পর্যটক-তরী বিদ্যাধরীর ঘাটে অপেক্ষা করে নেই। এই গঙ্গে বন্দর থেকে পাল তুলে সে তরী গিয়ে

ভিড়বে না দূরের ডায়মণ্ডহারবারের কাছে প্রাচীন হরিনারায়ণপুর বন্দরের ঘাটে। অথবা এই বিদ্যাধরীর আর এক শাখা লাবণ্যবতী বেয়ে আধুনিক ব্যারাকপুরের কাছে বিলুপ্ত আর এক বন্দরের ঘাটে।

চকিতে মনে পড়ল, ওই লাবণ্যবতীই তো এখন নাউই নদী বা কাটাখাল নামে পরিচিত। আর ওর পাশেই তো আছে এক জনপদ—যার নাম 'গঙ্গানগর'।

তবে কি এই নাম হাজার হাজার বছর আগের সেই স্মৃতিকেই বহন করছে নদী লাবণ্যবতীর জলধারার মতো! কে জানে, ঐতিহাসিকরা এ বিষয়ে ভেবে দেখেছেন বা দেখবেন কিনা! আর একটু পরেই এই শতাব্দীর যান্ত্রিক সভ্যতার কর্কশ আর্তনাদ তুলে এসে দাঁড়াবে কলকাতাগামী বাস। গঙ্গে থেকে এবার এগোতে হবে গঙ্গার দিকে।

বাস আসার আগে বার বার ঘাড় ঘুরিয়ে ধ্বংসস্তূপগুলো দেখার চেষ্টা করি। অন্ধকার ঢেকে গেছে তাদের অস্তিত্ব। আধুনিক সভ্যতার বিদ্যুৎচমকে উদ্ভাসিত বেড়াচাঁপার মাটির গভীরে যেন প্রতীক্ষায় স্তব্ধ হয়ে আছে প্রাচীন সভ্যতার আদিমতা।

গড়ের সিংহদ্বারে আজ আর রাজপ্রহরীর অতন্দ্র পদচারণা নেই, আছে হিংস্র শ্বাপদের নিঃশব্দ আনাগোনা, মন্দিরে আজ আর পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণ হয় না, সন্ধ্যারতির ঘণ্টা বাজে না—শুধু মাঝে মাঝে সরীসৃপের বিষাক্ত নিঃশ্বাসের শব্দে শিউরে ওঠে মন্দিরের ভগ্নাবশেষ। নিভে যাবে আর একটু পর বেড়াচাঁপার আলো। নিবিড় অন্ধকারে শুধু সহস্র তারার আলো আর জোনাকি গঙ্গে নগরীর হৃদপিণ্ডের মতো আশায়-নিরাশায় জ্বলবে আর নিভবে। দূরে বিদ্যাধরীর স্রোতের শব্দ ক্ষীণ বিলাপের ধ্বনির মতো বাতাসে গুমরে উঠবে। ভোরের প্রতীক্ষা করবে চন্দ্রকেতুরগড়। কবে কে এসে নিশ্চিত প্রমাণের আলোয় উদ্ভাসিত করবে তাকে। সব শঙ্কা উৎকণ্ঠা শেষ হয়ে প্রমাণিত হবে এই সেই 'গঙ্গে' নগরী। নতুন কালের নতুন মানুষেরা কবে এই সুপ্রাচীন গৌরবের পীঠস্থানকে যথোচিত মর্যাদায় অভিষিক্ত করবে!

বাস আসছে। বেড়াচাঁপা ছাড়বার আগে ভাবছি, পীর গোরাচাঁদের ফোটানো সেই অলৌকিক চাঁপার সুবাস কেমন ছিল জানি না, কিন্তু প্রাচীন ঐতিহ্য ঐশ্বর্যের লৌকিক সুবাস আজ হাজার বছর পরেও এখনো মিলিয়ে যায়নি। এই মুহূর্তে যদি উপযুক্ত যত্ন না নেওয়া হয়, তবে কালের অনিবার্য আক্রমণে একদিন তা নিঃশেষে হারিয়ে যাবে—দেশকে যাঁরা সামান্য মাত্রাতেও ভালোবাসেন, তাঁদের নিঃশ্বাস তবে রুদ্ধ হয়ে আসবে—আবহমান বাংলার ইতিহাসের বাতাস আবিল হয়ে উঠবে মলিনতায়।

পৌণ্ড্রবর্ধন/পুণ্ড্রবর্ধন/মহাস্থানগড়

যে স্থানের পূর্বকথা করিলে স্মরণ
অনুরাগে উথলিয়া উঠে প্রাণ মন।
যেখানে আমার পিতা পিতামহগণ
....চিরদিন করি মান, যশের বিকাশ
পুরুষে পুরুষে সুখে করেছেন বাস।
....এত প্রেম এত ভক্তি? বন্ধন যেই স্থলে
আহা! আহা!
আর কি এমন স্থান, পাব ধরাতলে?
—মনোমোহন বসু

নদীর নাম করতোয়া।

আমার একটুকরো শৈশবকে আজো মায়ের মতো বুকে ধরে রেখেছে ওর স্বচ্ছ জলধারা। আমার পিতৃভূমি বগুড়ার কণ্ঠলগ্না ওই নদী আমার শুধু ব্যক্তিগত স্মৃতিকে বহন করেই স্মরণীয় নয়, এরই তীরে রয়েছে এই দেশের ইতিহাসের শৈশবের দিনগুলোরও এক গৌরবময় অধ্যায়ের স্মৃতিময় নীরব প্রত্নসম্ভার—যা ওই নদীকে দিয়েছে ঐতিহাসিক গরিমা। ওই করতোয়া থেকে সাত মাইল দূরে পশ্চিমে মহাস্থানগড়ের গভীরে নীরবে অপেক্ষমান বাংলায় প্রাচীনতম সমৃদ্ধতম নগরী রাজধানী পুণ্ড্রবর্ধনের অতীত কাহিনি।

বস্তুত, পুণ্ড্রবর্ধন তো শুধু একটিমাত্র স্থানের নাম নয়—ইতিহাসের পঞ্চম শতকে গুপ্তযুগে বাংলার একটি প্রধান ভুক্তি ছিল পুণ্ড্রবর্ধন—বর্তমান বগুড়া দিনাজপুর রাজসাহী জেলা জুড়ে ছিল যার বিস্তৃতি। শুধু সারা বগুড়া জেলাতেই ছড়ানো রয়েছে ইতিহাসের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ঘটনার টুকরো। মহাস্থানগড়েই নয়—আমার গ্রামে যেতে যে আদমদিঘি রেলস্টেশনে নামতে হত, সেখানে নাকি বাস করতেন বাবা আদম নামে এক অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ফকির। তাঁরই নামে দরগা-দিঘি আজো ধর্ম নির্বিশেষে মানুষের শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করে। আর আমার গ্রাম ওই কুশুম্বিই কি সেই কৌশম্বী পরগণা যার অধিপতি দ্বোপরবর্ধন যিনি পাল সম্রাট রামপালকে ক্ষৌণী-নায়ক ভীমের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সহায়তা করেছিলেন? কে জানে! শুধু জানি, আমাদের গ্রামের পুকুর থেকে বিভিন্ন সময় পাওয়া গেছে অনেক পোড়ামাটির প্রত্নরত্ন যা অ-লিখিত ইতিহাসের উপাদান হয়ে হঠাৎ মানুষের কাছে উপস্থিত হয়ে আবার হারিয়ে গেছে বিস্মৃতির অন্ধকারে।

শুধ্ হারায়নি ওই নদী। বহু যুগের ওপার থেকে উৎসারিত হয়ে আজো অজস্র ঢেউয়ের মৃদু গুঞ্জনের স্বরে পর্যটকের কানে কানে অস্ফুট ভাষায় বলে চলেছে লৌকিক অলৌকিক পুরাণ ইতিহাসের অসংখ্য কাহিনি!

নদীর নাম করতোয়া!

'অমরকোষ' বলে, না, ওই নদীর নাম সদানীরা। শতপদ ব্রাহ্মণও সমর্থন করে এই নামটিই।

কিন্তু স্কন্দপুরাণ ভক্তি বিগলিত ভাষায় মাহাত্ম্য কীর্তনের সুরে স্পষ্ট জানায়, ওই নদীর নাম করতোয়া। কারণ হর-গৌরীর বিবাহকালে গিরিরাজ হিমালয়ের করভ্রষ্ট হয়ে এই জলধারা মর্তে প্রবাহিত। তাই করতোয়া। মন্ত্রপূত এই নদীর জলে স্নান করলে বারাণসীতে পৌষ-নারায়ণী যোগে স্নানের দ্বি-গুণ ফল পাওয়া যায়। বর্ষাকালে যখন অন্য নদ-নদী মলিনতায় ঢেকে যায় তখন একমাত্র করতোয়ার জলই বিশুধ্বতা ধরে রাখে নিজের বুকে। এই সেই নদী করতোয়া, মহাভারতের বনপর্বে তীর্থযাত্রা অধ্যায়ে যার সম্বন্ধে বলা হয়েছে এর জলে স্নান ও তিন রাত উপবাস করলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়। লঘু ভারতের ভাষায় 'বৃহৎ পরিসরা পুণ্যা করতোয়া মহানদী'। দ্বাদশ শতকে রচিতও হয়েছে করতোয়া মাহাত্ম্য কাহিনি।

সন্দেহ নেই করতোয়া বহন করে চলে সুদীর্ঘ এক ঐতিহ্যের ধারা। অলৌকিক গল্পের আবরণ সরিয়ে পর্যটক যদি করতোয়ার তীরে এসে দাঁড়ান—তাহলেও তিনি স্পষ্ট দেখতে পারবেন এর জলে প্রতিবিম্বিত হচ্ছে লোককথার এক বিচিত্র অধ্যায়। করতোয়ার বাম তীরে ৩০ বর্গ মাইল জুড়ে আছে মহাস্থানগড়ের ধ্বংসাবশেষ যার মধ্য থেকে মৌর্যব্রাহ্মী লিপিখণ্ডের আবিষ্কার ও ওই লিপিতে পুন্দনগলের উল্লেখ, করতোয়া মাহাত্ম্যের বর্ণনা—নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে এই সেই জনস্থান পৌণ্ড্রবর্ধন, সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত'-এ যাকে বলা হয়েছে বরেন্দ্রীয় মুকুটমণি, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম স্থান—

'বসুধাশিরো বরেন্দ্রীমণ্ডল চূড়ামণেঃ কুলস্থানম্'। করতোয়া মাহাত্ম্যের ভাষায় 'আদ্যক ভুবোভবনম্'—পৃথিবীর আদিভবন।

সেই সমৃধি শুধু ইতস্তত ছড়ানো পুরাবস্তু ছাড়া আজ আর তার কোনো চিহ্ন নেই। বাংলার ইতিহাসে পালযুগে রাষ্ট্রবিন্যাসের যে তিনটি ভুক্তি বা বিভাগ ছিল তার মধ্যে বৃহত্তম পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি, তারপর বর্ধমানভুক্তি এবং শেষে দণ্ডভুক্তি। যার রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক কায়িক কোনো অস্তিত্বই নেই।

অথচ পুণ্ড্রবর্ধন ছিল উত্তরবাংলার সর্বপ্রধান ও সর্বপ্রাচীন নগর। এর উল্লেখ আছে কলহণের রাজতরঙ্গিণীতে তো বটেই, এর উল্লেখ রয়েছে কথামঞ্জরী ও দিব্যাবদানেও। বৌদ্ধপুরাণ বলে, স্বয়ং বুদ্ধদেবও কিছুদিন এখানে এসে ধর্মপ্রচার করেছিলেন।

সবচেয়ে প্রাচীন উল্লেখ আছে সম্ভবত ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এবং বৌধায়ন ধর্মসূত্রে। অবশ্য পুণ্ড্রবাসীদের আর্যভূমির প্রাচ্য-প্রত্যন্তদেশের দস্যু বলা হয়েছে প্রথম গ্রন্থে, দ্বিতীয়টির মতে সংকীর্ণ যোনি, অপবিত্র বঙ্গ ও কলিঙ্গের প্রতিবেশী। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের শুনঃশেপ আখ্যানে এর সমর্থন আছে। আছে মহাভারতের আদিপর্বেও। তবে সভাপর্বে পুণ্ড্রদের শুদ্ধজাত ক্ষত্রিয় বলা হয়েছে। কথিত আছে, মহাবীর কর্ণ পুণ্ড্রদের পরাজিত করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের

কাছেও পৌণ্ড্রদের পরাজিত হতে হয়েছিল। এক্ষেত্রে যদিও ভীমের কৃতিত্বই বেশি। তিনি মুদগগিরি বা মুঙ্গেরের রাজাকে নিহত করে প্রতাপশালী পুণ্ড্ররাজ ও কোশীনদীর তীরবর্তী অন্য একজন নৃপতিকে পরাজিত করে বঙ্গ আক্রমণ করেন। এইসব বিবরণ প্রমাণ করে পুণ্ড্রবর্ধনের প্রাচীনত্ব। তাছাড়া জৈনগ্রন্থ কল্পসূত্রে জৈন সন্ন্যাসীদের যে তিন শাখার কথা আছে তার সবকটিই বাংলায় জনপদভুক্ত—যেমন তাম্রলিপ্তি শাখা, কোটীবর্ষ শাখা ও পুণ্ড্রবর্ধন শাখা। কোটীবর্ষ পুণ্ড্রবর্ধনেরই প্রসিদ্ধ নগর।

খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে মহাস্থান লিপিতে যে পুন্দনগল-এর উল্লেখ দেখি, সেই পুন্দনগলই পুণ্ড্রের রাজধানী পুণ্ড্রবর্ধন—বর্তমান বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়।

যদিও পরবর্তীকালে, পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে এই জনপদ পুরোপুরি গুপ্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান ভুক্তিতে পরিণত হয়েছে। এইখানেই এসেছিলেন চৈনিক পরিব্রাজক হিউ-এন-সাঙ। কজঙ্গল, অর্থাৎ রাজমহল গঙ্গা ভাগীরথী হয়ে করতোয়ায়—পুণ্ড্রবর্ধন ভ্রমণ শেষে করতোয়া পার হয়ে গিয়েছিলেন কামরূপে। কজঙ্গল ও করতোয়ার মধ্যবর্তী সমগ্র উত্তরবাংলা ছিল পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তি র অন্তর্গত—সীমা উত্তরে হিমবচ্ছিখর, দক্ষিণে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনপদ অবধি।

অষ্টম শতকে ধর্মপালের খালিমপুর লিপি অনুযায়ী পুণ্ড্রবর্ধনের সীমা দক্ষিণে ব্যাঘ্রতটীমণ্ডল অবধি অর্থাৎ ব্যাঘ্রাধ্যুষিত বনময় সুন্দরবন পর্যন্ত। সেন আমলেও দক্ষিণতম সীমা পশ্চিমে খাড়িমণ্ডল অর্থাৎ বর্তমান চব্বিশ পরগনা পর্যন্ত। অপরদিকে ঢাকা-বাখরগঞ্জ—বিক্রমপুরও এর অন্তর্গত ছিল। একমাত্র রাঢ় অঞ্চলের কোনো জনপদ কখনো এই ভুক্তির অন্তর্গত হয়নি।

দশম শতকে পুণ্ড্রবর্ধনের কেন্দ্র বা হৃদয়স্থান হিসেবে গড়ে ওঠে বরেন্দ্রভূমি—সন্ধ্যাকর নন্দী রামচরিত-এ যাকে বলেছেন পালরাজাদের জনকভূমি বা পিতৃভূমি। সিলিমপুর, তপনদিঘি ও মাধাইনগর পট্টোলীতে বরেন্দ্রী যে পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির অন্তর্গত তার উল্লেখ আছে। যদিও তারানাথের বিবরণে আছে পাল সম্রাট গোপাল পুণ্ড্রবর্ধনের কোনো ক্ষত্রিয় বংশে জন্মেছিলেন। পরে তিনি ভঙ্গলের (বঙ্গ বা বঙ্গালের) রাজা হন।

সুবিস্তৃত সুপ্রাচীন এই নগরীর আর কি পরিচয় আছে? কারা ছিলেন এর শাসনকর্তা? কেমন ছিল এই জনপদ? কিভাবে একদিন তা প্রকৃতির কোলে মাটিতে গভীর গোপনে নিজেকে লুকিয়ে ফেলল?

অতি সম্প্রতি দেবব্রত মালাকার নামে জনৈক গবেষক প্রমাণ করতে চেয়েছেন, উত্তর দিনাজপুরের ইটাহার ব্লকের চুড়ামন গ্রাম থেকে বটুন গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকাই হলো পুণ্ড্রবর্ধন। কেননা চুড়ামন ছিল প্রথম পাল সম্রাট গোপালের এবং বটুন বা বটগ্রাম ছিল কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর বাসভূমি। এরই মাঝখানে অবস্থিত একডালা দুর্গ।

আমার মন মহাস্থানগড়ের ধ্বংসাবশেষ স্পর্শ করে জেনে নিতে চায় সেই কাহিনি।

ইতিহাস জানায় মৌর্যযুগে পুণ্ড্রবর্ধন শাসন করতেন জনৈক মহামাত্র। গুপ্তযুগে এর সমৃদ্ধি পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। শুধু শাসন পরিচালনার ক্ষেত্র হিসেবেই নয়, ধর্মশিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবেও প্রায় ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত এর গৌরব অম্লান ছিল। য়ু-য়ান চোয়াঙ বা হিউ-এন-সাঙ লিখেছেন, এই গড়ের পরিধি ছিল

১০ কিমি'রও বেশি অর্থাৎ ৬ মাইলেরও বেশি। সুসজ্জিত বিহার, কানন, পুষ্পোদ্যান, ফলের বাগান—সুভদ্র নাগরিকের সমাদরে পুণ্ড্রবর্ধন ছিল নয়ন-রঞ্জক, চিত্তাকর্ষক এবং বসবাসের পক্ষে আদর্শ স্থান। এরপর এলো পাল ও সেনযুগ। তখনো পুণ্ড্রবর্ধন বরেন্দ্রীর মুকুটমণি, করতোয়া মাহাত্ম্য গ্রন্থের ভাষায় পৃথিবীর আদিভবন।

ওই সেই নদী করতোয়া! যার বামতীরে তিরিশ বর্গ মাইল জুড়ে আজো সেই পুণ্ড্রবর্ধনের অতীত গৌরবের স্মৃতিচিহ্ন ছড়ানো। অসংখ্য পোড়ামাটির ফলক, পাথর প্রতিমা, ভগ্ন প্রাসাদ, মুদ্রা আর মৌর্য ব্রাহ্মী ভাষায় লেখা বাংলার সর্বপ্রাচীন লিপি বার বার স্মরণে আনে শ্রাবস্তীর কারুকার্য, বৈশালীর বৈভবের উপমা! নীরবে সাক্ষ্য দেয় বাংলার ইতিহাসের সমৃদ্ধির এক অধ্যায়। মহাস্থানগড়—কেন এর নাম মহাস্থান? স্কন্দপুরাণে আছে বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার পরশুরাম তপস্যা করার জন্য শাস্ত্রানুযায়ী চতুঃষষ্ঠী দোষবর্জিত এ স্থানে এসেছিলেন বলে এর নাম মহাস্থান। ওই সেই পরিখা-চিহ্নিত প্রাকারে ঘেরা পুণ্ড্রবর্ধনের নগর অংশ, প্রাকারের বাইরে ওই জনপদ নগরোপকণ্ঠ। সমতলভূমি থেকে ১৫ ফুট উঁচু, চারদিকে প্রাকার, চার কোণে প্রাকারমঞ্চ, প্রাকারের বাইরে পরিখা—পূর্বদিকে ওই সেই নদী করতোয়া। নগর ও নগরের বাইরে যাবার জন্য সুপ্রশস্ত নগরদ্বার—উত্তরে ঘাঘর দরজা, পশ্চিমদিকে উত্তর কোণে যে প্রথম দ্বার—লোকস্মৃতিতে আজো তা তাম্র-দরোয়াজা নামে বিলুপ্ত বৈভবের কথা জানায়। পূর্বদিকে শিলাদেবীর ঘাটে যাবার জন্য আর একটি দ্বার—এই ঘাটেই আজো প্রতি বছর পূণ্যদিবসে স্নান করতে আসেন পুণ্যার্থীরা। এখনো নগরের ভেতরের বিভিন্ন দ্বারের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করেছে দীর্ঘ সোজা পথ। ওই সেই বৈরাগী ভিটা আর গোবিন্দভিটা—খননকার্যের ফলে যেখান থেকে বেরিয়েছে মন্দিরের লুপ্ত অবশেষ।

রাজছত্র ভেঙে গেছে, স্তব্ধ হয়েছে রণডঙ্কার শব্দ। নগরের ভেতর রাজপ্রাসাদ, অধিকরণ গৃহ, বণিক নাগরিকদের বাসস্থান, সভাগৃহ—সব অনিবার্যকালের প্রহারে ভেঙে গুঁড়িয়ে ধূলায় হয়েছে ধূলি! রামচরিতের বর্ণনায়—যে সারি সারি দোকান, কৃষক, শ্রমিক, গৃহস্থের আবাসের কথা আছে—তার চিহ্নও ইতস্তত ছড়ানো ওই নগরোপকণ্ঠে।

আমার মন পথে হাঁটে। এখানে কোথায় এসেছিলেন অষ্টম শতকের সেই কাশ্মীররাজ জয়াপীড় আর ছদ্মবেশে এসে এক বিচিত্র নাটকীয় ঘটনার মুখোমুখি হয়েছিলেন? আজ কেউ বলে দিতে পারে না সেই নির্দিষ্ট স্থানের ঠিকানা। শুধু কল্‌হণের রাজতরঙ্গিণীর সেই কাহিনি দূরাগত সংগীতের মতো গুঞ্জন তোলে মনে। তখন পুণ্ড্রবর্ধনের সম্রাট ছিলেন জয়ন্ত। পুণ্ড্রবর্ধনের সমৃদ্ধি তখন দেশে দেশে বিস্ময় আর কৌতূহলের আকর হয়ে উঠেছে। তারই আকর্ষণে ছুটে এসেছিলেন কাশ্মীররাজ জয়াপীড়। আমন্ত্রিত সফর নয়—কাজেই এসেছিলেন ছদ্মবেশে। রাজ্যের ঐশ্বর্য তাঁর চোখে বিস্ময় আর মুগ্ধতার আবেশ ছড়িয়ে দিচ্ছিল বার বার। রাজ্য পরিক্রমা করতে করতে একদিন স্কন্দমন্দিরে এক রাজনর্তকীর অপরূপ নৃত্যকলা দেখে থমকে দাঁড়ালেন তিনি। তাঁর স্তব্ধ বিস্মিত চোখের আবেশ এক অলৌকিক আনন্দের ছোঁয়ায় যেন নিষ্পলক হয়ে গেল। ভুলে গেলেন জয়াপীড় যে তিনি ছদ্মবেশী এক সাধারণ নাগরিক মাত্র। তাঁর মনে হল, তিনি যেন কাশ্মীরের রাজসভাতেই এক অনির্বচনীয় নৃত্য সম্ভোগ করছেন চিরাচরিত প্রথায়। তাই অভ্যাস মতো বার বার

পেছনে হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি—যেন সম্রাটের তাম্বুল-দানকারি তাঁরই পেছনে অপেক্ষা করছেন। নৃত্যের ছন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছেন রাজনর্তকী। হঠাৎ তার বিদ্যুৎগর্ভ কটাক্ষ থমকে দাঁড়ালো সম্ভ্রান্ত দর্শন জয়াপীড়ের অভ্যাসের মুদ্রার ভঙ্গিতে! এ কি! ইনি তো সাধারণ নাগরিক নন। নৃত্যেরই ছলে রাজনর্তকী সুবর্ণপাত্রে তাম্বুলপত্র নিয়ে দাঁড়ালেন তাঁর পেছনে! বিনা দ্বিধায় তাম্বুল নিলেন জয়াপীড়। আর সেই মুহূর্তে একটি তীব্র প্রশ্নের আঘাতে সচকিতে ফিরে এলেন তিনি বাস্তবে! —কে আপনি?

বুঝতে পারেন জয়াপীড়, ছদ্মবেশ তাঁকে আড়াল করলেও রাজকীয় অভ্যাস সেই পোশাকের আবরণ ভেদ করে মূর্ত হয়ে উঠেছে। পরিচয় দিলেন তিনি সঙ্গোপনে। আর নৃত্যশেষে নর্তকীর অনুরোধে তাঁরই ঘরে আতিথ্য গ্রহণ করলেন তিনি। লোকচক্ষুর আড়ালে আনন্দেই ছিলেন জয়াপীড়, কিন্তু হঠাৎ পুণ্ড্রবর্ধনের অরণ্যে এক নরঘাতক সিংহের অত্যাচার প্রবল হয়ে আতঙ্কগ্রস্ত করল জনপদকে। সম্রাট জয়ন্ত ঘোষণা করলেন সিংহনিধনকারীকে তিনি পুরস্কার দেবেন। নর্তকীর মুখে জয়াপীড় শুনলেন সেই ঘোষণার কথা। তাঁর রাজরক্ত সংগ্রামের গর্জন শুনতে পেল। সকলের অজ্ঞাতে গভীর নিশীথে বেরিয়ে তিনি বধ করলেন সেই সিংহকে। পরদিন নগরবাসী সবিস্ময়ে শুনল সেই শৌর্যের কাহিনি। সম্রাট জয়ন্ত আনন্দিত হয়ে বীরবন্দনায় প্রস্তুত হলেন। আর তাঁর আনন্দ হঠাৎই এক অভাবিত সংবাদ পেয়ে বিমূঢ় হয়ে গেল—ওই মৃত সিংহের পাশে নাকি পাওয়া গেছে কাশ্মীররাজ জয়াপীড়ের কেয়ূর—তাঁর স্মারকচিহ্ন। মুহূর্তে চঞ্চল হয়ে উঠলেন জয়ন্ত। আর তখনই আত্মপ্রকাশ করলেন জয়াপীড়। প্রগাঢ় খুশিতে জয়ন্ত আলিঙ্গন করলেন জয়াপীড়কে। কাশ্মীর ও পুণ্ড্রবর্ধনের মৈত্রী দৃঢ় হল। আনন্দিত জয়ন্ত নিজের কন্যা ও রাজনর্তকীর সঙ্গে বিবাহ দিলেন জয়াপীড়ের। কাশ্মীররাজ ফিরে গেলেন দেশে দুই রানিকে সঙ্গে করে। কোথায় সেই স্কন্দমন্দির কে জানে! কোনো নর্তকীর নূপুরের শব্দ তেমন করে বেজে ওঠে না পুণ্ড্রবর্ধনের বাতাসে! কিংবদন্তীর গল্পগ্রন্থের পৃষ্ঠা থেকে শুধু বেজে ওঠে পর্যটকের মনে!

ওই শীলাদেবীর ঘাটকে ঘিরেও আর এক কাহিনির শব্দ আজও করতোয়ার ঢেউয়ে ঢেউয়ে বেজে ওঠে। ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত পুণ্ড্রবর্ধনে হিন্দু নরপতিদের প্রাধান্য। চতুর্দশ শতকে বাহ্লীক প্রদেশবাসী শাহ সুলতান হজরত আউলিয়া পুণ্ড্রবর্ধনের সম্রাট পরশুরামকে যুদ্ধে নিহত করে এই রাজ্য অধিকার করেন। গল্প বলে, সুলতান বিরাট এক মাছের পিঠে করে করতোয়া দিয়ে যাতায়াত করতেন—তাই প্রজারা তাঁর নাম দিয়েছিলেন মহী-সওয়ার। সম্রাট পরশুরামও ছিলেন মন্ত্রসিদ্ধ। দু'জনের লড়াই তাই বহুদিন চলে। অবশেষে পরশুরামের পরাজয় হয় এবং নিহত হন তিনি। তাঁর কন্যা শীলাদেবীর কঙ্কণের আঘাতে পীর সুলতানও নাকি নিহত হন। শীলাদেবী এরপর করতোয়ায় আত্মবিসর্জন দেন। যে ঘাটে তিনি আত্মত্যাগ করেন—সেই ঘাটই ওই শীলাদেবীর ঘাট। শোনা যায় এইচ. এল. টেলর নামে এক পর্যটক 'Lay of Mahasthangarh' নামে এই ঘটনাকে অবলম্বন করে একটি আখ্যানকাব্যও রচনা করেন।

কত যুগের কত ঘটনার মূক সাক্ষী এই মহাস্থানগড়! কোথায় সেই হিউ-এন-সাঙ-এর দেখা কুড়িটি বৌদ্ধ সংঘারাম, একশো মন্দির, ছয় হাজার বৌদ্ধ শ্রমণ! কবে পৌণ্ড্রবর্ধনের

মায়া কাটিয়ে চলে গেছেন শৈব-বৈষ্ণব-শক্তি-কার্তিকেয় উপাসক শিক্ষিত পুণ্ড্রবর্ধনবাসীরা— শুধু যেন তাঁদের ব্যবহৃত জিনিসের টুকরো ফেলে রেখে গেছেন বর্তমান প্রজন্মের মনে বেঁচে থাকার জন্য। হিউ-এন-সাঙ লিখেছেন, নাগরিকেরা টুপি ব্যবহার করতেন, মেয়েরা কাঁধ পর্যন্ত এক ধরনের পোশাক পড়তেন। দুধ, ঘি, দই—সাধারণ মানুষেরও নিত্য-আহার্য সামগ্রী ছিল। সন্দেহ নেই পুণ্ড্রবর্ধন অন্তত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতেও শ্রেষ্ঠ জনপদ ছিল।

প্রত্ন সম্পদে আকীর্ণ হয়ে কালের প্রহর গুণছে মহাস্থানগড়। ওই সেই প্রাচীন দুর্গ, ওই সেই মহাস্থানবিজয়ী পীর শাহ সুলতানের দরগা। তার কাছে 'মানকালীর কুণ্ড' আর 'খোদার পাথর' নামে দু'টি স্মৃতিময় স্তূপ। কে জানে কি ছিল এখানে! ওই তাম্র দরজা দিয়েই যেতে হয় পরশুরামের প্রাসাদে। এখানেও খননকার্য হয়েছে। পাওয়া গেছে অনেক গৃহভিত্তি প্রাচীর। সারা মহাস্থানগড় জুড়ে রয়েছে ইতিহাসের একটি বিলুপ্ত অধ্যায়ের প্রত্ন নিদর্শন।

এখান থেকে ৪ মাইল দূরে পশ্চিমে ওই বিহার গ্রামই কি বিখ্যাত ভাসুবিহার—হিউ-এন-সাঙ যার বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর বিবরণের এই কি সেই সংঘারামের ধ্বংসাবশেষ যেখানে তার ভিক্ষু ও বহুসংখ্যক শ্রমণ শিক্ষালাভ করতেন? এইখানেই কি বাস করতেন মহারাজ বল্লালসেনের গুরু অনিরুধ ভট্ট? সংঘারামের কাছে সম্রাট অশোক নির্মিত যে স্তূপটির উল্লেখ করেছেন হিউ-এন-সাঙ, সেখানেই কি বুধদেব এসে তিন মাস ধর্মচর্চা করেছিলেন? ওই কি সেই মন্দির, যেখানে দূরদূরান্ত থেকে ভক্তরা আসতেন প্রার্থনা করতে?

ওই যে মহাস্থানের কাছে 'গোকুল' গ্রাম। গোকুলের মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেছে বহু ঘর-বিশিষ্ট বাসগৃহ—সেই কি ছিল সপ্তম শতাব্দীতে নির্মিত স্তূপ? ওই নেতা ধোপানীর ঘাট, ওই মাইল পাঁচ দুরের চাঁদনীরা বা চাঁদমুরা গ্রাম কি প্রাচীন চম্পানগর যেখানে চাঁদ সওদাগর বাস করতেন? ওই কালীদহ সাগর কি সেই স্মৃতিকেই বহমান রেখেছে? আমি এর সঠিক উত্তর জানি না। তবে চাঁদ সওদাগরের বাসভূমি হিসেবে গৌড়ে, বাঁকুড়া-বর্ধমান সীমান্তে চম্পাইনগরে অনেক স্মৃতিচিহ্ন দেখেছি! কে জানে এগুলো নিছক লোককথা কিনা! আর মহাস্থান থেকে ২০ মাইল উত্তরে শালদহ গ্রামই কি ক্ষোণীনায়ক ভীমের বাসভূমি? যে নায়কের বিরুদ্ধে রামপাল যুদ্ধ করেছিলেন—সহায়তা করেছিলেন আমার গ্রাম কুশুম্বির অধিপতি দ্বোপরবর্ধন? করতোয়া তীরে শিবগঞ্জের অন্তর্গত কীচক বাদর কি মহাভারতের কথা মনে করিয়ে দেয়? ওই গোকুল, বৃন্দাবন, মথুরা নামের গ্রাম কৃষ্ণ প্রতিদ্বন্দ্বী পুণ্ড্ররাজ বাসুদেবকে স্মরণে আনে? পুণ্ড্রবর্ধন নামের প্রাচীনত্ব কি আরো প্রতিষ্ঠিত হয় না?

মন ফিরে আসে বাস্তবে। না, আমি আর খুব অনায়াসে যেতে পারি না পুণ্ড্রবর্ধনে—একদা আমার দেশে বগুড়ায়। এখন তা পররাষ্ট্রের অন্তর্গত।

স্বার্থ লোভীদের চক্রান্তে দেশের কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ের দাবিকে অগ্রাহ্য করে এক সময় দ্বি-খণ্ডিত হয়েছে এই দেশের হৃদয়! তবু মানুষের হৃদয়ের ভাষা আজো এক রয়ে গেছে! আর তাই হৃদয়ের সেই ভাষার অমোঘ আহ্বানে আমি পা বাড়াই আমার পিতৃভূমির দিকে। সঙ্গী হয় নীহার। নীহার ঘোষ, যে শুধু আমাদের শিল্পচর্চার কেন্দ্রের সভাপতিই নয়, একজন দক্ষ শিল্পী এবং ইতিমধ্যেই প্রাচীন মধ্যযুগের বাংলার টেরাকোটা সম্পর্কিত দু'টি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করে সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এবং উত্তর-মধ্যযুগ পর্বের

নিদর্শন দেখা ও তথ্য সংগ্রহ তাঁর উদ্দিষ্ট। আরো একটি বাসনা তাড়িত করেছে তাকে। সেও তার পিতৃভূমি যশোরে যাবে একবার। আমরা বেছে নিয়েছি ইতিহাসেরই পথ। গৌড় থেকে এই পথ গিয়ে মিশেছে পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তির মহাস্থানগড়ে।

দুই রাষ্ট্রের রাজনৈতিক স্বার্থে রচিত কৃত্রিম বিভাজন রেখা পার হতেই মনে হল বাতাস যেন বাতাসের মতো সহজ হয়ে এল। বুক ভরে তার শ্বাস নিয়ে মনে হল আমি যেন স্বভূমিতে ফিরে এসেছি আবার। হয়তো নিছকই এক কল্পনার আবেগ মেশানো অনুভূতি তবু এই উপলব্ধিকে অস্বীকার করতে পারি কই!

সরকারি কাগজপত্রের আনুষ্ঠানিক পর্ব শেষ হলে প্রথমে চাঁপাই নবাবগঞ্জ, তারপর বাসে রাজসাহী! মনে পড়ল এই জেলাতেও আছে এক কৌশাম্বী, সেখান থেকেও পাওয়া গেছে কিছু প্রত্নবস্তু। কে জানে, হয়তো দ্বোপরবর্ধন ছিলেন এই কৌশাম্বীর অধিপতি, বগুড়ার আদমদিঘির কাছে আমাদের গ্রাম কুশুম্বির নয়। তা হোক বা না হোক, এখন কুশুম্বি তো আমার কাছে অতীতেরই স্মৃতি আকীর্ণ একটি ছেড়ে আসা গ্রাম, আমার কাছে তার ঐতিহাসিক মূল্য তো কম নয়।

রাজসাহী এসে প্রথমেই এসে দাঁড়ালাম স্মরণীয় এক সংগ্রহশালায় যার নাম আবাল্য শুনেছি, বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি। যার নাম এখন পরিবর্তিত হয়েছে। আমাদের পরিচয় শেষে সংগ্রহশালার অধীক্ষক অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে সব ঘুরে দেখালেন সংগৃহীত মূর্তি এবং অন্যান্য প্রত্নবস্তু। বিস্ময়ে রোমাঞ্চে অভিভূত আমি! মনে হল পাল এবং সেন যুগে কত কত হাজার মূর্তিই না নির্মাণ করেছিলেন ভাস্করেরা! আর কি অসাধারণ দক্ষই না ছিলেন তাঁরা। শিল্প-সুষমা, কারুকার্যের নিখুঁত অলংকরণে একটি একটি মূর্তির পাথুরে শরীরে যেন শিল্প অক্ষয় করে রেখেছেন তাঁরা। দুই বাংলা মিলে যতগুলো সরকারি ও বেসরকারি প্রত্নসংগ্রহশালা আছে, সেগুলোতে সংগৃহীত সংখ্যা সহস্রাধিক তো হবেই। এছাড়াও ধরিত্রীগর্ভে আরো কত যে এখনো পৃথিবীর আলো দেখার প্রতীক্ষায় তার সংখ্যা নির্ণয়ের উপায় নেই। তাছাড়াও, বিদেশি বণিকেরা কত মূর্তি ক্রয় করেছেন বা পাচার করেছেন স্বদেশে তারও হিসেব নেই। ভাস্কর্য-শিল্পে বাংলার এই অসামান্য অবদানের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা আজ অবধি তেমনভাবে চোখে পড়ল কই! ভেবে ভালো লাগল, এই বরেন্দ্র সংগ্রহশালায় বাবা অমলচন্দ্র এবং মামা কমলেন্দু চক্রবর্তীও তাঁদের সংগৃহীত মূর্তি দান করেছিলেন। মনে হল এ তো শুধু ওপার বাংলার শিল্প ঐশ্বর্যের ভাণ্ডারই নয়, এপার বাংলার আমার সঙ্গেও তো আত্মীয়তার মূল্যবান ঐশ্বর্যও সংরক্ষিত আছে এখানে।

গৌড় থেকে রওনা হয়েছিলাম সকালে। মহদীপুরের সীমান্ত পেরিয়ে দুপুরের মধ্যেই পৌঁছে গেছি রাজসাহীতে। এবার বগুড়া। পুণ্ড্রবর্ধনের মহাস্থানগড় আর আমার গ্রাম কুশুম্বিতে! বগুড়ায় রাত্রিবাস, সকালে আদমদিঘি হয়ে কুশুম্বি। ব্যক্তিগত স্মৃতির পথ ধরে যেন পূর্বজন্মে। সেখান থেকে দুপুরে বেরিয়ে যখন প্রাক্ অপরাহ্নে বগুড়া বাসস্ট্যান্ডে তখন মহাস্থানগড়ে যাবার বাস আর নেই। অগত্যা রিক্সা, কেননা রিকসাচালক জানালেন খুব দূরে নয় মহাস্থান। কাছাকাছি বলতে যে পূর্বধারণা ছিল প্রায় ঘণ্টাখানেক চলার পর মনে হল, সেটা সম্পূর্ণ ভুল। জানা গেল, তা বগুড়া থেকে ১০ কিমি দূরে। পথ যেন আর শেষ

হবার নয়। এদিকে অপরাহ্ন গড়িয়ে যাচ্ছে। যতদূর দেখা যায় দিনান্তের আলোয় অগত্যা তা-ই খুঁটিয়ে দেখছি। রাস্তার ডানপাশে করতোয়া। সেই পুরাণোক্ত পুণ্য জলধারা! কিন্তু একি চেহারা তার! শীর্ণ বিশুষ্কপ্রায় এক খাল যেন, অতীতের সব গৌরব হারিয়ে দীন-ক্ষীণ এক অশক্ত স্রোত, শুধুমাত্র যেন তার অস্তিত্বকে কোনোক্রমে জিইয়ে রেখেছে! দেখেছি পুনর্ভবা, দেখেছি মহানন্দা। সবই যেন যৌবন হারিয়ে বিলুপ্ত রাজধানীগুলোর মতোই বৈভবশূন্য হয়ে বয়ে চলেছে, অতীতের স্মৃতি ভারাক্রান্ত হৃদয়ে। অদূরদর্শী পরিকল্পনাকারীদের হঠকারিতায় কি হতে চলেছে নদীমাতৃক এই দেশ! কে জানে!

হঠাৎই রিক্সাচালক বললেন—ওই দেখুন।

হ্যাঁ, দেখা উচিতই বটে! মহাস্থানগড়ের সংগ্রহশালা। কিন্তু বাইরে থেকেই দেখতে হল, দেখাবার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, বন্ধ হয়ে গেছে প্রবেশপথ। এবার আর কিছুটা গিয়েই রিক্সা থামল। মহাস্থানগড়!

রাস্তা থেকে একটু দূরে একটি অনুচ্চ টিলা। গড়। তার ওপরে, নীচের মাঠে প্রাক্‌সন্ধ্যায় চঞ্চল বালকদের খেলাধুলোর কোলাহল! কিছু দর্শনার্থীর পদচারণা। গড়ের ভেতরে রয়েছে দর্শনীয় কিছু প্রত্নচিহ্ন। গড়ের বাতাসে ভাসে কিংবদন্তীর গল্প। সে গল্প জানায়, এখানে রাজত্ব করতেন রাজা নল। আর তাঁর অনুজ নীল। এ সময় দাক্ষিণাত্য থেকে আসেন এক অভিশপ্ত ব্রাহ্মণ। তাঁর নাম ছিল রাম। কিন্তু পরশু বা কুঠার দিয়ে মাতৃহত্যা করেছিলেন বলে তাঁর নাম হয়ে যায় পরশুরাম। নল ও নীলের অভিভাবক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন তিনি এবং যথারীতি তাঁদের সঙ্গে প্রতারণা করে পুণ্ড্রবর্ধনের রাজা হন। কিন্তু আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন দরবেশ হজরত শাহ সুলতান মাহমুদ বলখীর সঙ্গে বিরোধ বাধে। পরশুরাম যুদ্ধযাত্রা করেন কিন্তু পরাজিত এবং নিহত হন। জানি না, ইতিহাস এ ঘটনার সত্যতায় বিশ্বাস করে কিনা। তবে মহাস্থান বাসস্ট্যান্ডের পশ্চিমে এই বলখীর মাজার শরীফ আজো আছে।

সন্ধ্যা নেমে এল। মহাস্থানগড়ের হারিয়ে যাওয়া বিত্ত আর গৌরবের বেদনাময় স্মৃতিচিহ্নগুলোকে ঢেকে দিচ্ছে এক অন্ধকার আবরণ। খেলা শেষ করে ঘরে ফিরে গেছে বালকেরা। মহাকালের নিয়মে শেষ হয়েছে মহাস্থানগড়েরও লীলা!

তবু বাংলার রাজধানী পরিক্রমায় আমি ফিরে যাই আমার শৈশবে, আমার স্মৃতির এক প্রবহমান ধারায়—তীরে যার মায়ের মমতা দিয়ে আজো ঘিরে রেখেছে বাংলার ইতিহাসের শৈশবের এক অধ্যায়কে—সে প্রবহমান ধারায় একটি নদী আজো বয়ে যায়। ওই নদীর নাম করতোয়া।

কর্ণসুবর্ণ/কানসোনা/রাঙামাটি

আহা মরি 'স্বদেশ' কি সুধা-মাখা নাম
মনে হয় তার কাছে তুচ্ছ স্বর্গধাম।
—মনোমোহন বস

আমি এখন বিশাল ভাগীরথার বুকে নৌকোয়।

আমার মনে পড়েছে প্রায় তেরশো বছর আগে এমনই একদিন এই ভাগীরথী বেয়েই দু'চোখে অসীম কৌতূহল, বিস্ময় আর শ্রদ্ধা নিয়ে এগিয়ে চলেছিলেন চৈনিক পরিব্রাজক হিউ-এন-সাঙ।

বহুদূর থেকে আসছিলেন তিনি। নালন্দা থেকে মুঙ্গের, সেখান থেকে ভাগলপুর, তারপর প্রায় নব্বই মাইল নদীপথে রাজমহলের কজঙ্গল নগরে। কজঙ্গল থেকে ওই নদী বেয়ে গিয়েছেন করতোয়া তীরের সেই সুবিশাল নগরী পুণ্ড্রবর্ধনে। সবখানেই দেখেছেন হিউ-এন-সাঙ—অতুল সম্পদে ভরা এই দেশের বৈভব আর সৌন্দর্য, ধর্মানুরাগ আর সৎ-সরল-সহজ জীবনযাপন, বিদ্যানুরাগ আর সুভদ্র আচরণ। মুগ্ধ হয়েছেন তিনি, আর তাই তাঁর পরিব্রাজক মন ক্লান্ত না হয়ে এই মহান দেশের সর্বত্র ঘুরে বেড়াবার বাসনায় অধীর হয়ে উঠেছে। পুণ্ড্রবর্ধন থেকে এবার তিনি এগিয়ে চলেছেন কর্ণসুবর্ণের দিকে। কর্ণসুবর্ণ—মহারাজাধিরাজ গৌড়েশ্বর শশাঙ্কের রাজধানী।

শুনেছেন হিউ-এন-সাঙ, তাঁর পরম মিত্র সম্রাট হর্ষবর্ধনের প্রধান শত্রু মহারাজ শশাঙ্কের মৃত্যু হয়েছে। বিশাল গৌড় রাজ্য অসংখ্য খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত হয়ে গেছে। রাজধানী কর্ণসুবর্ণের আর সেই ঐশ্বর্য নেই।

তবু তিনি নিরুৎসাহ হননি। কেননা দেখেছেন তিনি, প্রাচীন 'গঙ্গে' নগরীর পর খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলার রাজধানী ছিল যে পুণ্ড্রবর্ধন, আজ তার সেই গরিমা না থাকলেও অতীত বৈভবের বর্তমান ছায়ারূপটিও কম আকর্ষক নয়। এখনো পুণ্ড্রবর্ধন একটি জনবহুল নগরী, ভূমি খুবই উর্বরা, প্রচুর ফলের গাছ সমস্ত নগর জুড়ে যার মধ্যে কাঁঠালই প্রধান। অধিবাসীরা অত্যন্ত বিদ্যানুরাগী, নগরে এখনো বারোটি সংঘারাম এবং তিন হাজার ভিক্ষু আছেন। মন্দিরের সংখ্যাও কয়েক'শ হবে। পুণ্ড্রবর্ধন এখন আর রাজধানী নয়। তবু এখনো তার এই সৌন্দর্য আর ঐশ্বর্য দেখে বিস্মিতই হয়েছেন হিউ-এন-সাঙ, আর তাই তিনি প্রায় স্থির বিশ্বাসে এগিয়ে চলেছেন কর্ণসুবর্ণের দিকে। জানেন, শশাঙ্কের মৃত্যু হলেও রাজধানী কর্ণসুবর্ণের সৌন্দর্য নিশ্চয়ই এখনো জীবন্ত আছে।

অনুমান অভ্রান্তই ছিল তাঁর। কর্ণসুবর্ণে পা রেখেই উপলব্ধি করেছিলেন এ রাজ্যের বিশালতা। শুনতে পেলেন, এর আয়তন হবে প্রায় দুশো মাইল। আর রাজধানী কর্ণসুবর্ণের পরিধি প্রায় ২০ লি অর্থাৎ সাত মাইল। স্পষ্টই বুঝতে পারলেন, এখানকার অধিবাসীরা খুবই ধনী এবং সংখ্যাতেও তাঁরা এক লক্ষের কম নন। জমি খুবই উর্বরা, রাজধানীর সবখানেই প্রচুর ফুল ও ফলের গাছ। আবহাওয়া মনোরম। খুবই আনন্দিত হলেন হিউ-এন-সাঙ। বিশেযত এখানকার অধিবাসীদের সাধু ও প্রীতিপ্রদ আচরণে। বিদ্যানুরাগী, নিষ্ঠাবান, সৎ নাগরিকেরা পরম সমাদরেই অভ্যর্থনা করেছেন তাঁকে, যদিও মহারাজাধিরাজ শশাঙ্ক ছিলেন শৈব—বৌদ্ধ-বিদ্বেষী বলে কথিত। এমনকি পবিত্র বোধিদ্রুম সমূলে উৎপাটনের অপরাধে অপরাধী, তবু বিস্মিতই হলেন হিউ-এন-সাঙ। এখানে গোটা দশেক সংঘারাম এবং দুই হাজার ভিক্ষু আছে। এমনকি রাজধানীর অতি নিকটে রক্তমৃত্তিকা মহাবিহারের অস্তিত্বই যেন শশাঙ্কর বৌদ্ধ-বিদ্বেষের বিপক্ষে সাক্ষী হিসেবে সগর্বে মাথা তুলে আছে। না, রাজা শশাঙ্ক পরধর্ম-বিদ্বেষী নন। আর এই রক্তমৃত্তিকা সংঘারামে এসে এক মজার কাহিনিও শুনলেন হিউ-এন-সাঙ। কিছুকাল আগে এখানে নাকি দক্ষিণ ভারত থেকে এক দাম্ভিক পণ্ডিত এসেছিলেন। পেটভর্তি বিদ্যার চাপে যাতে পেট ফেটে না যায় এজন্য সে পেটের ওপর তামার থালা বেঁধে রাখত আর দুনিয়ার বোকা লোককে আলো দেখাবার জন্য মাথায় একটা প্রদীপ নিয়ে কর্ণসুবর্ণতে ঘুরে বেড়াত। শেষে ওই দক্ষিণ ভারতেরই এক শ্রমণ আসেন রাজধানীতে। রাজা দাম্ভিককে জব্দ করার জন্য ঘোষণা করেন, শ্রমণ যদি দাম্ভিককে তর্কে হারাতে পারেন তবে তিনি তাকে একটি সংঘারাম স্থাপন করে দেবেন। তর্কে জিতেছিলেন শ্রমণ, আর কথামতো সংঘারাম তৈরিও করে দিয়েছিলেন রাজা।

সেই সংঘারামই কি এই রক্তমৃত্তিকা মহাবিহার!

হয়তো তাই। আর তাই, কর্ণসুবর্ণের গরিমা নিজের চোখে দেখে বাংলার এই প্রসিদ্ধ রাজধানীর প্রকৃত রূপ পর্যবেক্ষণ করে তার বিস্তৃত পরিচয় হিউ-এন-সাঙ লিপিবদ্ধ করলেন তাঁর ভ্রমণ কাহিনিতে।

কিন্তু এ তো তেরশো বছর আগের কর্ণসুবর্ণের বিবরণী।

আজ একবিংশ বিংশ শতাব্দীর এই প্রথমার্ধে আমি এক অখ্যাত পর্যটক কি রূপ দেখব কর্ণসুবর্ণের কে জানে!

কৌতূহল তীব্র হয়ে ওঠে। নৌকো ধীর গতিতে এগিয়ে চলে ভাগীরথীর অপর পারে কর্ণসুবর্ণের দিকে।

আমি এদিক দিয়ে নাও আসতে পারতাম। কলকাতা থেকে কর্ণসুবর্ণ আসার এটা সহজ পথ নয়। হাওড়া-ফারাক্কা লাইনের যে কোনো ট্রেনে উঠে ব্যান্ডেল থেকে ৯৪ মাইল দূরে রেল স্টেশন চিরতী বা চিরুটিতে নামলে খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছনো যায় কর্ণসুবর্ণতে। এখন সেই স্টেশনের নাম কর্ণসুবর্ণ। স্টেশন থেকে মাত্র দেড় মাইল দক্ষিণ-পুর্বে। হেঁটেই যাওয়া যায়। কিন্তু আমি এসেছি উল্টোপথে। রাতের ট্রেনে গার্ডের গাড়িতে করে যাওয়ার একটি দুর্লভ সুযোগ এসে গিয়েছিল বলে বন্ধুবর গৌরীশঙ্কর দে, অর্ধেন্দুশেখর দেব সহ আমরা তিনজন লালগোলা যাবার শেষ ট্রেনে উঠেছিলাম। গার্ডসাহেবও বন্ধুজন। বললেন, ভোরবেলা বহরমপুরের আগে সারগাছি স্টেশনে নামবেন। ওখান থেকে যাবার সুবিধে হবে।

খুব ভোরে সারগাছি স্টেশনে নেমে আমরা তিনজন যখন নিকটবর্তী বেসিক ট্রেনিং কলেজের এক অধ্যাপক অপূর্ব ঘোষ-এর বাড়ির দিকে এগোচ্ছিলাম তখন সূর্য যেন আমাদের দেখে তার বিস্ময় ছড়িয়ে দিয়েছিল পৃথিবীর সর্বত্র। এই প্রথম আমরাও দিনের প্রথম সূর্যের মুখোমুখি হবার বিস্ময়কর অভিজ্ঞতায় অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। অমন বিশুধ্ধ প্রত্যুষ বহুকাল দেখিনি। ট্রেনিং কলেজের বন্ধুই সাইকেল জোগাড় করে দিলেন। সঙ্গে একজন ছাত্র পথনির্দেশকও। তখনো জানতাম না, কর্ণসুবর্ণ কত দূরে! সারগাছি লেভেল ক্রশিং পার হয়ে বেশ কিছুদূর এগোবার পর সম্মুখে ভাগীরথী। সেখানে প্রায় নিয়মিতই খেয়া পারাপার হয় দেখলাম। মুসলমান, সাঁওতাল আর মুর্শিদাবাদ জেলার গ্রামীণ মানুষের সঙ্গে সাইকেলসহ আমরাও নৌকোয়।

—ওই দূরে রাঙামাটি। ছাত্রবন্ধুটি বললেন।

—রাঙামাটি!

—হ্যাঁ, রাঙামাটি। এখন কর্ণসুবর্ণ নামে আর কেউ চেনে না। এখন মুর্শিদাবাদ জেলার অখ্যাত এক গ্রাম রাঙামাটি আর কানসোনা এখন রক্তমৃত্তিকা আর কর্ণসুবর্ণের স্মৃতি বহন করছে।

খেয়া পার হয়ে আবার সাইকেল যাত্রা। এবার পথ যেন আর শেষ হতে চায় না। কিন্তু যত এগোচ্ছি, কৌতূহল আর বিস্ময় যেন তৃপ্তিতে পূর্ণ হয়ে উঠছে। কি বিচিত্র এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য! মাটি প্রায় টকটকে লাল, উঁচু বাঁধ, নীচু জলা, এপাশে-ওপাশে অরণ্যভূমি, কোথাও আ-দিগন্ত মাঠ, টিলা, তালবন, মুসলমান ও সাঁওতাল পুরুষ-রমণীর যাওয়া-আসা—আমি স্পষ্টই বুঝতে পারলাম এমন প্রাকৃতিক দৃশ্যসম্ভারপূর্ণ বাংলার কোনো অঞ্চল এর আগে আমি কখনো দেখিনি।

যাঁরা শুধুমাত্র প্রাকৃতিক দৃশ্য সম্ভোগের বাসনায় বাংলার বাইরে নানা জায়গায় যান, তাঁদের কাছে করজোড়ে অনুরোধ, একবার একটু কষ্ট স্বীকার করে মুর্শিদাবাদের অবহেলিত গ্রাম রাঙামাটি, বাংলার প্রাচীন রাজধানী সুবিশাল কর্ণসুবর্ণের ধ্বংসস্তূপ দেখে আসুন। আমি বিশ্বাস করি, তাঁরা কেউই পরিশ্রম অসার্থক হয়েছে বলে মনে করবেন না। সুনির্মিত রাস্তা বলতে কিছু নেই, বাঁধের ওপর দিয়ে অপ্রশস্ত এবড়ো-খেবড়ো পথ, সাইকেল নিয়ে মাঝে মাঝে দুর্গম বলে মনে হয়। একটা বাঁক ঘুরলেই বাঁ হাতে তমাল গাছে সাজানো অরণ্য দেখে আমি আর চোখ ফেরাতে পারি না। বাঁধ থেকে বেশ কিছুটা নীচু জমিতে সেই সারিবদ্ধ গাছগুলো এক অপূর্ব শোভা রচনা করেছে। ঈশ্বরের চেয়ে বড়ো শিল্পী আর কে আছে!

আর কিছুটা যেতেই আমাদের দৃষ্টি আড়াল করে দাঁড়াল উঁচু উঁচু কয়েকটি টিলা।

—ওই হল রাঙামাটি গ্রাম। আর ডান হাতে ওই হল পুরনো ভাগীরথীর খাত।

সাইকেল থেকে নেমে পড়লাম। এটুকু পথ হেঁটেই যাব। এর প্রতিটি ধূলিকণায় ইতিহাস। আমি তা সর্বাঙ্গে জড়িয়ে নিতে চাই।

যতই এগোই সারা মন বিচিত্র দৃশ্য-সম্ভারের বিপুল বিস্তারে যেন কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠতে থাকে।

সম্মুখের উঁচু টিলা ক্রমে নিকটে আসে। স্পষ্ট দেখতে পাই, পথ উঠে গেছে টিলার ওপর পর্যন্ত এবং সেখানে বহু মানুষ দিব্যি ঘর বানিয়ে নিয়েছেন, বেশ ঘনবসতি। মাটি থেকে অতটা উঁচুতে, কেমন যেন অপার্থিব পরিবেশ বলে মনে হয়।

সাইকেলটা পথের ধারে রেখে আমরা টিলার ওপর উঠতে লাগলাম।

অজস্র মাটির তৈরি তৈজসপত্রের ভগ্নাংশ ছড়ানো রয়েছে চতুর্দিকে। মাটির ভেতর থেকে, টিলার গা থেকে অসংখ্য ভাঙা মৃৎপাত্রের টুকরো অতীত ইতিহাসকে প্রকাশের আগ্রহে যেন বেরিয়ে আসতে চাইছে। দু'হাত ভরে সংগ্রহ করলাম তারই কিছু। তারপর নেমে এলাম সেই উঁচু টিলা থেকে। কতদিন আগে কোনো মানুষের ব্যবহার্য সমাগ্রী ছিল এইসব টুকরো টুকরো স্মারক খণ্ডগুলো, কে জানে! তাদের হাতের স্পর্শ কি আজো লেগে আছে এদের সর্বাঙ্গে? আমি রোমাঞ্চিত হই! হাজার বছর আগের মানুষের মমতার সঙ্গে মিশে যায় আমার মমতা— হাজার বছর মাঝখানে সেতুর মতো মনে হয় সেই ভাঙ্গা মৃৎপাত্রের টুকরোগুলোকে। সাইকেলটা আর একটু ঠেলে এগিয়ে নিয়ে যেতেই এবার পৌঁছে গেলাম আরো অসংখ্য স্মৃতিচিহ্নের মাঝখানে। মাটির ওপরে আর বিশেষ কোনো চিহ্ন নেই, সবই মাটির নীচে। খননকার্যের ফলশ্রুতি হিসেবে মাটির আবরণ সরে গেছে, যেন বিবর্ণ অসহায় অস্তিত্ব নিয়ে কৌতূহলী দর্শকের সামনে কুণ্ঠিতভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে কতকগুলো গৃহের ভিত্তি, ছোটো ছোটো ইটে গাঁথা সুদৃঢ় ভিত—যার ওপর দাঁড়িয়ে একদা সগর্বে মাথা তুলেছিল রক্তমৃত্তিকা মহাবিহার!

হ্যাঁ, এই সেই রক্তমৃত্তিকা মহাবিহারের শেষ চিহ্ন—এখন সন্ন্যাসীডাঙা নামে যা পরিচিত।

এই রাঙামাটিই যে কর্ণসুবর্ণ এ বিষয়ে ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায় মহাশয়ই প্রথম বিশেষ জোর দিয়ে বলেন। যদিও বহুকাল আগে থেকেই এ জায়গা সম্বন্ধে নানা জনশ্রুতি ছড়িয়ে ছিল মুর্শিদাবাদের মানুষের মনে।

আর এই ভিতগুলোই যে রক্তমৃত্তিকা মহাবিহারের ভিত্তিভূমি তা প্রমাণিত হয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগীয় প্রধান শ্রীসুধীরঞ্জন দাসের তত্ত্বাবধানে খননকার্যের ফলে।

এখান থেকে পাওয়া গেছে সুনিশ্চিত হবার উপযোগী শীলমোহর। পার্শ্ববর্তী রাজবাড়িডাঙ্গা খননের সময় ৫ ফুট মাটির নীচ থেকে পাওয়া সেই গোলাকার শীল-এর মধ্যে বৌধচক্রের দু'পাশে দুটি হরিণের ছবি এবং দু-লাইন লেখা আছে—'শ্রীরক্তমৃত্তিকা মহাভৈহ' এবং 'ঋক-আর্য ভিক্ষু-সংঘস্য' যা প্রমাণ করে সেই মহাবিহারের অবস্থিতির সঠিক নির্দেশ। এই সংঘারামের ভেতর শস্যভাণ্ডারেরও সন্ধান পাওয়া গেছে এবং যার ভেতর মিহি, মাঝারি ও মোটা চাল ও গম যে সঞ্চিত থাকত তারও প্রমাণ মিলেছে।

এমনকি সপ্তম শতকে যে নরবলি হত তার স্মারক হিসেবে প্রাচীর ভিত্তির তলে নর করোটিও পাওয়া গেছে।

কিন্তু এসব তো রক্তমৃত্তিকা মহাবিহারের চতুস্পার্শ্বের পরিচয়।

কোথায় মহারাজধিরাজ শশাঙ্কের রাজপ্রাসাদের চিহ্ন!

—সেকি ওই রাজবাড়িডাঙাই যা দীর্ঘকাল ধরে স্থানীয় মানুষের কল্পনাকে উজ্জীবিত করেছে!

জিজ্ঞেস করেছি স্থানীয় মানুষকে। কেউই কোনো সঠিক নির্দেশ দিয়ে আমাকে নিশ্চিত করতে পারেননি। তবে এখনো এই রাঙামাটি গ্রামকে ঘিরে আশেপাশের গ্রামের মানুষের সম্ভ্রম ও শ্রধা যে অকপট—তার প্রমাণ পেয়েছি। রাজবাড়িডাঙার পশ্চিম অংশকে স্থানীয় লোকে সদরমহল বা কাঁকরডাঙা বলেন, খননকাজ যেখানে হয়েছে তা হল অন্দরমহল। এরপর লুপ্তপ্রায় পরিখার রেখা। এরপর আমলাবাড়িডাঙা। রাজবাড়িডাঙার দক্ষিণ দিকের রাস্তা কর্ণসুবর্ণ স্টেশনে নিয়ে যায়। গত বছর বন্যার পর আর একবার গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—রাঙামাটি জলে ডুবে গিয়েছিল কিনা। উত্তরে একজন সশ্রদ্ধ কণ্ঠে বললেন— সে কি! ও জায়গা কি জলে ডোবে! ও যে ব্রহ্মডাঙা!

এখানে বিভিন্ন স্থানের নাম ওই 'ডাঙা' শব্দ দিয়েই চিহ্নিত। যেমন রক্তমৃত্তিকা বিহার যেখানে ছিল সে জায়গা সন্ন্যাসীডাঙা এবং রাজপ্রাসাদের স্থানটিই সম্ভবত রাজবাড়িডাঙা। ওই রাজবাড়িডাঙা খননের ফলে শতাধিক শীল পাওয়া গেছে, যার গায়ে বৌদ্ধধর্মের নীতিকথা, বিভিন্ন ব্যক্তির নাম এবং ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ শতকের দুটি চুন-বালির তৈরি মূর্তির (যা গুপ্তযুগের তৈরি বলে অনুমিত) সন্ধান মিলেছে। ব্রোঞ্জের তৈরি বুধমূর্তিও রাজবাড়িডাঙা থেকেই পাওয়া গেছে এবং হিউ-এন-সাঙ রক্তমৃত্তিকার পাশে যে বিখ্যাত অশোকস্তূপের বর্ণনা দিয়েছেন, যেখানে স্বয়ং বুধদেব সপ্তাহকাল অবস্থান করে ধর্মপ্রচার করেছিলেন—সেটিই সম্ভবত এখন রাক্ষসীডাঙা নামে পরিচিত। শৈবরাজার অনুগত প্রজাদের চোখে বিধর্মী মানুষেরা হয়তো 'রাক্ষস' হিসেবেই চিহ্নিত ছিলেন। আর রাজার শিবমন্দির ছিল সম্ভবত ওই ঠাকুরবাড়িডাঙায়।

আজকের রাঙামাটির মানুষ আর সঠিকভাবে কিছুই বলতে পারেন না। কয়েকজন বালক প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ফিরছিল। তাদের একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম—

—জায়গাটির নাম কি?

—রাজবাড়িডাঙা।

—কি ছিল এখানে?

—রাজার বাড়ি।

—কোন্ রাজার?

—জানি না।

—তোমাদের মাস্টারমশায় বলেননি কিছু?

নীরব হয়ে গেল সেই বালক।

এই নীরবতা এখানকার প্রায় সকলেরই। অথচ এরা জানে না কতবড়ো সৌভাগ্য এদের, প্রায় দেড় হাজার বছর আগেকার এক গৌরবময় ঐতিহ্যমণ্ডিত ভূখণ্ডে এরা বাস করছেন। কে জানাবেন এ কথা তাঁদের? স্থানীয় শিক্ষকগণ কোন্ বই পড়াবেন শিশুদের—যাতে বাংলার এই বিলুপ্ত রাজধানীর বর্ণনা আছে? আমাদের পাঠক্রমে এর স্থান কোথায়? বাংলাদেশের ইতিহাস বাংলাদেশে পড়ানো হয় না—এরচেয়ে অশিক্ষিত শিক্ষাচর্চা আর কোন্ দেশে হয়? কর্ণসুবর্ণে দাঁড়িয়ে আছি, খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের বাংলার রাজধানী। কেন এর নাম কর্ণসুবর্ণ? ইতিহাস নীরব। শুধু লোকগাথা, লোকশ্রুতি আর কিংবদন্তী এখনো জানিয়ে দেয় এইখানেই ছিল দাতা কর্ণের রাজধানী। একবার বৃষ সেনের ছেলের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে স্বর্ণলঙ্কার তৎকালীন অধিপতি রাক্ষসরাজ বিভীষণ এসেছিলেন নিমন্ত্রিত হয়ে। শিশু বৃষ সেনেব কল্যাণ কামনায় এখানে তিনি স্বর্ণবৃষ্টি করান এবং সেই কারণেই এ জায়গার নাম হয় কর্ণসুবর্ণ। আর তখন থেকেই এখানকার মাটিও স্বর্ণাভ হয়ে যায়। আজকের রাঙামাটি নামও সেই থেকেই। আর কিছু দূরের ওই গোকর্ণ নামক স্থানই ছিল দাতাকর্ণের গোশালা। আবার, ক্যাপ্টেন লেয়ার্ড এবং বিভারিজ জানান, কর্ণসুবর্ণ এক সময় কুসুমপুরী নামেও প্রসিধ ছিল। লঙ্কার রাজার আক্রমণে রাঙামাটি ধ্বংস হয়ে যায়।

কিংবদন্তী বলে—ওই রাক্ষসীডাঙায় বাস করত এক রাক্ষসী। তার সঙ্গে তর্ক করার জন্য রাজাকে প্রতিদিন একজন করে লোক পাঠাতে হত। লোকটি তর্কে হেরে গেলে রাক্ষসী তাকে খেয়ে ফেলত। অবশেষে পীর তুর্কান নামে এক পণ্ডিত আসেন, তিনি তর্কে পরাস্ত করেন রাক্ষসীকে এবং মেরেও ফেলেন তাকে। রাজা এবং প্রজা উভয়েই অকুণ্ঠ শ্রধা জানান

পীর সাহেবকে। তাঁর ইচ্ছানুসারে তাঁর মৃত্যুর পর এখানে সমাহিত করা হয় তাঁকে। এবং ইটের তৈরি সমাধিভূমি না করে চালাঘর নির্মাণ করা হয়। আজো রাক্ষসীডাঙায় এসে পীর সাহেবকে শ্রদ্ধা জানায় সাধারণ মানুষ। কিন্তু এ তো কিংবদন্তী আর জনশ্রুতির কল্পকাহিনি। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গৌড়মল্লার' জানায়, 'কর্ণসুবর্ণ নতুন নগর, মথুরা বারানসীর ন্যায় প্রাচীন নয়। তাহার পথগুলো ঋজু, গলি ঘুঁজি বেশি নাই। পথের দুইধারে নানা বর্ণের চুর্নলিপ্ত দ্বিতল ত্রিতল গৃহ, গৃহচূড়ায় ধাতু কলস। পথে পথে বহু দেবদেবীর মন্দির, বৌধ চৈত্য মঠ। নগরের সর্বপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রাজপথ গঙ্গার ধার দিয়া গিয়াছে।... পথের অপর পাশে ধনী নাগরিক ও রাজপুরুষদিগের তুঙ্গশীর্ষ প্রাসাদ। এই পথ দক্ষিণ দিকে যেখানে শেষ হইয়াছে সেই নদী রচিত কোণের ওপর দুর্গাকৃতি রাজ অট্টালিকা। ভাগীরথীর তীরস্থ অগণ্য ঘাটের মধ্যে একটি ঘাট সর্বাপেক্ষা বৃহৎ।... ইহাই নগরের বন্দর।'... সন্দেহ নেই এও কর্ণসুবর্ণের কল্পছবি। বর্তমানে আবিষ্কৃত নানা তথ্যের ভিত্তিতে বলা যেতে পারে সত্যের সঙ্গে অনেক সাদৃশ্যও আছে। ইতিহাসে কর্ণসুবর্ণের প্রতিষ্ঠা কবে থেকে?

পাঁচ নং দামোদর লিপি বলে পুণ্ড্রবর্ধন ৫৪৪ খ্রিস্ট শতক পর্যন্ত জনৈক গুপ্ত রাজ্যের অধীনে ছিল। ষষ্ঠ শতকেরই.শেষ ভাগে পুণ্ড্রবর্ধন ও গৌড় একযোগে স্বাতন্ত্র্য লাভের দিকে অগ্রসর হয়। অবশেষে সপ্তম শতকের সূচনায় জনৈক শ্রীমহাসামন্ত শশাঙ্ক গৌড়ের স্বাধীন নরপতিরূপে আবির্ভূত হন এবং গৌড়রাষ্ট্র ক্রমে সমগ্র উত্তরপূর্ব ভারতের ইতিহাসে বিশিষ্ট অধ্যায় রচনা করে। শশাঙ্কের এই গৌড়রাষ্ট্রেরই রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ।

মগধ, মালবাধিপতি গুপ্তরাজাদের মহাসামন্ত রূপেই শশাঙ্কর প্রথম আবির্ভাব। এবং এই গুপ্তরাজাদের সঙ্গে গৌড়ের অধিকার নিয়ে মৌখরী সম্রাটদের কয়েক পুরুষব্যাপী এক বিবাদ ছিল। এই বিবাদ চূড়ান্ত রূপ নেয় দেবগুপ্ত ও গ্রহবর্মার সময়ে। কবি বানভট্ট তাঁর 'হর্ষচরিত'-এ এই সংঘর্ষের একটি সুস্পষ্ট ছবি এঁকেছেন। দেবগুপ্তের পক্ষে ছিলেন মহাসামন্ত শশাঙ্ক। উভয়ের সম্মিলিত আক্রমণে গ্রহবর্মা পরাজিত ও নিহত হন। সিংহাসনে আসেন হর্ষবর্ধনের ভাই রাজ্যবর্ধন। তিনি পরাক্রান্ত দেবগুপ্তকে পরাজিত ও নিহত করেন, কিন্তু শশাঙ্ক তাঁকে প্রতিরোধ করেন। কথিত আছে, শশাঙ্ক নাকি মৈত্রীবন্ধনের উদ্দেশ্যে রাজ্যবর্ধনকে নিজের শিবিরে আমন্ত্রণ করে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাঁকে হত্যা করেন।

কিন্তু বাণভট্ট বা হিউ-এন-সাঙ কথিত এই কাহিনি হর্ষবর্ধনের লিপিতে সমর্থিত নয় এবং মঞ্জুশ্রী মূলকল্প গ্রন্থেও বলা হয়েছে রাজ্যবর্ধন নগ্নজাতির কোনো আততায়ী দ্বারা নিহত হয়েছিলেন।

এরপর শশাঙ্কের সঙ্গে শুরু হয় হর্ষবর্ধনের সংগ্রাম। এই সংগ্রাম কাহিনিও বাণভট্টের লেখনীতে বিবৃত আছে। কামরূপরাজ ভাস্করবর্মার সহায়তা গ্রহণ করে হর্ষবর্ধন যখন গৌড়রাজ শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন সংবাদবাহক ভণ্ডীর মুখ থেকে শুনলেন রাজ্যবর্ধন নিহত হয়েছেন, রাজ্যশ্রী নিরুদ্দেশ, তখন নিজে আর অগ্রসর না হয়ে বিন্ধ্যপর্বতের দিকে দ্রুত চলে গেলেন এবং আত্মহত্যা করার পূর্বমুহূর্তে রাজ্যশ্রীকে উধ্বার করলেন। সসৈন্যে ভণ্ডী গেলেন শশাঙ্কের সঙ্গে যুধ করতে। শেষ অবধি এই যুধ আর হয়েছিল কিনা বানভট্ট তা লেখেননি। কিন্তু মঞ্জুশ্রী মূলকল্প গ্রন্থের লেখক বলেন, হর্ষবর্ধন প্রাচ্যদেশের রাজা সোম অর্থাৎ চন্দ্র অর্থাৎ শশাঙ্ককে পরাস্ত করেন। হতে পারে তা সত্য, তবু ইতিহাস বলে, শ্রীমহাসামন্ত শশাঙ্ক নিজের জীবদ্দশায় সমগ্র গৌড়দেশ, মগধ, বুধগয়া,

উৎকল ও কঙ্গোদেশের অধিপতি ছিলেন। কম্বোজের শৈলোদ্ভববংশীয় অধিপতি মহারাজ দ্বিতীয় শ্রীমাধব রাজের ৬১৯ খ্রিস্ট শতকের এক লিপি তার প্রমাণ। সামন্ত মহারাজ সোমদত্ত এবং মহাপ্রতীহার শুভকীর্তির মেদিনীপুর লিপিও (যে মেদিনীপুর প্রাচীনকালে মিধুনপুর নামে পরিচিত ছিল) বলে, দণ্ডভুক্তিদেশ শশাঙ্কের রাজ্যের অন্তর্গত ছিল—যে দণ্ডভক্তির অধীনে ছিল উৎকল দেশ। এই দণ্ডভুক্তিই কি আধুনিক মেদিনীপুরের দাঁতন নামক স্থান? এই দাঁতনেরই কিছুদূরে শরশঙ্ক নামে একটি বড়ো দিঘি আছে। কিংবদন্তী বলে—মহারাজ শশাঙ্ক পুরী যাবার সময় বাংলা ও উড়িষ্যার সীমান্তে এই দিঘি খনন করেছিলেন। ৫,০০০ ফুট দৈর্ঘ্য ও ২,৫০০ ফুট প্রস্থের এই সুবৃহৎ সমতুল্য দিঘি বাংলায় খুব কমই আছে।

২৪ পরগনার গাইঘাটার কাছে 'জলেশ্বর' নামে একটি স্থানে কয়েকটি সুউচ্চ ঢিবি আছে। তার একটিতে প্রাচীন একটি শিবমন্দির আছে, মন্দিরের সম্মুখে গাছের তলায় ভাঙা একটি মূর্তি আছে। স্থানীয় মানুষেরা বলেন, এই স্থানটি মহারাজ শশাঙ্কের সময়ের। এই দুটি স্থানের লোকশ্রুতি আজ অবধি শশাঙ্কের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ও লোকপ্রিয়তার ইঙ্গিত বহন করছে। হিউ-এন-সাঙ যখন কর্ণসুবর্ণতে আসেন তখন মহারাজ শশাঙ্কের মৃত্যু হয়েছে। অনুমান করেন ঐতিহাসিকরা, ৬৩৭-৩৮ খ্রিস্টাব্দের কিছু আগে শশাঙ্ক মারা যান। এবং বুদ্ধগয়ায় বোধিদ্রুম উৎপাটনের পাপে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হয়ে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। শশাঙ্কের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই গৌড়রাষ্ট্রের পতন শুরু হয়। মানব নামে তাঁর এক ছেলে আট মাস পাঁচ দিন রাজত্ব করেছিলেন। কিন্তু তিনি শশাঙ্কের মতো পরাক্রমশালী ছিলেন না। ফলে সমগ্র বাংলাদেশে তখন যে বিভাগগুলো ছিল অর্থাৎ কজঙ্গল, পুণ্ড্রবর্ধন, কর্ণসুবর্ণ, তাম্রলিপ্ত ও সমতট—এগুলো স্বাতন্ত্র্যলাভের বাসনায় উদগ্র হয়ে ওঠে এবং হর্ষবর্ধন ও ভাস্করবর্মার ক্ষমতার লড়াইয়ে ক্রমে গৌড়তন্ত্র সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যায়।

মানবের পর জয় বা জয়নাগ নামে এক রাজা কর্ণসুবর্ণের সিংহাসনে অল্পকালের জন্য আরোহণ করেন। এঁর মুদ্রা বীরভূম ও মুর্শিদাবাদে পাওয়া গেছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও ৬৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই শশাঙ্কের গৌড় একেবারে গৌরবহীন হয়ে পড়ল। কর্ণসুবর্ণের সোনালি দিন শেষ হয়ে যায়। হায়! তারপরের ইতিহাস যেমন দুঃখময়, মর্মান্তিক তেমনই অনিশ্চিত, ভয়ঙ্কর, অসহায়, অরাজকতায় বিশৃঙ্খল।

তারানাথের বিবরণীতে সেই মাৎস্যন্যায়ের ভয়াবহ চিত্র উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। গৌড়-বঙ্গ-সমতট—কোথাও কোনো রাজার আধিপত্য নেই, সর্বময় রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব দূর অতীতের ঘটনা, ক্ষত্রিয়, বণিক, ব্রাহ্মণ, নাগরিক সকলেই রাজা। মঞ্জুশ্রী মূলকল্প বলে, এ সময় শিশু নামে এক রাজা সিংহাসনে বসেন, কিন্তু তাঁর রাজত্বকালে নারীর প্রতাপ দুর্জয় হয়ে ওঠে ও রাজা পনেরো দিনের মধ্যেই নিহত হন। এ সময় দুর্ভিক্ষও দেখা দেয়। সারাদেশ জুড়ে অন্যায়ের প্রবল প্রবাহ। শুধু পশুবল আর জিঘাংসা, শুধু ষড়যন্ত্র আর ঘৃণ্য চক্রান্ত, শুধু হীন, বিলাসী, ব্যভিচার আর পঙ্কিল জীবনযাত্রার অশুচি পরিমণ্ডল সমগ্র বাংলাদেশকে প্রায় একশো বছর অথর্ব, পঙ্গু, হীনবল এবং অশান্ত করে রাখে। এর কিছু পরে অন্যায়ের প্রতিবিধানের জন্য 'প্রকৃতিপুঞ্জ' সম্মিলিত হয়ে সর্বময় কর্তৃত্ব দিলেন একজনের হাতে। তাঁর নাম গোপাল। তিনি পাল রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতিকে বাঁচালেন। কিন্তু সে অন্য ইতিহাস! তার সঙ্গে কর্ণসুবর্ণের কোনো যোগ নেই। সেই পাল সম্রাটের রাজধানী বাণগড় আজকের এই রাঙামাটি গ্রাম থেকে অনেক দূরে!

স্তব্ধ বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে আছি আর স্মৃতির পর্দায় ইতিহাসের চলচ্চিত্র প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। হারিয়ে গেছে সেই সুবিশাল স্বর্ণবৃষ্টিতে সিঞ্চিত মহানগরী কর্ণসুবর্ণ! নেই মহারাজাধিরাজ শশাঙ্কের রাজপ্রাসাদ, নেই হিউ-এন-সাঙ বর্ণিত 'লো-তো-বী-চী' বা লো-তো-মো-চিহ্ বা রক্তমৃত্তিকা মহাবিহার, নেই প্রায় তিরিশটি সংঘারামের একটিও, নেই পঞ্চাশটি হিন্দু মন্দিরের একটিও বিগ্রহ।

শোনা যায়, এখানকার ওই যমুনা পুষ্করিণী থেকে একটি বড়ো অষ্টভুজা মহিষমর্দিনী মূর্তি পাওয়া গিয়েছিল আর ঠাকুরবাড়িডাঙা যখন গঙ্গার প্রবাহে ভেঙে পড়ে তখন পাওয়া গেছে একটি সোনার লক্ষ্মীপ্রতিমা। আজ আর সে সবের কোনো চিহ্নই নেই; কোথায় ছিল মহানাবিক ও বণিক শ্রীবুধগুপ্তের বাড়ি— যেখান থেকে তিনি একদিন বাণিজ্যের উদ্দেশ্য তাম্রলিপ্ত বন্দর হয়ে যাত্রা করেছিলেন পূর্ব-দক্ষিণ সমুদ্রতীরের দেশগুলোর দিকে। আজ আর তার চিহ্নমাত্র খুঁজে পাবার কোনো উপায় নেই। ভাবলে কেমন রোমাঞ্চিত হই। আজকের এই নিতান্ত অবহেলায় অযত্নে নির্জনে নির্বাসিত এই গ্রাম রাঙামাটি একসময় সমগ্র বাংলাদেশের রাজধানী ছিল।

এখানেই এসেছিলেন পরিব্রাজক হিউ-এন-সাঙ। কোথায় উঠেছিলেন তিনি? ওই রক্ত মৃত্তিকা মহাবিহারে? যার কাছে দাঁড়িয়ে আমি এক অখ্যাত পরিব্রাজক তেরশো বছর আগের কর্ণসুবর্ণের বৈভব আর সৌন্দর্য দেখবার জন্য কল্পনায় অবগাহন করছি! কোথাও কেউ নেই, একজন শ্রমণ নয়, মহারাজের কোনো সুভদ্র প্রজা নয়—আর গল্পকথার সেই মানুষটিও নয়—যে লোককে আলো দেখাবার উদ্দেশ্যে মাথায় আলো রেখে কর্ণসুবর্ণের পথে পথে ঘুরে বেড়াবে! আজ আর কেউ নেই, কিছুই নেই। ওই দূরের বড়ো বাঁধানো কুয়োটিও কি এই সংঘারামের জন্য নির্দিষ্ট ছিল? তখন আমার কৌতূহলের সঙ্গে মিশ্রিত ছিল অজ্ঞতা। পরে কর্ণসুবর্ণের খননকার্যের পরিচালক শ্রীসুধীরঞ্জন দাস আমাকে বলেছিলেন যে, ওটি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে তৈরি। সম্ভবত নীলকুঠি স্থাপন করে থাকবেন তাঁরা এখানে।

বেলা শেষ হয়ে আসছে। রাঙামাটির লাল পটভূমিকায় লালসূর্য অস্তমিত হচ্ছে। আজ সকালের প্রথম সূর্যকে আমি দেখেছি। সারাদিনে সে ছিল আমার সঙ্গী এখন ব্যথাতুর ম্লান আলো এই বিলুপ্ত রাজধানী কর্ণসুবর্ণের শেষ শয্যায় কেমন বিষণ্ণতার করুণ ছায়া ফেলেছে।

এইখানেই একদিন মহারাজ শশাঙ্কের নেতৃত্বে সমগ্র বাংলা ও বাঙালি স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিল, অক্ষুণ্ন রেখেছিল তার স্বাতন্ত্র্য। তারপর এইখানেই মাৎস্যন্যায়ের রক্তাক্ত পরিবেশে সৌভাগ্যসূর্য এমনই বিষণ্ণতার ম্লান আলো ফেলে কর্ণসুবর্ণকে ব্যথাতুর করেছিল। বাংলার মানুষ অসহায় হয়ে পড়েছিল। কিন্তু নিঃশেষে হারিয়ে যায়নি, সূর্য চিরকালের জন্য অস্তমিত হয় না। এই রক্তাক্ত পটভূমিকা থেকেই নতুন উজ্জীবনের দীক্ষা নিয়ে নতুন বাংলা গড়ে তুলেছিল বাংলার মানুষ নিজেদের মনোনীত অধীশ্বর গোপাল দেবের নেতৃত্ব স্বীকার করে নিয়ে। বাংলার ইতিহাসে সেই প্রথম গণতান্ত্রিক নির্বাচন, গণদেবতার পূজা। এবার আমি সেই পুণ্যভূমিতে যাব। পাল যুগের রাজধানী বাণগড়। অনেক পরে যা সরে যায় মুর্শিদাবাদেরই মহীপাল-এ। জনশ্রুতি বলে কর্ণসুবর্ণ ভেঙে অনেক উপকরণ এখানে আনা হয়েছিল।

. তা হোক। কিন্তু যাবার আগে প্রণাম করব কর্ণসুবর্ণের লালমাটিকে, যেখানে প্রথম একজন মহাপরাক্রমশলী মানুষের নেতৃত্বে সমগ্র বাংলা ও বাঙালি ভারতবর্ষের ইতিহাসে নিজেদের ভূমিকাকে স্পষ্ট করে তুলতে পেরেছিল এবং নিজেদের যথাযোগ্য মর্যাদা ও সম্মান অধিকার করে নিতে পেরেছিল।

বিলুপ্ত রাজধানী
৫

কোটিবর্ষ/বাণগড়

আমি নরকে যাই তাহাতে আমার দুঃখ নাই,
কিন্তু আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর জন্মভূমি যেন
আমার শব সাধনার বলে নরক হইতে উত্থিত হয়।
—যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ

মাৎস্যন্যায়মপোহিতু প্রকৃতিভির্লক্ষ্ম্যাঃ করোগ্রাহিতঃ
শ্রীগোপাল ইতি ক্ষিতীশ সাসিরসাং চূড়ামণিস্তৎসুতঃ।
বস্যানুক্রিয়তে সনাতন যশোয়াশির্দিশমাশয়ে
শ্বেতিম্না যদি পৌর্মমাসী রজনী জ্যোৎস্নাভিভরশ্রিয়াঃ ॥

—না, আমার মতো যারা সাধারণ 'অ-সংস্কৃত' জন, তাঁদের কাছে এই শ্লোকমালার কোনো তাৎপর্যই নেই। যেমন ছিল না সেই কৃষকের কাছেও।

১৮৯৩ সালের এক দুপুরে অবিভক্ত গৌড়ের পূর্বদিকে ভাতিয়ার বিলের কাছে খালিমপুর গ্রামের এক উঁচু ভূখণ্ডে চাষ করতে গিয়ে তার লাঙলের ফালে উঠে এল একটি তামার ফলক। সোনা নয় বুঝতে পেরেছিলেন তিনি। গৌড়ের মাটিতে সংগুপ্ত স্বর্ণভাণ্ডার বহুবার এভাবেই উদ্‌ঘাটিত হয় তাদের সম্মুখে। তবে কি কোনো দেবতার পাদপীঠ! অজ্ঞাত রেখায় অলংকৃত সেই তাম্রফলক নিয়ে এলেন তিনি ঘরে। তারপর সিঁদুরে, চন্দনে শুরু হল পূজার্চনা। কিন্তু ফুলের মালা আর ধূপের ধোঁয়ায় দীর্ঘকাল আচ্ছন্ন রইল না এর প্রকৃত পরিচয়। কৌতূহলী প্রত্নবিদ্‌দের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি আবিষ্কার করল, সোনা নয় কিন্তু সোনার চেয়েও দামী এই তাম্রশাসনে উৎকীর্ণ আছে এক বিচিত্র কাহিনির সুস্পষ্ট ইঙ্গিত, বাংলার এক তমসাচ্ছন্ন লুপ্তপ্রায় অধ্যায়। আলোকিত হবার চূড়ান্ত মুহূর্তের জন্য যেন অপেক্ষমান।

মূঢ়তার আবরণ সরিয়ে পাঠ করা হল সেই লিপিমালা আর বাংলার ইতিহাসের এক ছিন্নসূত্র যেন সেইক্ষণেই পুনর্যোজিত হল।

এই বিচিত্র রহস্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমি বারংবার বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেছি। যাঁরা ঈশ্বর অবিশ্বাসী তাঁরা স্বীকার করবেন পৃথিবীর আদি যুগ থেকে বর্তমান মুহূর্ত পর্যন্ত মানবজাতির যে ইতিহাস লেখা হয়েছে তার অধিকাংশ উপকরণই সংগৃহীত হয়েছে এইভাবেই প্রকৃতির অসীম অনুগ্রহে। সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে মাটি খুঁড়তে গিয়ে কখনো বেরিয়ে এসেছে প্রস্তর যুগের কুঠার। ভ্রাম্যমান কোনো উদাসী পথিকের চোখে অকস্মাৎ এক বিপুল সৌন্দর্যের গুপ্ত ঐশ্বর্য মেলে ধরেছে কোনো গুহাচিত্র, শ্রমিকের কোদালের আঘাতে বেজে উঠেছে রূপময় কোনো শিলীভূত মূর্তি, কৃষকের লাঙলের ফালে উঠে এসেছে মূল্যবান তাম্রলিপি, বষ্টির করুণাধারায় নিবারণ সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে লুপ্তপ্রায় কোনো

সভ্যতার ভিত্তিস্তর। ইতিহাসের কোনো অন্ধকার অধ্যায়ে আলোকপাত যখন সম্পূর্ণ অসম্ভব বলে মনে হয়েছে, তখন নিঃশব্দে মানুষের হাতে প্রকৃতি তুলে দিয়েছে এক টুকরো প্রত্নচিহ্ন, বিস্ময়ে কৌতূহলে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার আলোয় তৎক্ষণাৎ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে অন্ধ অতীত।

প্রকৃতির চেয়ে বড়ো প্রত্নতাত্ত্বিক আর কে আছে?

মহারাজাধিরাজ শশাঙ্কের মৃত্যুর পর মাৎস্যন্যায়ের প্রবল আলোড়নে বিপর্যস্ত গৌড়তন্ত্র, নিদারুণ দুর্ভিক্ষ, দুর্বল শাসকগোষ্ঠীর ক্ষমতালোভী ষড়যন্ত্র, অসহায় গৌড় নাগরিকদের বিমূঢ় মানসিকতা এবং একশো বছর দীর্ঘ এই গভীর অসুখের পর সম্মিলিত প্রকৃতিপুঞ্জের নির্বাচিত প্রতিনিধি গোপালদেবের নেতৃত্বে সুষ্ঠ. সবল, প্রাণপ্রাচুর্যে সমুজ্জ্বল নতুন বাংলা ও বাঙালির পুনর্জীবন উত্তরণের যে চমকপ্রদ নাটকীয় ইতিবৃত্ত—সে তো সম্পূর্ণ অজ্ঞাতই থেকে যেত, যদি না সেদিন প্রকৃতি ওই কৃষকের লাঙলের ডগায় তাম্রশাসনটি তুলে দিত।

আমি প্রণাম করি ঈশ্বরকে বা প্রকৃতিকে এইভাবেই তিনি মানুষের ইতিহাসকে সম্পূর্ণতা দান করছেন।

কি ছিল এই তাম্রশাসনে? কৌতূহলী প্রত্নবিদ্ দেখলেন, পালবংশের মহান নৃপতি ধর্মপাল কর্তৃক প্রচারিত এই তাম্রশাসনে লিখিত আছে পালবংশের প্রথম নৃপতি গোপালদেবের বংশপরিচয়, তাঁর সম্রাট হবার ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার ইতিহাসের এক বিলুপ্ত অধ্যায়ের রোমাঞ্চকর তথ্য।

বুধদেবের দশবলকে নমস্কার করে এর আরম্ভ। দ্বিতীয় শ্লোকে পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা দয়িতবিষ্ণুর পরিচয়, যাঁর বিশেষণ ছিল 'সর্ববিদ্যাবদাত্ত'।

তৃতীয় শ্লোকে বপ্যটের কথা, যাঁর কীর্তিমালা সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আর তারপব সেই চতুর্থ শ্লোকরাজী 'মাৎস্যন্যায়মপোহিতু'...... যার অর্থ—মাৎস্যন্যায় দূর করার অভিপ্রায়ে প্রতিপুঞ্জ যাঁকে রাজলক্ষ্মীর করগ্রহণ করিয়েছিল, পূর্ণিমা রজনীর জ্যোৎস্নারাশির অতিমাত্র ধবলতাই যাঁর স্থায়ী যশোরাশির অনুকরণ করতে পারত, নরপাল-কূলচূড়ামণি গোপাল নামক সেই প্রসিধ রাজা বপ্যট থেকে জন্মগ্রহণ কবেছিলেন।

সেই বিখ্যাত খালিমপুর লিপি ও ধর্মপালের তাম্রশাসন বাংলার ইতিহাসের এক অমূল্য দলিল।

কিন্তু এ কি শুধু পালবংশের প্রতিষ্ঠার ইতিকথা, বংশানুক্রমের বিশেষণ ভূষিত বিবরণী! যদি তাই হত, হয়তো ঐতিহাসিকদের কাছে এতটা মর্যাদা পেত না এই তাম্রশাসন। এর প্রতিটি অক্ষরের আড়ালে সংগুপ্ত আছে বাংলা ও বাঙালির এক গৌরবময় অধ্যায়ের বিস্ময়কর সাক্ষ্য, এই শ্লোকরাজিতেই বিধৃত আছে বাংলার প্রথম গণচেতনার স্বাক্ষর, গণতান্ত্রিক নির্বাচনের সুস্পষ্ট পরিচয়, জনজাগরণের বজ্রনির্ঘোষ। আজ প্রায় দেড় হাজার বছর পর যে কথা মনে পড়লে শ্রধায় অভিভূত হয় কল্পনা, বাঙালির অমেয় আত্মশক্তির অপরাজেয় অভিব্যক্তির এই সুপ্রাচীন ঐতিহ্য দেখে সেই পুণ্যভূমির স্পর্শলাভের আশায় চঞ্চল হয়ে ওঠে মন। যেখানে দীর্ঘ চারশো বছর ধরে পাল সম্রাটগণ শৌর্য-বীর্য-শিল্প-সংস্কৃতি এবং সর্বোপরি গণশক্তির উদ্বোধন ঘটিয়ে সমগ্র ভারতবর্ষে বাংলা ও বাঙালিকে স্বভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন—তাদের সেই রাজধানীর দিকে, সেই তীর্থের দিকে পা বাড়াতে চায় আমার পর্যটক আত্মা।

কিন্তু কোথায় ছিল পাল সম্রাটদের রাজধানী?

কবি সন্ধ্যাকর নন্দী তাঁর 'রামচরিত'-এ স্পষ্টই উল্লেখ করেছেন, পাল রাজাদের জনকভূমি বারেন্দ্রীদেশ। ভোজদেবের গোয়ালিয়র লিপি সাক্ষ্য দেয়, ধর্মপাল ছিলেন 'বঙ্গপতি'। তিব্বতী লামা তারানাথ বলেন, পুণ্ড্রবর্ধনের কোনো ক্ষত্রিয়বংশে গোপালের জন্ম, কিন্তু পরে তিনি 'ভঙ্গল' বা বঙ্গল বা বঙ্গালের (গৌড়-বঙ্গ-সমতট) রাজা নির্বাচিত হন। কিন্তু এ সবই তো অস্পষ্ট সংকেত, কোনো স্থির সিদ্ধান্তের চিহ্নিত বিশেষ স্থানের নাম নয়। চিন্তিত হয়েছেন ঐতিহাসিকগণ, বিভিন্ন পাল সম্রাটদের নামের স্মৃতির সঙ্গে বিজড়িত বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক অনুসন্ধান চালিয়েছেন। প্রাচীন প্রত্ন-সম্পদের অজস্র উপকরণ যেখানে ছড়িয়ে আছে, সেখানে বৈজ্ঞানিক খননকার্য শুরু হয়েছে। উঠে এসেছে নিশ্চিত হবার উপযোগী আরও কিছু নির্ভুল দলিল, কিন্তু তবু কোনো বিশেষ একটি নামে চিহ্নিত বিশেষ একটি স্থানকে পাল রাজাদের রাজধানী বলে বিভূষিত করেননি কেউই।

শুধু সুপ্রাচীন সুবিশাল বরেন্দ্রভূমিতে যাঁরা পা রেখেছেন, তাঁরা প্রতি পদক্ষেপে লক্ষ করেছেন, এর প্রতি ধূলিকণায় ছড়ানো আছে বাংলা বাঙালির আদি ইতিহাসের রেণুকণা। ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত গড়ের ভগ্নাংশ, গভীর অরণ্যাবৃত জঙ্গলের রহস্যময় অস্তিত্ব, ভাঙা দেউলের বিবর্ণ গর্ভগৃহ, পথের ধারে কোনো গাছের তলে স্তূপীকৃত পাথরের মূর্তি, ঘন দামে ঢাকা বিশাল দিঘির করুণ ছলছল বিলাপ তাঁকে প্রতি মুহূর্তে মনে করিয়ে দিয়েছে, বরেন্দ্রভূমি কোনো আধুনিক ভূখণ্ড নয়, হাজার বছর আগে থেকে সে এমনই নিঃশব্দে ইতিহাসের বিচিত্র উত্থান-পতনের অজস্র স্মৃতিচিহ্ন নিয়ে প্রতীক্ষা করছে কোনো সহৃদয় পর্যটকের অপেক্ষায়।

—না, যেমন প্রাচীন 'গঙ্গে'তে এসেছিলেন বিদেশি পর্যটক, কর্ণসুবর্ণ এসেছিলেন হিউ-এন-সাঙ, তেমন কোনো খ্যাতনামা পরিব্রাজকের ভ্রমণবৃত্তান্ত নেই পাল রাজাদের রাজধানী সম্পর্কে। তবে ১৬৭ খ্রিস্টাব্দের দক্ষিণী লিপিতে 'বারেন্দ্রদ্যুতিকারিণ' শব্দের উল্লেখ, সন্ধ্যাকর নন্দীর কবি-প্রশস্তিতে গঙ্গা-করতোয়ার মধ্যবর্তী স্থানে এর অবস্থিতির নির্দেশ, সিলিমপুর, তপণদিঘি এবং মাধাইনগর পট্টোলীতে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্গত বরেন্দ্রীর স্পষ্ট বিবরণ আধুনিক পর্যটককে বিশ্বাসী করে তোলে এই ভূখণ্ডের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে।

অবিভক্ত বাংলার বগুড়া, দিনাজপুর, রাজসাহী ও পাবনা প্রাচীন বারেন্দ্রীর প্রতিনিধি, বর্তমান এই বাংলার উত্তর-দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদহের কিছু অংশ যার খণ্ডিত সারমাত্র। আর এই বারেন্দ্রভূমিরই এক অংশে লুকানো আছে বাংলার ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। দিনাজপুরের নিভৃত এক অবহেলিত গ্রামের মাটিতে ঐতিহাসিক আর প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টির প্রতীক্ষায় দেড় হাজার বছর আগের পালরাজাদের কীর্তিগাথা আজও জনশ্রুতি আর কিংবদন্তী, অজস্র শিলালিপি আর পাথরের মূর্তি, পোড়ামাটির অলংকৃত ভাস্কর্য আর মুদ্রায় যেন প্রহর গুনছে।

সেই গ্রামের নাম বাণগড়, দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুর থানার অন্তর্গত এক ছোট্ট ভূখণ্ড, কলকাতা থেকে যার দূরত্ব প্রায় সাড়ে তিনশ মাইল। পুণ্ড্রবর্ধন আমার দেশ, আমার জন্ম বরেন্দ্রভূমি। তাই যখনই সময় পাই, তার ধূলায় ধূলায় ধূসর হবার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠি। কিন্তু আমার বিশ্বাস একবার যদি কেউ বরেন্দ্রভূমিতে পা রাখেন তবে আদিগন্ত লালমাটির রক্তিম পটভূমি, তালবন, উঁচু টিলা, আত্রেয়ী পুনর্ভবার শ্যামল জলরাশি, বাদশাহী

সড়কের লুপ্তপ্রায় চিহ্ন, ভাঙা মন্দিরের জীর্ণ কঙ্কাল, বিশাল দিঘিগুলোর স্মৃতিময় চোখের জল দেখে বারংবার যেতে চাইবেন ইতিহাস-মুখর এই প্রাচীন ভূখণ্ডে। প্রত্নবিদ্‌দের কৌতূহল নিয়ে খুঁজে ফিরবেন কোনো বিলুপ্তপ্রায় রাজধানীর শেষসূত্র, সংগ্রহ করবেন সাগ্রহে হাজার বছর আগের কোনো প্রত্নচিহ্ন।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত সেখানে যাবার পথ কিছু ক্লান্তিকর, কষ্টসাধ্য এবং দীর্ঘ বলে মনে হত কলকাতাবাসীর কাছে। কিন্তু ফারাক্কা সেতু হবার পর এখন আর কোনো অসুবিধেই নেই।

প্রত্যেকদিন রাতে এস্‌প্লানেড থেকে স্টেটবাস ছাড়ে পর পর অনেকগুলো—বালুরঘাট, রায়গঞ্জ ও মালদার উদ্দেশ্যে। তার যে কোনো একটিতে উঠে মালদায় নেমে অজস্র ট্যাক্সি পাবেন গঙ্গারামপুর যাবার, বাসও আছে অথবা সরাসরি এস্‌প্লানেড থেকে বালুরঘাটগামী বাসে উঠে গঙ্গারামপুরে নামতে পারেন। অথবা শিয়ালদহ থেকে দার্জিলিং মেলে, গৌড় এক্সপ্রেসে বা হাওড়া থেকে কামরূপ এক্সপ্রেসে গিয়ে মালদায় নেমে যাত্রা করতে পারেন বাণগড়ের উদ্দেশ্যে। রাতে বালুরঘাট যাবার যে বাস ছাড়ে তাতে গেলে সকাল সাতটা-আটটার মধ্যেই পৌঁছে যাবেন গঙ্গারামপুরে। এখন অবশ্য রেল যোগাযোগও স্থাপিত হয়েছে। স্টেশন হয়েছে গঙ্গারামপুর। এই স্টেশনের নাম বাণগড় হলে কি ভালোই না হত! এ নিয়ে স্থানীয় অধিবাসীরা কোনো আবেদন করেছে কি না জানা নেই। এখনও তো তা করা যায়।

গঙ্গারামপুর থেকে বাণগড়ের দূরত্ব কতটুকুই বা! রিক্‌শাতে গেলে মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই চোখে পড়বে ইতিহাসের অসংখ্য স্মৃতিচিহ্ন। বাঁ পাশের ওই নদীর নাম পুনর্ভবা। মদনপালদেবের সভাকবি সন্ধ্যাকর নন্দী একেই বলেছেন 'বরেন্দ্রীহৃদয়'—এই সেই নদী যার আসল নাম অপুনর্ভবা, যার পবিত্র জলে স্নান করলে মুক্তিকামী মানুষ তৃপ্ত হন, পুনর্জন্ম হয় না আর।

গঙ্গারামপুর থানার উত্তরদিক দিয়ে এর প্রবেশ এবং তপন ও গঙ্গারামপুর হয়ে বাংলাদেশ অভিমুখে এর যাত্রা। এর পুণ্যতীরে হাজার বছর আগে গড়ে উঠেছিল বাণগড়, পুরাণ কাহিনি, ইতিহাস আর কিংবদন্তীর এক গৌরবদীপ্ত ঐশ্বর্যময়ী নগরী, আজ যা নিতান্ত একটি গ্রামমাত্র।

বাণগড়ের ইতিহাস কত বছর প্রাচীন? কেন এর নাম বাণগড়? কে ছিলেন এই বাণরাজা?

আমি এই রাজধানী পরিক্রমা করতে গিয়ে বার বার মানুষের স্মৃতির এক বিচিত্র অভিব্যক্তি লক্ষ করে বিস্মিত হয়েছি।

যখন গড়েতে গেছি, তখন স্থানীয় মানুষ কোনো ঐতিহাসিক রাজার নাম উল্লেখ করেননি। বলেছেন—চন্দ্রকেতুর কথা, যাঁর নাম কোনো ইতিহাস গ্রন্থে লেখা নেই। এই বাণগড়েও চারশো বছর ধরে যে পালসম্রাটগণ তাঁদের শৌর্য বীর্য কীর্তিকলাপে সমৃদ্ধ করেছিলেন এই জনপদ, তাঁদের কারও নামই স্মৃতিতে নেই আর। আছে এক পৌরাণিক রাজার নাম, কোনো ইতিহাস গ্রন্থে যাঁর সমর্থন নেই। অথচ কত যুগ পরেও মানুষ আজও সযত্নে তাঁকেই হৃদয়ের সিংহাসনে বসিয়ে রেখেছেন।

এ সেই রাজা বাণ, পুরাণে যাঁকে অসুররাজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আর বাণগড়ই সেই শোণিতপুর যা ছিল রাজা বাণের রাজধানী। শোণিতপুর, বরেন্দ্রভূমির রক্তের মতো

লালমাটিই কি এই নামের উৎস? কে জানে! অদূরে ওই দেবকোটকেই কি ত্রিকাণ্ডশেষ নামক সংস্কৃতকোষ গ্রন্থে বলা হয়েছে বাণাসুরের পুরী! হয়তো তাই। আর তাই হাজার হাজার বছর পরেও সেই বাণরাজাকেই মনে রেখেছেন স্থানীয় মানুষরা। কত কিংবদন্তী, কত কল্পনার গল্প গড়ে উঠেছে তাঁকে ঘিরে। সন্দেহ কি বাণগড়ে আজও যিনি অপ্রতিহত তিনি সেই পুরাণের বাণরাজাই, ইতিহাসের কোনো পাল নৃপতি নন।

ওই তো পুনর্ভবার ওপারে উষাগড়—যেখানে একদিন ছিল অসুররাজ বাণের কন্যা উষার প্রাসাদ। আজ ধ্বংসস্তূপ মাত্র, কিন্তু একদিন ওখানেই এক সুরম্য প্রাসাদের নিভৃত কক্ষে দেবী দুর্গাকে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন উষা, পরমাসুন্দরী রাজকন্যা উষা—হে দেবী, যিনি আমার স্বামী হবেন তাঁকে দেখাও, তাঁর রূপ দেখতে দাও। ভক্তিমতী উষার প্রার্থনা শুনেছিলেন দেবী দুর্গা। আর তাই স্বপ্নে দেখেছিলেন উষা—এক রূপবান বীর্যবান পুরুষ সুস্মিত হাসি নিয়ে তাঁকে বরণ করার জন্য যেন প্রতীক্ষা করে আছেন। ঘুম ভাঙে উষার। চঞ্চল হয়ে ওঠে মন। সখী চিত্রলেখা বিচলিত হয়, স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনে চমকে ওঠে, একি অসম্ভবের প্রত্যাশায় ব্যাকুল হয়েছেন উষা! স্বপ্নে যাকে দেখেছেন সে যে বাণরাজার পরম শত্রু দ্বারিকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্নের সন্তান অনিরুদ্ধ। তাঁকে কি করে লাভ করবেন উষা। কিন্তু কোনো শঙ্কা, কোনো বিপদ সম্ভাবনাতেই শান্ত হয় না উষার মন। অবশেষে মায়াবিনী চিত্রলেখা দ্বারকা থেকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন অনিরুদ্ধকে।

খবর যায় রাজা বাণের কাছে। তিরস্কার করেন রাজা, অবাধ্য কন্যাকে কঠোর শাসনে নিবৃত্তি করতে চেষ্টা করেন, স্নেহের অবুঝ শৃঙ্খলে বাঁধতে চান উষার মন। কিন্তু সব আবেদন ব্যর্থ হয়। একদিন এক দ্রুতগামী অশ্বক্ষুর-ধ্বনিতে চকিত হয়ে ওঠেন অসুররাজ। দেখেন, দূরের প্রাসাদ থেকে বিদ্যুতের মতো ঝলসে উঠেছে দুটি অশ্বারোহী মূর্তি। মুহূর্তের মধ্যে খবর পান রাজা, কৃষ্ণপৌত্র অনিরুদ্ধ এইমাত্র তাঁর কন্যাকে হরণ করে নিয়ে চলে গেল দ্বারকার দিকে।

ওই তো সেই উষাহরণ সড়ক! লোকে বলে ওই পথেই একদিন বাণরাজার মেয়ে উষাকে হরণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন অনিরুদ্ধ। না, মহীপাল রোড নয়, ধর্মপাল সরণী নয়, উষাহরণ রোড। শ্রদ্ধায়, ভালোবাসায় গর্বিত বাণগড়ের মানুষ। অতীত গৌরবের সৌরভে আপ্লুত স্থানীয় অধিবাসীগণ আগ্রহী শ্রোতার কাছে আরও বলেন—ওই দূরের কালো দিঘিই বাণরাজার মহিষী কালোরানির স্মৃতি বহন করছে। উষাহরণের পর বাণরাজা আর শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে যখন তুমুল যুদ্ধ শুরু হল, তখন নিশ্চিত পরাজয় জেনে ওই কালোদিঘির জলেই মৃত্যুর ময়ূরপঙ্খী ভাসিয়েছিলেন রাজমহিষী কালোরানি। ওই দিঘিরই গভীরে আজও অতৃপ্ত সেই রানির আত্মা এক দুঃসহ অপমানের জ্বালায় অশান্ত ঢেউয়ের মতো গুমরে ওঠে। রাত গভীর হয় দিঘির পঙ্কশয্যা ছেড়ে রাজপালঙ্কের দুর্বার আকর্ষণে উঠে আসেন কালোরানি, বাণগড়ের ধ্বসস্তূপে ঝিল্লির শব্দ যেন নূপুরের মতো বাজে, পুনর্ভবার জল অশ্রুরেখার মতো ছলছল করে, ব্যাকুল হাওয়া হাহাকারের মতো আছড়ে পড়ে ভাঙা খিলান আর লুপ্তপ্রায় গৃহভিত্তিতে—না কাউকেই দেখতে পান না কালোরানি—উষাহরণ সড়কের শূন্য হতাশার রেখা এঁকে দেয় বুকের গভীরে। রাত শেষ হয়, কালোদিঘির জলের অতলে ক্লান্ত হতাশায় আবার মাথা রাখেন রাজমহিষী কালোরানি!

আর বাণগড় থেকে কয়েক মাইল দূরের ওই তপনদিঘির দিকে আঙুল তুলে স্থানীয় মানুষেরা বলেন—ওই সেই দিঘি, যার তীরে একদিন কঠোর এক তপস্যায় নিজেকে তীক্ষ্ণ লৌহশলাকায় বিঁধে করে মহাদেবকে তুষ্ট করতে চেয়েছিলেন সহস্রবাহু বাণরাজা। তপস্যায় নিষ্ঠা প্রমাণের জন্য নয়শো নিরানব্বইটি বাহু ছেদন করে এইখানেই একদিন যজ্ঞ করেছিলেন তিনি। সন্তুষ্ট হয়েছিলেন মহাদেবাদিদেব। যদিও শ্রীকৃষ্ণের হাতে বাণাসুরের নিধন দৈব-নির্দিষ্ট ছিল, তবু উত্তরকালের মানুষ যাতে বাণরাজাকে শ্রধা জানায় তারজন্য মহাদেবেরই আদেশে সেই বিচিত্র তর্পণের জায়গায় খনিত হল বিশাল এক দিঘি—তর্পণদিঘি। আজ মানুষের মুখে যা তপনদিঘি নামে খ্যাত। আর ওই সেই স্থান করদহ, যেখানে সহস্রবাহু বাণরাজার নয়শো নিরানব্বইটি কর দাহ করা হয়েছিল।

কিন্তু এ সবই সেই কল্পনার গল্প। ইতিহাসে বাণগড়ের অস্তিত্ব কবে থেকে স্বীকৃত? ১৯৩৭-৩৮ এবং পরে ১৯৪০-৪১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামীর নেতৃত্বে বাণগড়ে ব্যাপক খননকার্য শুরু হয়। যদিও তারপর সেই উদ্যম আর একবারও সক্রিয় হয়ে ওঠেনি, তবু সেই প্রাথমিক অনুসন্ধানের সময়ই চমকপ্রদ সব ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ঘাটিত হয় সর্বসমক্ষে এবং বাণগড় যে কত প্রাচীন তার একটা নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেছে।

প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্গত ছিল এই বাণগড় যা কোটীবর্ষ হিসাবেও পরিচিত ছিল। হরিসেন-এর বৃহৎকথাকোষ গ্রন্থে (৯৩১ খ্রিঃ) উল্লেখ আছে, মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের গুরু প্রখ্যাত জৈনসূরী ভদ্রবাহু ছিলেন এই দেবকোট বা কোটীবর্ষ বা বাণগড়েরই এক ব্রাহ্মণের সন্তান। তিনি যখন ছোটো ছিলেন তখন চতুর্থ শ্রুতকেবলী গোবর্ধন একবার এখানে বেড়াতে এসে শিশু ভদ্রবাহুকে দেখে মুগ্ধ হন এবং তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যান। পরে জৈনধর্মে দীক্ষিত হয়ে ভদ্রবাহু শ্রুতকেবলী পদে উন্নীত হন। জৈন কল্পসূত্র গ্রন্থে 'কোডিবর্ষীয়া' নামে ভিক্ষুদের একটি শাখার কথাও আছে। সেই কোটীবর্ষ, বলা বাহুল্য আজকের এই বাণগড়।

১৯৩৮-৪১-এর খননকার্যের ফলে সবচেয়ে প্রাচীন যে নিদর্শন পাওয়া গেছে তাও মৌর্য এবং সুঙ্গযুগের।

আমি যখন চন্দ্রকেতুর গড়ে গিয়েছিলাম, তখন সেখানকার মন্দিরের ভিত্তিভূমি দেখে চকিতে মনে পড়েছিল এই বাণগড়ের কথা। সেকথা বলেওছিলাম বন্ধুবর গৌরীশঙ্কর দে-কে। মন্দিরময় দেবালয় বা দেগঙ্গা বা বেড়াচাঁপার মতো এই দেবকোট বা বাণগড়ও যে দেবালয় পূর্ণ ছিল সেকথা পরবর্তীকালে সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতে পড়েছি। পুণ্যতোয়া পুনর্ভবার তীরে একদা এই বাণগড়ে উঠেছিল অসংখ্য মন্দির। পৌরাণিক বাণরাজা ছিলেন শৈব। আজও নিকটবর্তী শিববাটি গ্রামের নাম তার সাক্ষ্য বহন করছে, সেখানকার শিবমন্দিরে আজও পূজার্চনা হয়। বালুরঘাট কলেজের সংরক্ষণাগারে যে শিলালিপি আছে, তা জানায় প্রথম মহীপাল এখানে একটি শিবমন্দির স্থাপন করেছিলেন। এই মন্দিরে যে প্রদীপ জ্বলত তাও রক্ষিত আছে সংরক্ষণাগারে।

এর পরবর্তী স্তরে পাওয়া গেছে গুপ্তযুগের অসংখ্য স্মারকচিহ্ন। কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামীর বিবরণীতে আছে, সবচেয়ে গভীর পঞ্চম স্তরে পাওয়া গেছে একটি ২ ফুট ৫ ইঞ্চি ব্যাসের

কুয়ো। মৌর্যযুগের সভ্যতার কিছু নিদর্শনসহ এই কুয়োর আবিষ্কার বাংলার এ অঞ্চলের আদি সভ্যতার এক স্মারক হিসেবে চিহ্নিত। এছাড়া পালিশ করা কালো মৃৎপাত্রের অজস্র উপকরণ; যেমন—কাপ, ডিস, জলপাত্র ইত্যাদিও মৌর্যযুগের নিশ্চিত প্রমাণের মতো সংগৃহীত হয়েছে। চতুর্থ স্তরে সুঙ্গযুগের পয়ঃপ্রণালী শক্ত ইঁটের দ্বারা তৈরি ঘরবাড়ির চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে।

তৃতীয় স্তরে প্রায় ১১ ইঞ্চি ব্যাসের দেওয়ালের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। গঠন কৌশল এবং বিচিত্র ধাঁচের ঘরের চিহ্ন ও কুণ্ডের চিহ্ন দেখে অনুমিত হয় সম্ভবত এগুলি কোনো মন্দিরের ভগ্নাবশেষ। এছাড়া আবাসগৃহ, ভাণ্ডার-রান্নাঘরের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ঘরবাড়ির ভগ্নপ্রায় দেওয়ালগুলো এবং অন্যান্য উপকরণ প্রমাণ করেছে এই স্তরটি গুপ্তযুগের। দ্বিতীয় স্তরে আছে পালযুগের স্থাপত্য-ভাস্কর্যের নিদর্শন। গড়ের প্রাকার, গৃহপ্রাচীর, আবাসগৃহ, মন্দির, স্নানঘর, পয়ঃপ্রণালী, কুয়ো প্রভৃতি অজস্র নিদর্শন পালযুগের বাণগড়কে আজও স্মরণীয় করে রেখেছে। এই প্রথম পাথরের তৈরি থাম, দরজার অর্গল এবং অসংখ্য কারুকার্যময় পাথরের উপকরণ শিল্পসমৃধ পালযুগের ঐশ্বর্যকে সর্বসমক্ষে তুলে ধরেছে।

ফুল, পাখি, পশু, মানুষ অলংকৃত লতাপাতা বস্তুত পাথরের ওপর মানুষের সৌন্দর্যসৃষ্টির যাবতীয় উপকরণ এই বাণগড়ের মাটি থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। সাধারণত পোড়ামাটির অলংকরণ যেখানে বাংলার প্রধান শিল্পমাধ্যম, সেখানে পালযুগের রাজমহল থেকে সংগৃহীত পাথরের এত অজস্র কারুকার্য সম্ভবত সারা বাংলার আর কোথাও পাওয়া যায়নি।

এছাড়া সংখ্যাধিক তাম্রমুদ্রা এবং পোড়ামাটির ভাস্কর্যও আবিষ্কৃত হয়েছে। যার প্রথম স্তরে স্পষ্টতই মুসলমানযুগের স্থাপত্য নিদর্শন ছড়ানো রয়েছে দেখা যায়। যদিও প্রকৃতির হাতে এই অংশেরই ক্ষতি হয়েছে সবচেয়ে বেশি। ইতিহাস বলে, বখতিয়ার খিলজী নুদিয়া বা নদিয়া অধিকার করে লক্ষ্মণাবতী বা গৌড়ে প্রথম রাজধানী না করে এখানে এই দেবকোটেই প্রথম রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। এই দেবকোটেই ছিল তাঁর সেনানিবাস, যা এখন দমদমা নামে পরিচিত।

—দাঁড়ান। আপনি কোথা থেকে আসছেন?

রিক্‌শা থেকে নেমে আমি বাণগড়ের প্রথম প্রত্নচিহ্নের কাছাকাছি যাবার জন্য উঁচু টিলার ওপর উঠতেই প্রশ্ন করলেন একজন সেনাবাহিনীর অফিসার।

—না, মৌর্য নয়, সুঙ্গ নয়, কুষাণ-গুপ্ত-পাল বা বখতিয়ার খিলজীর সেনাবাসের কোনো সতর্ক প্রহরী নন, বিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের সেনাবাহিনীর একজন প্রতিনিধি।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। হাতের ক্যামেরা দুলে উঠল।

আবার গম্ভীর জিজ্ঞাসা—কিজন্য এখানে এসেছেন?

মুহূর্তে বুঝতে পেরেছি ভুলটা কোথায় হয়েছে। তখন ভারত-পাকিস্তানের যুধ চলছে, গঙ্গারামপুরে মিলিটারি ক্যাম্প বসেছে শুনেছিলাম। কিন্তু তা যে বাণগড়ের এই টিলায় তা জানতাম না।

পরিচয় দিলাম।

—আইডেনটিটি কার্ড আছে?

দুর্ভাগ্য, ছিল না।

—আপনাকে থাকতে হবে এখানে।

হাত-পা হিম হয়ে এল আমার। এখন যে এটা নিষিদ্ধ অঞ্চল আমাকে তা কেউই বলেনি। এমনকি রিক্‌শাওয়ালাও নয়। বরং ফটো তুলতে কোনো আপত্তি নেই, সে কথাই বলেছিল সে। অন্ধকার নেমে আসছে বাইরের পৃথিবীতে এবং বুঝতে পারছি আমার মনেও। কি করব ভাবতে পারছি না। বালুরঘাটের সর্বজনপরিচিত সমাজসেবী আমার মামা শ্রীব্যোমকেশ চক্রবর্তীর নাম করব কিনা ভাবছি, এমন সময় অফিসারটি আবার জানতে চাইলেন, কেন এখানে এসেছি আমি। প্রায় শেষ চেষ্টার মতো অত্যন্ত বিনীতভাবে যতদূর সম্ভব ভুল হিন্দিতে এই ঐতিহাসিক স্থান দেখতে আসার কারণ ব্যক্ত করলাম। এর আগেও এখানে আমি এসেছি, কথাটার হিন্দি কিছুতেই মনে পড়ল না। সামান্য ভুল ইংরেজি মেশাতে হল এবং কিছুক্ষণ নিজেদের সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁরা কি ঠিক করলেন কে জানে! তারপর আমাকে বললেন সেই অফিসার—ইংরেজি তো জানেন, বাইরে তো নোটিশ দেওয়া আছে এটা প্রটেকটেড এলাকা, দেখেননি?

নোটিশ দেখে আমি আসিনি। বললাম সে কথা। আর আমার উদ্দেশ্য যে কিছু অসৎ নয় তাঁরা তা বুঝলেন। বললেন, বাণগড়ের কোথাও ছবি তুলবেন না, এটা বর্ডার এলাকা, এখন যুদ্ধ চলছে। আপনি ফিরে যান।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালাম মনে মনে। তিলমাত্র দেরি না করে ফিরে এলাম রিক্‌শায়। দ্রুত মিলিয়ে যাচ্ছে পেছনের টিলা আর দেখতে পেলাম তার শীর্ষে দাঁড়িয়ে আমার যাত্রাপথের দিকে লক্ষ রাখছেন সেনাবাহিনীর সতর্ক প্রহরীরা। ভয়ও মিলিয়ে যাচ্ছে, আমি কল্পনার পটভূমিতে যেন স্পষ্ট দেখলাম, বহু যুগের ওপার থেকে বাংলার রাজধানী বাণগড় যেন আবার হারানো বৈভব ফিরে পেয়ে অর্বাচীন এক মূঢ় দর্শককে রাজকীয় মর্যাদায় ফিরিয়ে দিচ্ছে।

কিন্তু সে তো দেশের জরুরী অবস্থায় এক স্বাভাবিক ঘটনা। এখন আপনি নিশ্চিন্তে উঠতে পারেন সেই টিলাতে। উঠলেই দেখতে পাবেন কালের প্রহরে শীর্ণ কঙ্কাল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি গৃহের প্রাচীর। মাথায় কোনো আচ্ছাদন নেই, প্রবল বাতাস শূন্য কক্ষগুলোর রিক্ত বুকে ক্ষ্যাপার মতো যেন অতীতের ঐশ্বর্যের সন্ধানে ছুটে বেড়ায়। এখান থেকে স্পষ্টই দেখা যায় দূরের ওই পুনর্ভবাকে। কে জানে, এই ভগ্নগৃহগুলোই সেই বিপণী শ্রেণি কিনা, সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগরে' যার উল্লেখ আছে। কোটালীপাড়া ও দামোদরপুরে পট্টোলীতেও তো আছে নব্যাবকাশিকা যা কোটিবর্ষ বণিক ও ব্যবসায়ীদের খুব সমৃদ্ধ মিলনকেন্দ্র ছিল। আমি কিছুই জানি না—শুধু জানি, বাণগড়ের ধূলায় মিশে আছে হাজার হাজার বছর প্রাচীন ইতিহাস। টিলা থেকে নেমে আরও এগোই। ওই সেই বিশাল গড়ের ভগ্নাবশেষ, গড় একদিন এই সমৃদ্ধশালী নগরবন্দরকে রক্ষা করেছিল। গড়ের সামনে ঘন শৈবালে ঢাকা পরিখা তার পাশ দিয়ে কাঁচামাটির রাস্তা চলে গেছে বাণগড়ের আরও ভেতরে। জনপদবাসী প্রায় অধিকাংশই সাঁওতাল, বাংলা বোঝেন। নিকনো উঠোন, পরিচ্ছন্ন রুচির এই আদিবাসীদের জিজ্ঞাসা করলেই এই প্রাচীন এ খণ্ডের অতীত গরিমার কথা তাঁরা সগৌরবে বললেন। তথ্যে ভুল থাকে, রাজাদের ক্রমও ঠিকঠাক মেলে না, তবু তাঁরা যে এই জায়গাটির গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন—এই অভিজ্ঞতা সত্যিই বিস্মিত করে।

বিস্মিত হয়েছিলাম সত্যিই। কর্ণসুবর্ণতে যেমন দেখেছি স্থানীয় মানুষের কিছুটা অবহেলা, এখানে কিন্তু তা নয়। স্থানীয় পোস্ট-মাস্টারমশায়ের বাড়িতেই আলাপ হয়ে গেল প্রাথমিক

বিদ্যালয়ের এক শিক্ষকের সঙ্গে। দূব কলকাতা থেকে তাঁদের এই নগণ্য গ্রাম দেখতে এসেছি শুনে তিনি আমাকে সাগ্রহে ঘুরিয়ে দেখালেন বাণগড়ের বিস্তৃত ধ্বংসাবশেষ। যতই এগোই তিনি একে একে বলতে থাকেন এই জনপদের প্রাচীন কাহিনি। পোস্ট-মাস্টারমশায়ের বাড়ির ঠিক পেছনেই আছে চারটি পাথবের খিলান, সম্ভবত মুসলমান আমলের আর তার একটু দূরেই আছে দুটি পুষ্করিণী—অমৃতকুণ্ড ও জীবৎকুণ্ড। কিংবদন্তী বলে, এই দুটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেই বাণরাজা। এর কাছেই ছিল তাঁর প্রাসাদ। এ দুটি পুকুরের জলে স্নান করলে মৃত সৈন্য আবার পুনর্জীবন লাভ করত। না, আজ আর সেই মৃতসঞ্জীবনী ক্ষমতা নেই কুণ্ড দুটির। কল্পনার গল্পই বলে, যবনেরা মৃত গাভী ফেলে এর পবিত্রতা নষ্ট করে দিয়েছে এক সময়। বিদেশি পর্যটক বুকানন হ্যামিলটন লিখেছেন, সম্ভবত কুণ্ড দুটি কোনো বৃহৎ দুটি মন্দির সংলগ্ন ছিল। অমৃতকুণ্ডের জলে একটি মস্ত পাথর আছে। দিনাজপুরের মহারাজা সেটি তোলবার চেষ্টা করেছিলেন একবার, পারেননি। পরে আর একবার চেষ্টা করা হয়েছিল। তখন দেখা যায় ওই পাথরটি একটি বৃষের শিলামূর্তি, সম্ভবত কোনো শিবমন্দির ধ্বংস করে ওখানে নিক্ষেপ করা হয়েছিল।

যেন গভীর বেদনায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে অমৃতকুণ্ড আর জীবৎকুণ্ড। জলের রঙ কোনো সম্ভ্রম জাগায় না নবাগত দর্শকের চোখে, তবু আজও চৈত্র মাসের ত্রয়োদশী তিথি পুনর্ভবা তীরে যেদিন বারুণী মেলা বসে, সেদিন প্রথমে অমৃতকুণ্ডে ও পরে জীবৎকুণ্ডে স্নান করে পুণ্যার্থীরা শিববাটির প্রাচীন শিবমন্দিরে পুজো দিতে গিয়ে হাজার হাজার বছর আগের এক স্মৃতির কাছেই শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেন। সেই শিক্ষকমহাশয় দেখালেন এমন অজস্র স্মৃতির অতীতের স্মারক চিহ্নগুলো। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই খননকার্যের ফলে আবিষ্কৃত বিভিন্ন যুগের প্রত্নসম্পদ আজও ছড়ানো আছে বাণগড়ের মাটিতে। শিববাটিরই একটি একচালায় গ্রামের মানুষেরা সযত্নে সংরক্ষণ করে রেখেছেন সংখ্যাধিক পাথরের মূর্তি। সেগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে মনে হয়েছে, কলকাতার যাদুঘর, আশুতোষ চিত্রশালা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এবং সমগ্র বাংলাদেশে ছড়ানো অসংখ্য মানুষের ব্যক্তিগত সংগ্রহে যত পালযুগের মূর্তি সংগৃহীত হয়েছে তার সংখ্যা কয়েক হাজার হবে। বালুরঘাট মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীঅচিন্ত্যকৃষ্ণ গোস্বামী, জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীচিত্ত দত্ত এবং কোটীবর্ষ বাণগড় বিষয়ে একনিষ্ঠ গবেষক প্রবীণ ব্যবহারজীবী শ্রীকমলন্দে চক্রবর্তীর উদ্যোগে জেলায় একটি সংগ্রহশালা স্থাপিত হয়েছে, তাতেও মূর্তির সংখ্যা কিছু কম নেই। তবু এখনো সমগ্র উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার পথে-প্রান্তরে, পুকুরের পাড়ে, অরণ্যের নিভৃতে, দিঘির গভীরে যত মূর্তি অবহেলায় পড়ে আছে তা সংগ্রহ করতে পারলে একটি অমূল্য সংগ্রহশালা স্থাপন করা অসম্ভব নয়। অসম্ভব শুধু সেগুলো সংগ্রহ করা। কেননা দীর্ঘ পাথরের মূর্তিগুলো বহন করে আনা সত্যিই কষ্টসাধ্য। যেগুলোর আকৃতি ছোটো, লোভী ব্যবসায়ীদের শ্যেনদৃষ্টি ক্রমশ সেগুলোকে গ্রাস করছে এবং স্থানীয় মানুষেরা কখনো অভাবের জন্য, কখনো অজ্ঞানতা- বশত স্বল্পমূল্যে সেগুলো বেচে দিচ্ছেন। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ অনায়াসে এগুলো সংরক্ষণ করতে পারেন এবং তা না করলে বহু অমূল্য প্রত্নসম্পদ চিরকালের মতো লোকচক্ষুর আড়ালে চলে যাবে। বিদ্যালয় পরিদর্শনকালে পথের ধার থেকে, পুকুরের পাড় থেকে এমন বহু মূর্তি সংগ্রহ করেছিলেন আমার বাবা এবং স্বাধীনতাপূর্ব যুগে সেগুলো রাজসাহী বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতিকে দান করেন।

সেই একচালার সামনে থেকে আর একটু এগোতেই শিক্ষকমহাশয় একটি জায়গা দেখিয়ে বললেন—স্বপ্নাদেশ পেয়ে এখান থেকেই নাটোরের মহারাজা কালীমূর্তি সংগ্রহ করেছিলেন। সমানে একটি ছোটো খাল। সেটা পেরোতেই ওপরে আর একটি টিলার ওপর সেই প্রাচীন শিবমন্দির। কিংবদন্তী বলে—এই শিবমন্দির রাজা বাণের তৈরি। কিন্তু বাণগড়ের ধ্বংসস্তূপ থেকে দিনাজপুরের মহারাজা যে অপূর্ব কারুকার্যময় প্রস্তরস্তম্ভ সংগ্রহ করেন তার পাদদেশে উৎকীর্ণ এক শিলালিপি বলে—দুর্দমনীয় শত্রুসৈন্য দমনে দক্ষ 'কম্বোজান্বয়জ' গৌড়পতি 'কুঞ্জরঘটাবর্ষে' ইন্দুমৌলির (শিরের) এই ভূ-ভূষণ নির্মাণ করিয়েছিলেন। রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় তাঁর 'গৌড়রাজমালায়' এই স্তম্ভলিপি দশম শতাব্দীর বলে সিধান্ত করেছেন। 'কম্বোজান্বয়জ' শব্দটির অর্থ কাম্বোজ দেশীয় বা জাতীয় লোকের বংশভুত। সমসাময়িক আর একটি তাম্রলিপি আবিষ্কৃত হয়েছে বালেশ্বরে। সেটি রাজা নয়পালের ইর্দা তাম্রপট নামে খ্যাত। এই নয়পাল কাম্বোজজাতীয় রাজা ছিলেন। ইনিই কি কিছুকালের জন্য বরেন্দ্রভূমি জয় করে এই শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন? এই বংশের আদি রাজা ছিলেন রাজ্যপাল। তিনি পরম সৌগত অর্থাৎ বৌধ পরবর্তী রাজা নারায়ণপাল বাসুদেবের ভক্ত এবং নয়পাল শৈব ছিলেন। পালরাজারাও প্রথমে বৌধ ছিলেন যদিও তাঁদের মন্ত্রীরা ছিলেন শাস্ত্র ও শাস্ত্রকুশলী ব্রাহ্মণ। সম্ভবত সমাজে ব্রাহ্মণ্যাদর্শ দৃঢ়প্রতিষ্ঠ ছিল ও তান্ত্রিক বৌধধর্ম পরে তান্ত্রিক শৈবধর্মের সঙ্গে মিশে যায়।

কিন্তু রাজা নয়পাল নয়, আমি ভাবছি প্রথম গোপালদেবের কথা। মাৎস্যন্যায় দূর করার অভিপ্রায়ে প্রকৃতিপুঞ্জ যাকে রাজলক্ষ্মীর করগ্রহণ করিয়েছিল—কোথায় ছিল তাঁর রাজপ্রাসাদ? তাঁর পুত্র দিগ্বজয়ী ধর্মপাল সেই প্রাসাদের কোন্ কক্ষ থেকে এই বিখ্যাত তাম্রশাসন খোদিত করার অনুজ্ঞা জারি করেছেন? আজ তার কোনো চিহ্নই নেই। হারিয়ে গেছে কবে সেই প্রাসাদশালা। শুধু পালসম্রাটের কারো কারো নাম আজও কোনো কোনো মানুষের মনের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত আছে। আর তাঁদের মধ্যে মহীপালের নামই বোধহয় কিছুটা অগ্রাধিকার পেয়েছে। আজও স্থানীয় মানুষেরা বলেন, 'ধান ভানতে মহীপালের গীত।' বাণগড় থেকে আরও কিছু দূরে বিশাল মহীপাল দিঘি আজও তাঁর নামের স-করুণ স্মৃতি বুকে নিয়ে ঢেউ তুলছে। আর বালুরঘাটের কাছে মহীসন্তোষেই তো ছিল তাঁর প্রাদেশিক রাজবাড়ি। আর মুর্শিদাবাদের মহীপাল তবে কে ছিলেন? আমি জানি না। শুধু জানি, এই বাণগড় থেকেই পাওয়া গেছে ১ম মহীপালের তাম্রশাসন। এতে গোপাল, ধর্মপাল, দেবপাল, ১ম বিগ্রহপাল, নারায়ণপাল, রাজ্যপাল, ১ম গোপাল, ২য় বিগ্রহপাল এবং ১ম মহীপালের নাম আছে। কিন্তু কোথায় ছিল ২য় মহীপালের নীতপুরের প্রমোদভবন—যেখানে একদিন কৈবর্তকন্যা চিত্রমতিকাকে নিয়ে সুখের প্রহর উদ্‌যাপনের মোহে রাজ্যশাসন শিথিল করে দিয়েছিলেন নৃপতি ২য় মহীপাল। কবে কখন ধুলোয় মিশে গেছে সেই প্রমোদভবনের প্রতিটি অণু-পরমাণু। শুধু আজও বালুরঘাট থেকে চোদ্দ মাইল দূরে সাপাহাড় গ্রামের উপকণ্ঠে একটি দিঘি আর দিঘির জলে প্রোথিত আটকোণা একটি স্তম্ভ যুগ যুগ ধরে আর একটি গণ-বিদ্রোহের সোচ্চার সাক্ষীর মতো এখনো নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করছে। এই সেই দিবোর দিঘি। কৈবর্তনায়ক দিব্যোক যার নির্মাতা, সন্ধাকর নন্দী যাঁকে আখ্যা দিয়েছিলেন রাজপ্রভাকর বিশেষণ, অনন্ত সমন্তচক নিয়ে যিনি একদিন বিদ্রোহ

ঘোষণা করেছিলেন 'অনীতিকারিস্তরত' অর্থাৎ দুষ্কার্যরত রাজা ২য় মহীপালের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন মহীপালেরই নৌ-সেনাপতি। বিশ্বস্ত মহাবীর কৈবর্তসন্তান দিব্যোক কিন্তু বিলাসী ছিলেন। গৌড়পতি মহীপাল নারীদেহ আর প্রজাশোষণের দুর্বার মোহে তিনি ক্রমে চরম অবহেলায় প্রায় ধ্বংসের মুখোমুখি এনে ফেলেছিলেন গৌড়রাজ্যকে। অভিযোগ জানায় সাধারণ মানুষ তাদের অতিপ্রিয় রাজপ্রতিনিধি দিব্যোককে। অবশেষে যেদিন তারই ভগ্নী চিত্রমতিকাকে মহীপাল পট্টমহিষী করার প্রলোভন দেখিয়ে নিয়ে গেলেন নীতপুরের প্রমোদভবনে, সেদিন বিদ্রোহের আগুনে দীপ্তশিখার মতো জ্বলে উঠলেন দিব্যোক। গ্রামে গ্রামে সে বার্তা রটে গেল। নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষ মুহূর্তে এক প্রচণ্ড সংহত শক্তির বজ্রতে রূপান্তরিত হল। আর তারপর সোনাডাঙ্গার প্রান্তরে সেই গণ-বিপ্লবের অগ্ন্যুৎপাত। রাজার বিরুদ্ধে প্রজার বিদ্রোহ। বাংলাদেশের ইতিহাসে সে এক দুঃসাহসী অধ্যায়—গণ-জাগরণের এক নির্ভুল পদক্ষেপ।

জয়ী হয়েছিলেন দিব্যোক। বরেন্দ্রভূমির শাসনভার গ্রহণ করেছিলেন শোষিত মানুষের একজন প্রতিনিধি। আর তাঁরই স্মরণে সোনাডাঙ্গার প্রান্তরে খনিত হয়েছিল এই দিবোর দিঘি আর এই জয়স্তম্ভ। বরেন্দ্রভূমির ইতিহাসে এই বিচিত্র গণ-অভ্যুত্থানের উল্লেখ আছে 'রামচরিত'-এ। ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে পাওয়া মনহলি গ্রামে মদনপালের তাম্রশাসনে যার ইঙ্গিতমাত্র দেওয়া আছে।

কিন্তু কোথায় রাজচক্রবর্তী রামপালের রামাবতী নগরী? আজও তার সমান্য সূত্র পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। শুধু অনুমান আর সম্ভাবনার আভাষ বলে ইটাহার থানার অন্তর্গত আমাতি নামের এক ধ্বংসাবশেষ আকীর্ণ গ্রাম নিতান্ত অবহেলায় জেগে আছে। হতে পারে রামাবতী নগরীর নামেরই অপভ্রংশ ওই 'আমাতি' নামটি! আজও সেখানে কোনো বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চালানো হয়নি। তবে সম্প্রতি স্থাপিত হয়েছে 'পৌণ্ড্রবর্ধন ইতিহাস চর্চা কেন্দ্র'। গবেষক ধনঞ্জয় রায় জানালেন, 'আমাতি'ই যে রামাবতী সে বিষয়ে যথেষ্ট তথ্য-প্রমাণাদি পাওয়া গেছে সেখান থেকে। গৌড়ের কাছে মহদীপুর গ্রামের 'শ্রীযক্ষপালস্য' লেখা একটি পাথর মাটিতে গাঁথা আছে, ওটা ওখানে গেল কি করে কে জানে! কত যুগের কত ঘটনার কথা নীরব হয়ে আছে এই বাণগড়ের বাতাসে।

কে জানে এখান থেকেই কিনা এক তাম্রলিপিতে মালদহের হবিবপুরের কাছে নন্দদির্ঘিকায় একটি বৌধবিহার নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছিলেন মহেন্দ্র পালদেব, পালবংশের চতুর্থ সম্রাট! অথচ আশ্চর্য এই প্রায় সম সময়ে গুর্জর প্রতিহাররাজ এক মহেন্দ্রপালের নামও ইতিহাসে উল্লেখ আছে। মালদার গবেষক কমল বসাক মনে করেন, তারানাথ যেমন লিখেছেন তেমনই পাল রাজবংশ দুই তরফে হয়তো ভাগ হয়ে যায়। এক তরফ বরেন্দ্রভূমির সাম্রাজ্য অধিকার করেন, অপর তরফ চলে যান বাংলার বাইরে, বিহারে বা অন্যান্য জায়গায়। আমি মহদীপুরে যে যক্ষপালের শিলালেখ দেখেছিলাম, শ্রীবসাক মনে করেন সেটি ওই দ্বিতীয় তরফের কোনো সম্রাটের, কেননা পালবংশ তালিকায় যক্ষপালের নাম নেই, যেমন নেই মহেন্দ্রপালের নাম।

প্রকৃতির কি আশ্চর্য লীলা। ঠিক যেমন পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালদেবের পরিচয় সহ এক তাম্রলিপি কৃষকের লাঙলের মুখে তুলে দিয়েছিল, এবারও হবিবপুরের তুলাভিটার জনৈক জগদীশ বাইনের কোদালের মুখে তুলে দিল আর এক তাম্র-ফলক, যা আবার নতুন

নতুন করে পালবংশের ইতিহাস রচনার সহায়ক হয়ে উঠল। ওই তাম্রলিপি জানালো, মহেন্দ্রপালের এক সেনানী বজ্রদেব জনৈক ব্যক্তিকে বৌধ্ববিহার নির্মাণের জন্য নন্দদির্ঘিকার বা উদ্রঙ্গে, যার অর্থ জলাশয়, নিকটবর্তী স্থান দান করছেন। জগজীবনপুর নামের এক অখ্যাত গ্রামের নন্দদিঘির নিকটবর্তী সেই স্থানে পাওয়া তাম্রশাসন ডেকে আনল বিশেষজ্ঞদের, উৎখনন শুরু হল। আত্মপ্রকাশ করল এক মহাবিহার। বিশালাকায় সেই বিহারের গায়ে, কোথাও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে আছে অজস্র অসামান্য টেরাকোটার ফলক, যার সঙ্গে মহাস্থানগড় আর পাহাড়পুরের ফলকের সঙ্গে যথেষ্ট মিল।

সেই সুবৃহৎ বিহারের সামনে দাঁড়িয়ে আমি ধ্যানগম্ভীর এক পরিমণ্ডলের স্তব্ধতা টের পাই। বিস্ময় ছড়িয়ে যায় উৎখননের প্রতীক্ষারত চারপাশের অন্যান্য উঁচু ভূখণ্ডগুলোর ওপরে। কালের মন্দিরা যেন বাজে নন্দদিঘির জলের কলরোলে। শুধু জগজীবনপুরের এই মহাবিহারই নয়, পাল সম্রাট রামপাল স্থাপন করেছিলেন আর একটি বৌধ্ববিহার জগদল্লায়। মালদহের বামনগোলা থানার এই জগদলা গ্রামেই সেই জগদল্লার স্মৃতি, নাকি পার্শ্ববর্তী পাহাড় জগদল্লা গ্রামেই মাটির গভীরে ঐশ্বর্য লুপ্ত হবার বেদনায় মুখ লুকিয়েছে জগদল্লা মহাবিহার। ওপারে অধুনা অপর রাষ্ট্র বাংলাদেশের দ্বারপাল গ্রাম। সন্দেহ কি পাল সম্রাটদের স্মৃতিবাহী সেও। নালন্দায় যেমন অতীশ দীপঙ্কর তেমনই জগদ্দল মহাবিহারের মঠাধ্যক্ষ ছিলেন অভয়কর গুপ্ত। না, কোনো শ্রমণ নেই আর, নেই কোনো মন্ত্রোচ্চারণের সু-গম্ভীর ধ্বনি। জগদ্দল পাথরের মতোই স্থির, স্তব্ধ হয়ে আছে জগদ্দল বিহারের লুপ্ত অবশেষ।

পাল সম্রাটরা বাংলায় আর একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য মহাবিহার স্থাপন করেন রাজসাহীতে, সোমপুর মহাবিহার যার নাম এবং আজ যা পরিচিত পাহাড়পুর মহাবিহার নামে। গৌড়াধিপতি ধর্মপাল শুধু সোমপুরই নয় বিহারে বিক্রমশীলা মহাবিহারও স্থাপন করেন। দুটি বিহারই সে যুগে শিক্ষায়, দীক্ষায় এক সুউচ্চ আদর্শের কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

আমি সোমপুর মহাবিহারে এলাম মহাস্থানগড় পরিক্রমা করে। সঙ্গে ভ্রমণসঙ্গী নীহার। বাংলার আদিযুগ থেকে প্রাগাধুনিক যুগ পর্যন্ত টেরাকোটার বিবর্তনের ইতিহাস রচনার প্রয়োজনে সে দু'পার বাংলায় তন্ন তন্ন অনুসন্ধান করছে। জয়পুর হাটে রাত কাটিয়ে ভোরে পাহাড়পুরে, এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার মুখোমুখি। জগজীবনপুরের মহাবিহার যেখানে মাটির গভীর থেকে এখন তার বিশালতার সমৃদ্ধির মুখ দেখাচ্ছে, সেখানে এখনো সগর্বে পাহাড়প্রতিম উচ্চতায় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়পুর মহাবিহার। এত উঁচু বলেই কি সোমপুর এখন পাহাড়পুর? কিছুদূরের ওমপুর গ্রামই শুধু এখন সোমপুরের সকরুণ স্মৃতি। আর পঞ্চম শতকে যখন এর নাম ছিল বটগোহালি, তার কোনো চিহ্ন আজ কোথায় পাবো? হারিয়ে গেছে জৈন শ্রমণাচার্য গুহনন্দীর বিহারও। শুধু আছে অসামান্য টেরাকোটার রূপময় বৈভব, অজস্র অসংখ্য রূপ-ভঙ্গিমায় স্থির পশুপাখি, মানুষ প্রকৃতি। —জীবনের এক মহামিছিল যেন নীরবে থমকে দাঁড়িয়েছে মহাবিহারের দেওয়ালে দেওয়ালে। আর আছে চমৎকার একটি কিংবদন্তীর কাহিনি, বিখ্যাত লেখক সুবোধ ঘোষ যার উল্লেখ করেছেন তার 'কিংবদন্তীর দেশে' গ্রন্থে।

এই সোমপুর মহাবিহার থেকে অনতিদূরে ছিল মণ্ডলাধিপতি পুণ্যপ্রভর প্রাসাদ আর সৈন্যভবন। আর রাজপ্রাসাদের সম্মুখেই পথের অপর পাশে ছিল দুটি উদ্যান, দুটি দিঘি

আর দিঘির প্রান্তে দুটি রত্নগৃহ। না, কোনো মণিমুক্তা রত্ন নয়, রত্নময়ী কোনো নারীও নয়, যেন অপার্থিব দুটি রূপের প্রতিমা বাস করতেন ওই দুটি গৃহে, নাম সনকা ও মেনকা। দু'জনেই আশা করেন, বিশ্বাসও করেন বৃদ্ধ সম্রাট পূণ্যপ্রভর মৃত্যুর পর রাজকুমার পূণ্যরত্ন তাঁদের বিয়ে করবেন। যদিও তাঁরা রাজনর্তকী তবু দু'জনেই মনে করেন, রাজমহিষী হবার সৌভাগ্য তাঁদের হবেই। শুধু অপেক্ষা পূণ্যপ্রভবের জীবনাবসানের।

আশামুগ্ধ দু'জন জানেনও না, মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এক নিষ্ঠুর কৌতুকের রাজকীয় খেলায় মেতেছেন রাজকুমার। প্রণয়ের অভিনয়ে বশীভূত করে দুই নারীর লুব্ধতাকে নিয়ে মনে মনে এক নির্মম আনন্দকেই লালন করেছেন তিনি।

এই লুব্ধতার বিষধরকে কিভাবে খেলাতে হয় জানেন রাজকুমার। তাই সনকাকে দিয়ে বৃদ্ধ রাজা পূণ্যপ্রভকে হত্যা করার প্রতিশ্রুতি আদায় করে নেন। আর মেনকাকে দিয়ে সনকাকে পৃথিবী থেকে চিরতরে সরিয়ে দেবার চক্রান্তও অনুমোদন করিয়ে নেন। বুঝতে পারেন না সনকা, সন্দেহ জাগে না মেনকারও মনে। রাজকুমারকে সম্মতিদানের পরও কেন এত দেরি হচ্ছে ঈপ্সিত কাজটি সম্পন্ন করতে! অবশেষে আর একটি নতুন খেলার প্রস্তাব রাখতে গিয়ে স্বীকার করেন রাজকুমার তাঁর ওই মারণ প্রস্তাব ছিল নেহাতই সনকা ও মেনকার প্রণয়ের গভীরতা পরীক্ষা করারই একটি প্রক্রিয়া। কাকে তিনি সবচেয়ে ভালোবাসেন, কে তাঁকে আন্তরিকভাবে চায়, তার একটা নতুন পরীক্ষা নিতে চান তিনি। সনকা ও মেনকা দু'জনেই রচনা করুক দুটি বরমাল্য। যারটি সুন্দরতম হবে, তার মালাটিই গ্রহণ করবেন তিনি।

পরদিন পুষ্পমাল্য হাতে রাজপ্রাসাদের দিকে যেতে যেতে পথের ধারেই থমকে দাঁড়ান সনকা ও মেনকা। সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে লক্ষ করেন, সোমপুর মহাবিহারের মহাস্থবির রত্নাকর শান্তি চলেছেন যেন শান্তি আর কল্যাণের প্রতিমূর্তি। মহাস্থবির এলেন সনকা ও মেনকার কাছে। তাঁদের কল্যাণ কামনায় মন্ত্র উচ্চারণ করলেন গভীর মমতায়। হাতের মালা খসে পড়ে পথের ধূলায়। চোখের জলে ভিজে যায় রত্নাভরণ। না, আর মরীচিকার পেছনে মিথ্যে আশার প্রলোভনে অন্ধযাত্রা নয়, এবার স্থির লক্ষ্যে জীবনের পরম উদ্দিষ্টর কাছেই আশ্রয় নেওয়াই হবে চূড়ান্ত প্রাপ্তি।

সোমপুর মহাবিহারের দিকে যাত্রা করেন সনকা ও মেনকা। প্রাসাদের বাতায়নের সম্মুখে প্রতীক্ষায় ছিলেন রাজকুমার পূণ্যরত্ন। প্রাসাদ দ্বারে অপেক্ষা করছিলেন তাঁরই নির্দেশে দুই খঞ্জ ভিখারী। সনকা মেনকার পুষ্পমাল্য তাঁরাই গ্রহণ করবেন আর নিদারুণ অপমানের আঘাতে কিভাবে ত্রস্তা হরিণীর মতো পালিয়ে যায় দুই প্রণয়মুগ্ধা নারী, তা দেখার এক নিষ্ঠুর আনন্দে তিনি তৃপ্তি লাভ করবেন এই ছিল তাঁর রাজকীয় বিলাসের সাধ।

কিন্তু কোথায় সনকা-মেনকা! দীর্ঘ প্রতীক্ষা শেষে সংশয়ী পূণ্যরত্ন এগিয়ে যান উদ্যান বাটিকার দিকে। দেখেন পথের ধূলায় পড়ে আছে দুটি ছিন্ন মালা। তবে কি তাঁর কৌতুকের নির্মমতা দেশান্তরী করেছে সনকা-মেনকাকে! সংসার বিরাগী করে তুলেছে! সংশয় নিরসনের জন্য সোমপুর মহাবিহারে প্রবেশ করেন পূণ্যরত্ন। সন্ধ্যাদীপ জ্বলে উঠেছে সংঘারামে। সেই আলোয় দেখা যাচ্ছে দুই রাজনর্তকী নয়, দুই ভিক্ষুনী আরও দুটি পবিত্র শিখার মতো আলোকিত হয়ে মন্ত্রোচ্চারণ করছে।

সমস্ত দর্প সেইদিন সেই মালার মতোই ভূলুণ্ঠিত হল যেন। ফিরে চলে গেলেন পূণ্যরত্ন। ক্ষণস্থায়ী কৌতুকের লীলা নয়, পরম বিশ্বাসের এক চিরস্থায়ী জীবনের সার্থকতা সোমপুর মহাবিহারের বৈভবকে যেন আরও মহিমামণ্ডিত করে তুলল।

কত যুগ পার হয়ে গেছে তারপর। আমি সেই মহাবিহারের ভগ্নাবশেষের সামনে দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনতে পাই সমবেত মন্ত্রোচ্চারণের গম্ভীর-ধ্বনি, সনকা-মেনকার আত্মনিবেদনের আকুতি, কালের নির্মম কৌতুকে যা নীরব থেকে নীরবতর হয়ে আসছে।

জনশ্রুতি বলে, এই পাহাড়পুরের কাছেই আক্কেলপুর নামে রেল স্টেশনের কিছু দূরে আছে ক্ষেতলাল নামে একটি গ্রাম। সে গ্রামেই ছিল পূণ্যরত্নের প্রাসাদ। সে প্রাসাদ আর নেই। আছে ধ্বংসাবশেষের অদূরে দুটি দিঘি, নাম সনকা আর মেনকা।

বাণগড়ের পাল সম্রাটদের এক অতুল কীর্তি। এই পাহাড়পুর মহাবিহারের তুলনায় খুবই দীন সেই ক্ষেতলাল গ্রামের রাজপ্রসাদের লুপ্ত অবশেষ। কিন্তু আজও এক আশ্চর্য লোক-কাহিনির ঐশ্বর্যে সমৃধ্বতর মনে হয় ওই সনকা-মেনকাকে।

তারানাথের কাহিনি বলে—পালবংশেরই এক রাজা ছিলেন বাণপাল। তাঁর সঙ্গে যুধ্ব হয়েছিল শূরবংশীয় রাজা প্রদ্যুম্ন শূরের, যার পুত্রের নাম অনিরুধ্ব শূর। রাজা প্রদ্যুম্নের এক ভ্রাতা উত্তরবঙ্গ জয় করে বরেন্দ্রশূর উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। এই কাহিনির সঙ্গে পৌরাণিক অসুররাজ বাণের কাহিনির কি কোনো যোগসূত্র আছে? দেবহূতি নামের কোনো রাজার থেকেই কী এই বাণগড়ের নাম দেবকোট বা দেওকোট? হেমচন্দ্রের অভিধান চিন্তামণি ও পুরুষোত্তমদেবের ত্রিকাণ্ড শেষে কোটিবর্ষের যে উমাবন নাম দেখা যায়, সেকি সেই বাণরাজার কন্যা ঊষার স্মৃতিবাহক ঊষাবন নামেরই ভিন্ন উচ্চারণ? ওই বংশীহারি নাম কী বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণের কোনো স্মারকচিহ্ন আর করণদিঘির জল কী মহাভারতের কর্ণের স্মৃতিপূত? কালিয়াগঞ্জের কাছে ঊষার নামে আছে আর একটি গ্রাম।

মৌর্য-সুঙ্গ-গুপ্ত-পালযুগের পর বাংলার ভাগ্যাকাশে যাদের আবির্ভাব, সেই সেন রাজবংশের কোনো চিহ্ন বোধহয় নেই বাণগড়ে। তার কারণ সম্ভবত এই, দেবপালের সময় থেকেই যখন পাল সাম্রাজ্যের অন্তর্গত রাষ্ট্রগুলো আত্ম-কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছিল। ১ম মহীপাল তার কিছুটা অংশ জোড়া দিতে পেরেছিলেন বটে, কিন্তু ২য় মহীপালের সময় থেকেই শুরু হয় প্রজা-বিদ্রোহ। যদিও রামপাল পিতৃরাজ্য বরেন্দ্রী আবার উধ্বার করেছিলেন তবুও তখন থেকেই অন্তর্বিরোধ। সামন্ত নায়কদের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতালোভী ষড়যন্ত্র আর তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আমলাতন্ত্রের জটিল বেড়াজাল। সৈন্যবাহিনীতে ভিন্ন দেশি মানুষের অন্তর্ভুক্তি পাল সাম্রাজোর কিছুটা ক্ষতির কারণ হয়ে ওঠে। সম্ভবত 'দাক্ষিণাত্য ক্ষৌণীন্দ্র', 'ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়', 'কর্ণাট-ক্ষত্রিয়' সেনবংশীয় রাজকর্মচারীরা এ সময় কিছুটা ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেন এবং ২য় মহীপালের সময়েই সামন্তসেনের পুত্র হেমন্তসেন রাজ্যের বিপর্যয়ের সুযোগ নিয়ে রাঢ়দেশে আপন প্রভুত্ব স্থাপন করেন। আর এই হেমন্তসেনের পুত্র পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ বিজয়সেন অবশেষে রাঢ় ও উত্তরবঙ্গ জয় করে বাংলার সার্বভৌম আধিপত্য লাভ করেন। পালবংশের শেষ সম্রাট মদনপালের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার স্বাধীনতা দীর্ঘকালের জন্য লুপ্ত হয়ে গেল। বিজয়সেন 'বঙ্গে' অর্থাৎ পূর্ববঙ্গে বিক্রমপুরের জয়স্কন্ধাবার স্থাপন করলেন। পরে অবশ্য লক্ষ্মণসেনের আমলে গৌড়বিজয় সুসম্পন্ন হয় এবং রাজধানী

স্থানান্তরিত হয় লক্ষ্মণাবতী-গৌড়ে। কিন্তু সে জায়গা বরেন্দ্রভূমির এই বাণগড়ের নয়। ফলে বাণগড়ের অতীত বৈভব ক্রমে বিস্মৃতির অরণ্যের অন্ধকারে আত্মগোপন করে। সম্প্রতি খবরে দেখেছি, বরেন্দ্রভূমির বিস্তৃত অঞ্চলে নাকি কয়লাখনির অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। এবার হয়তো আরও অনেক অজ্ঞাত তথ্যের সন্ধান মিলবে। ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধ নয়, তারও প্রায় সাতশো বছর আগে বাংলার শেষ স্বাধীন সম্রাট মদনপালের সময়েই লুপ্ত হয়ে যায় বাংলার স্বাধীনতা। কেননা সেন-নৃপতির মধ্যে কেউই বাঙালি ছিলেন না। একমাত্র বল্লালসেন ছাড়া আর কোনো নৃপতির নামই বাঙালির স্মৃতিতে তেমন করে বেঁচে নেই। অথচ আজও মহীপালের গীত, ধর্মপালের যশোগাথা, গোপালের রাজ্যলাভের কাহিনি, যোগীপাল-ভোগীপালের গান বাংলার বুকে বাঙালির অতীত কীর্তির গরিমা নিয়ে সরব হয়ে আছে। বরেন্দ্রভূমির পল্লীকবির কাব্য, আলকাপের গানে আজও মুখর হয়ে ওঠে পাল সম্রাটদের কত কাহিনি। সেই শিক্ষকমশাই বললেন—ক'দিন পর এখানে যাত্রা হবে, দেখে যান। বাণগড়কে নিয়ে লেখা পালাগান। শুনেছি, নাট্যকার মন্মথ রায় বাণগড়কে নিয়ে একটি নাটকও লিখেছিলেন।

সেনরাজাদের নিয়ে কোনো লোকগীতি আমি আজও শুনিনি। ইতিহাসের বিচিত্র আবর্তনে সেনরাজাদের পর এসেছেন বখতিয়ার খিলজীর দুর্বারবাহিনী। আবার দেবকোট অতীত ঐতিহ্যের ধারাকে বহমান করার উদ্যমে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। বাণগড়ে স্থাপিত হয়েছে মুসলমান যুগের সৈনানিবাস। কিন্তু হায়! যে পালরাজাদের সৌরভ তখনো বরেন্দ্রভূমির আকাশে-বাতাসে ব্যাপ্ত হয়েছিল তার তীব্রতা সহ্য করতে পারেননি বখতিয়ার খিলজী।

কাহিনি বলে—দেবকোটের রাস্তায় যখন তিনি ভ্রমণে বেরোতেন তখন পুরবাসীরা তাঁকে উচ্চৈঃস্বরে ধিক্কার জানাত। তাঁদেরই অভিশাপে নাকি কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হয়ে মহাপরাক্রমী বখতিয়ার খিলজী মৃত্যুবরণ করেন।

ওই তো বাণগড়ের অদূরে পূনর্ভবার ওপারে নারায়ণপুর মৌজায় এক নিভৃত সমাধির আড়ালে চিরদিনের মতো ঘুমিয়ে আছেন বখতিয়ার খিলজী। হিন্দুযুগের বরেন্দ্রভূমি, মুসলমানযুগের এই বরেন্দ্র-এর মাটিতে।

কিন্তু সে অন্য ইতিহাস। বাংলার ইতিহাসের অন্য পর্ব।

আমি এখন সেই পর্বের দিকে পা বাড়াই। কিন্তু তার আগে একবার যেতে হবে মুর্শিদাবাদের মহীপাল-এ। সেখানকার মাটিতে ছড়ানো অসংখ্য প্রত্নসম্পদ এক উজ্জ্বল দিনের সকরুণ স্মৃতির মতো নীরবে কালের প্রহর গুণছে। এ কোন্ মহীপাল! ১ম না ২য়! কার রাজধানী ছিল ওই মহীপাল! ইতিহাসের কোনো স্পষ্ট নির্দেশ নেই। ওই যে ধান ভানতে মহীপালের গীত বলে প্রবাদ ছড়িয়ে যায় লোকের মুখে মুখে তিনি বা অন্য কোনো মহীপাল। শুধু মানুষের মনে আর বিশাল ভূখণ্ডের এক কোণে গীতে আর জনস্থানের অস্তিত্বে জেগে আছে একটি নাম মহীপাল। পাল সম্রাটদের কীর্তির শেষ প্রতিভূ!

এবার সেখানে।

বিলুপ্ত রাজধানী
৬

মহীপাল

হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন তা সবে অবোধ আমি অবহেলা করি।
—শ্রীমধুসূদন দত্ত

ব্যাণ্ডেল-আজিমগঞ্জ-বারহারোরা রেলপথে একটি ছোটো স্টেশন মহীপাল। না, কোনো রাজকীয় সমারোহের আহ্বানে মুখরিত নয়, কোনো ঐশ্বর্যের চাকচিক্যে আকর্ষকও নয়। নিতান্তই অনাধুনিক, সাধারণ একটি স্টেশন। পর্যটকের উৎসাহকে স্থিমিত করে দেবার মতো অনাকর্ষক।

তবু শুধুমাত্র দূরবিস্তৃত অতীতের মায়াবী স্মৃতি মেদুরতার টানে পায়ে পায়ে এগোলে চোখে পড়ে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকা অসংখ্য ঢিপি, জল ছলোছল দিঘি, ইট-পাথরের ভগ্নস্তূপ, নির্বাক পাথর প্রতিমা। সন্দেহ জাগে এই প্রত্নরত্নাকীর্ণ মাত্র ৩০৪.৫ একর এবং ১৯৫১-এর আদমসুমারি অনুযায়ী ১৪৩ জনের এই স্বল্প পরিসরের জনপদটিই কি ছিল একদা বাংলার রাজধানী!

কোনো নিশ্চিত সাক্ষ্য কেউ দেয় না। কিন্তু পাল সম্রাট মহীপালের সঙ্গে জড়িত এই জনস্থানের নাম অবশ্যই সে সম্ভাবনা জাগায়। তাছাড়া প্রজামনে স্থায়ী আসনের অধিকারী ওই সম্রাটের নাম যেমন জড়িয়ে আছে রংপুরের মহীগঞ্জ, বগুড়ার মহীপুর, দিনাজপুরের মহীসন্তোষের সঙ্গে অপ্রত্যক্ষভাবে, এই ভূখণ্ড তা সরাসরি তাঁর নামেই চিহ্নিত! এছাড়া কাছেই আজিমগঞ্জের পশ্চিমে মহীনগর, যা নাকি জেলা বিবরণীতে মহীপাল নগরের সীমানা বলে চিহ্নিত, তাও তো কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়। পূর্বে ভাগীরথী থেকে পশ্চিমে সাগরদিঘি. উত্তরে বালাগাছি, দক্ষিণে মহীনগর পর্যন্ত প্রায় ত্রিশ মাইল পরিধির এই স্থানটি যে নিঃসন্দেহে এক হারিয়ে যাওয়া নগরীর ইঙ্গিত দেয় তা কল্পনা করতে কোনো অসুবিধেই হয় না পর্যটকের।

অতীতে এই নগর বিশাল ছিল এবং অন্যতম বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল তার নিদর্শন কয়েকটি গ্রাম-নামের ছায়ায় আজো লুকিয়ে আছে। গোপাল হাট, দস্তুর হাট, হুকার হাট সেই স্মৃতিময় নাম। ওই গোপাল হাট কি সেই গোপালদেবের নামে, যে গোপালদেবকে গৌড়েশ্বর শশাঙ্কর মৃত্যুর পর মাৎসন্যায় থেকে উদ্ধার পাবার জন্য প্রকৃতিপুঞ্জ জননায়ক হিসেবে নির্বাচিত করেছিলেন। তিনিই তো পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে পরিচিত। মহীপাল-গিয়াসাবাদ পথ যেখানে উত্তরমুখী হয়ে গৌরীপুরের দিকে গিয়েছে, যে পথের শুরুতে যে সুপ্রাচীন দিঘি গোপালদিঘি নামে চিহ্নিত তাও কি সেই পালবংশের আদিপুরুষ গোপালদেবেরই নামে! এই অঞ্চলটিই তো মহীপালের কেন্দ্রভূমি। জনশ্রুতি বলে এখানেই ছিল রাজধানী আর রাজপ্রাসাদ!

পর্যটকের মন থমকে দাঁড়ায়। চারদিকের এই নিঃসীম শূন্যতা রিক্ততার বেদনায় এলোমেলো উদাসী হাওয়া, প্রত্নাকীর্ণ ঐশ্বর্যের শ্মশানভূমি এক বেদনাদীর্ণ অনুভূতি জাগায়। ভাগীরথীর অপর পাড়ে ওই যে 'রামপাল' সে কি পাল সম্রাট রামপালের স্মৃতিমণ্ডিত! ঐতিহাসিকরা বলেন, পাল রাজত্বের ঘোর দুর্দিনে শুধু এইটুকু ভূখণ্ডই নাকি পালদের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। কে জানে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে হয়তো রামপাল সাময়িকভাবে এখানে এসেছিলেন রামাবতী নগরী ত্যাগ করে। ওই যে মহীনালা নামের জলস্রোত ধারা, তার তরঙ্গ ধ্বনিতে মহীপালের গীতই বেজে ওঠে!

এই মহীপালকে ঘিরে অনেক প্রাচীন পথের খণ্ডাংশ আজো ইতস্তত দৃশ্যমান। পুরনো বাদশাহী সড়কের কাছে বীরভূমে পাইকর গ্রামে পাওয়া গেছে কলচুরীরাজ কর্ণের একটি শিলালিপি। ইতিহাসবিদ্‌রা বলেন, এই লিপিটি কর্ণের যুদ্ধজয় অথবা তাঁর কন্যা যৌবনশ্রীর সঙ্গে পাল সম্রাট তৃতীয় বিগ্রহপালের পরিণয়ের স্মারক। অনুমান করা চলে, পাল সম্রাটদের সে সময়কার অন্যতম জয়স্কন্ধাবার ছিল এই অঞ্চলেই। এই অনুমানকে সমর্থন করে রাজেন্দ্র চোলের তিরুমালয় লিপি। ওই লিপি জানায়, মহীপাল হলেন উত্তর রাঢ়ের রাজা। বাংলা তখন বিভক্ত ছিল 'তণ্ডভুক্তি' বা 'দণ্ডভুক্তি', 'তক্কন লাঢ়ম' বা 'দক্ষিণ রাঢ়' ও 'বঙ্গালদেশ' বা 'বঙ্গ'তে। আর 'উত্তর লাঢ়ম'-এর অধীশ্বর হলেন মহীপাল। এই উত্তর লাঢ়মের সীমানা ছিল উত্তরে গঙ্গা, দক্ষিণে অজয় নদ, পূর্বে ভাগীরথী, পশ্চিমে বীরভূম সাঁওতাল পরগণার অরণ্য অঞ্চল অর্থাৎ বর্তমান কালের প্রেক্ষিতে পশ্চিম মুর্শিদাবাদ, বীরভূম এবং বর্ধমানের কিয়দংশ। মুর্শিদাবাদের ইতিহাস-প্রেমিক গবেষক বিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, যেহেতু এই সীমানার মধ্যে আর কোথাও এমন ঐতিহাসিক প্রত্নস্থান নেই, সেহেতু বিশ্বাস করা চলে এই মহীপালই ছিল মহীপালের রাজধানী।

কল্পনার অনুমান, কিছু ঐতিহাসিক নিদর্শন আর কিছু কিংবদন্তীর ভাষা একাকার হয়ে ভেসে বেড়ায় মহীপালের বাতাসে। মহীপাল রোড স্টেশন থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে যে বিশাল দিঘি--যা সাগরদিঘি নামে পরিচিত, তারই একটি ঘাটে প্রোথিত শিলালিপির গায়ে উৎকীর্ণ হয়ে আছে 'শাকে সপ্ত দশাব্দীকে, স্থিতে সাগরদিঘির পালবংশকৃতং খাতং ব্রহ্মহা মুক্তি হেতুনা।' এর অর্থ পাল রাজারা ব্রহ্মহত্যার পাপ-স্খলনের জন্য এই দিঘি খনন করেছিলেন। কিন্তু কোন্ সময়ে? মহীপালের কালে? কোনো কোনো মতে ৭৪০ বা ৭১০ শকাব্দে এই দিঘি খনিত হয়েছিল। সে সময় ছিল ধর্মপাল বা দেবপালের রাজত্বকাল। কিন্তু তাঁদের রাজধানী ছিল বরেন্দ্রভূমি বাণগড়ে। তবে কি এই জনপদ ছিল তাঁদের কোনো জয়স্কন্ধাবাব। সেনানীদের ব্যবহারের প্রয়োজনেই কি দশটি বাঁধানো ঘাটের এই রাজকীয় দিঘি খনিত হয়েছিল?

পর্যটকের কল্পনা কোনো সুনির্দিষ্ট উত্তরে প্রতিহত হয় না। মহীপালের বুকে অসহায়ের মতো আঁকড়ে পড়ে থাকা অজস্র প্রস্তরস্তম্ভ কারুকার্য মণ্ডিত পাথরের ভগ্নাংশ, চূর্ণ বিচূর্ণ অসংখ্য টুকরো টুকরো ইঁট পর্যটকের মনে অনেক সম্ভাবনার আভাস দেয়। মহীপাল রোড স্টেশনের অনতি দূরে উঁচু যে ডাঙাজমি, কে জানে তারই অভ্যন্তরে রিক্ততায় বেদনায় মুখ ঢেকে আছে কিনা কোনো হর্ম্য বা দেবালয়ের অস্তিত্ব। হয়তো পাল পরবর্তী সময়ে সুলতানী আমলে এই জনপদ অধিকার করে নতুন এক রূপ দিতে চেয়েছিলেন তৎকালীন শাসকেরা।

১২১৩ থেকে ১২২৭ অবধি গৌড়ে যাঁর রাজত্বকাল সেই গিয়াসুদ্দিন ইউয়জ এখানেই নির্মাণ করেছিলেন গিয়াসাবাদ নগর। শুধু কারুকাজ শোভিত স্তম্ভ-ই নয়, এই মহীপাল বা ওই গিয়াসাবাদে পাওয়া গেছে উল্লেখযোগ্য কিছু পাথরপ্রতিমাও। বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত পাল সম্রাটদের আরাধ্য বুদ্ধমূর্তির বেশ কয়েকটি নিদর্শনও মহীপালের মাটি তুলে দিয়েছে পর্যটকের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টির সামনে। গিয়াসাবাদে পাওয়া গেছে দ্বাদশভূজ লোকনাথ অবলোকিতেশ্বর মূর্তি। জিয়াগঞ্জে সংরক্ষিত আছে আরো একটি বুদ্ধমূর্তি। হুকার হাট গ্রামের ষষ্ঠীতলায় এক সময় ছিল পদ্মপানি বোধিসত্ত্ব মূর্তি। সন্দেহ নেই এক সময়ে মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ব্যাপ্ত করে রেখেছিল মহীপালকে।

গবেষক বিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অনুমান করেন, দশম শতাব্দীর শেষার্ধে ১ম মহীপাল তৎপূর্ববর্তী পাল রাজাদের জয়স্কন্ধাবারকে রাজধানীতে রূপান্তরিত করেছিলেন এই স্থানটিকে। সে সময় পাল রাজাদের যে অবক্ষয় শুরু হয়, মহীপাল সেই দুর্দশা থেকে রাজ্যলাভের তিন বছরের মধ্যেই উত্তর ও পূর্ববঙ্গ সমেত বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে তাঁর অধিকারভুক্ত করে হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনেন। পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধারের পর তিনি হয়তো রাজধানী সরিয়ে আনেন এই জনপদে। তাঁর নামেই নাম হয় মহীপাল। কিন্তু তাঁর রাজত্বকালের পরই আবার পালরাজত্বে দুর্দিন আসে। পরবর্তী সম্রাট রামপালের সময় কৈবর্তনায়ক ভীম অপ্রতিহত হয়ে উঠলেও শেষ অবধি জয়ী হন রামপাল। রাজধানী স্থানান্তরিত হয় রামাবতীতে। প্রায় এক শতাব্দীকাল রাজধানীর গৌরব বুকে ধরে মহীপাল অবশেষে নিজেরই বুকের গভীরে লুকিয়ে রাখে ঐশ্বর্য স্মৃতিচিহ্নগুলো।

না, এখনো কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণের স্মারকচিহ্ন ইতিহাসের হাতে তুলে দিতে পারেনি মহীপাল। প্রমাণ করতে পারেনি এই মহীপালই ছিল ১ম মহীপালের রাজধানী। উপযুক্ত খননকাজ হয়তো একদিন সেই প্রমাণ তুলে দেবে অনুসন্ধিৎসু মানুষের হাতে। অথবা আগেও যেমন হয়েছে, প্রকৃতিই একদিন অকস্মাৎ অবগুণ্ঠন সরিয়ে উন্মোচিত করবে প্রকৃত ইতিহাসের মুখ। এ দেশের হারানো ঐশ্বর্য, বৈভব আর ঐতিহ্যের অনুসন্ধানী পর্যটক তারই প্রতীক্ষা করেন মহীপালের মাটিতে পা রেখে। এবার যাওয়া যাক পাল রাজাদের আর এক রাজধানী রামাবতীর দিকে।
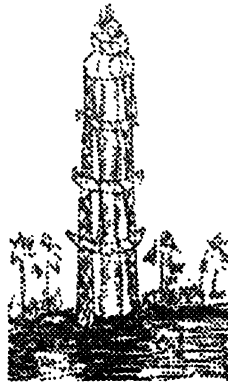
রামাবতী/আমাবতী/আমাতি

তবু ভরিল না চিত্ত।...
সবতীর্থ সার
তাই মা, তোমার পাশে এসেছি আবার।
—দেবেন্দ্রনাথ সেন

সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' কাব্যগ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদের আটত্রিশতম শ্লোকে আছে, কৃষিজাত বসতিবহুল পাল সম্রাটদের জনকভূ বরেন্দ্রভূমি দিব্বোক নামের এক অত্যুন্নত দশাবস্থিত ছলব্রতধারী শত্রু দ্বারা অধিকৃত হয়েছিল। তৃতীয় পরিচ্ছেদের সপ্তম শ্লোকে আছে জগদ্দল মহাবিহারের বর্ণনা, যে স্থান লোকেশ নামে বোধিস্বত্ব বিশেষকে ধারণ করত এবং সেখানে মহত্তর মঠাধ্যক্ষগণ ও তারাদেবীর মূর্তি থাকায় তার বিপুল মাহাত্ম্য উদ্রিক্ত ছিল।

আর ঐ পরিচ্ছেদেরই একত্রিশতম শ্লোকে আছে বিপুল রত্নসমূহ-ধারিনী দেবগণের পুরী অতিশুভা ও সর্বজন অভীষ্টা রামাবতী নামের এক রাজধানীর কারুকার্য মণ্ডিত রূপ বিবরণ।

রামাবতী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন পাল সম্রাট তৃতীয় বিগ্রহপালের পুত্র রামপাল।

সে কতদিন আগে? ইতিহাস জানায়, ১০৭৭ থেকে ১১২০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ঘটে এই ঘটনা। আজ থেকে প্রায় নশো বছর আগে। কিন্তু কোথায় সেই রামাবতী নগরী?

ইতিহাস নীরব হয়ে থাকে। শুধু ঐ রামচরিত-এর কাব্যময় ভাষা, মনহোলীতে পাওয়া মদনপালের তাম্রশাসন আর আইন-ই আকবরীতে সামান্য উল্লেখ ছাড়া আর কোথাও উল্লেখ নেই এই নগরীর। শুধু নামের অস্তিত্ব!

যেমন হারিয়ে গেছে গঙ্গো-বিজয়নগর-লক্ষ্মণাবতী—তেমনই বিস্মৃতি আর মৃত্তিকার স্তুপে ঢেকে গিয়েছে ঐ নগরীর শরীর।

আমি কোথায় পাবো তারে?

জন্মেছি ঐ বরেন্দ্রভূমিতেই, বালুরঘাটে। এক আশ্চর্য আত্মীয়তার স্পর্শ স্পষ্ট অনুভব করি উত্তরবাংলার বরেন্দ-র বিস্তৃত মাঠে, দামাল হাওয়ায়, নিবিড় অরণ্যের শ্যামল স্নিগ্ধতায়, আত্রাই-টাঙ্গন-পুনর্ভবার উজ্জ্বল তরঙ্গমালায়।

তাই এদেশে সর্বপ্রথম উত্তরাধিকারসূত্রে নয়, সম্মিলিত প্রজাপুঞ্জের সমর্থনে নির্বাচিত হয়ে জনমনে সুশাসনের আস্থা ফিরিয়ে এনেছিলেন যে রাষ্ট্রনায়ক গোপাল দেব, প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সু-বিখ্যাত পালবংশের—তাঁদের জনকভূ এই বরেন্দ্রভূমিতে পদসঞ্চার ঘটেছে আমার বারবার। খুঁজে পেয়েছি বাণগড়—যা ছিল পাল সম্রাটদের অন্যতম প্রধান জয়স্কন্ধাবার বা রাজধানী।

কিন্তু ঐ গোপাল দেবেরই প্রায় তিনশ বছর পর যেখানে সেই বংশেরই এক অত্যাচারী দুর্নীতিপরায়ণ নিষ্ঠুর শাসক মহীপালের আমলে ঘটেছিল প্রথম গণ-বিদ্রোহ কৈবর্ত্যনায়ক দিব্বোকের নেতৃত্বে—কিন্তু রামাবতী নগরীর লুপ্ত অবশেষ কোথায় গেলে সঠিকভাবে দেখা যাবে তা অনেকদিনই অনেকেরই অজ্ঞাত ছিল।

বিলুপ্ত রাজধানী পরিক্রমায় এসে আমি তাই কিছুটা হতাশ এবং বিভ্রান্ত বোধ করি প্রথমে। কিন্তু পরে বালুরঘাট মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীঅচিন্ত্য গোস্বামী মহাশয়ের প্রত্যক্ষ দর্শনের অভিজ্ঞতা এবং উত্তরবাংলার প্রসিদ্ধ প্রবীণ ব্যবহারজীবী গবেষক শ্রীকমলেন্দু চক্রবর্তীর গ্রন্থ পাঠে সঠিক পথের সন্ধান পাই। রামাবতী—আমাবতী—আম'তি স্থানীয় উচ্চারণে 'র'-এর জায়গায় 'অ' বলার প্রবণতায় সিদ্ধান্ত করা চলে, রামাবতীই স্থানীয় ভাষায় হয়েছে আমাতি। মালদা জেলার গাজোল থেকে যে পথ বাঁদিকে বেঁকে চলে গেছে রায়গঞ্জের দিকে সেই পথেরই মাইল ন'য়েক গেলে বৈদারণ গ্রাম, সেখান থেকে সামান্য দূরে যে গ্রামের নাম আমাতি —অনুসন্ধিৎসু জনের প্রায় নিশ্চিত বিশ্বাস, এই আমাতিই সেই লুপ্তপ্রায় রামাবতী। বিখ্যাত পুরাতাত্ত্বিক অক্ষয়কুমার মৈত্র উত্তর দিনাজপুরের (তখন অখণ্ড দিনাজপুর) ইটাহার থানায় জগদ্দল গ্রামের প্রত্নচিহ্ন এবং অনতি দূরবর্তী আমাতি গ্রাম পর্যবেক্ষণ করে স্থানটিকে রামাবতী বলে চিহ্নিত করেছিলেন। প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্ নগেন্দ্রনাথ বসুও অনুমান করেছিলেন রামাবতী দিনাজপুর জেলাতেই অবস্থিত।

কিন্তু শুধু অনুমানের কল্পিত সত্য নয়—আমাতিতে পাওয়া অসংখ্য পুরাবস্তু সুস্পষ্ট চিহ্নে এখন বহন করছে অতীতের রামাবতীর ঐশ্বর্য-গৌরব।

কলকাতা থেকে মালদা যাওয়া এখন নানা পথেই সম্ভব। এসপ্লানেড থেকে বাস আছে, শিয়ালদা থেকে আছে যথাক্রমে গৌড় এবং কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস। মালদা থেকে গাজোল যাবার সময় বাস, ট্যাক্সি হরদম মেলে; আর গাজোল থেকে আমাতি বাসে যাওয়া যায় অনায়াসে। বাসে গেলে নামতে হয় জয়হাট পঞ্চায়েত সমিতির অফিসের কাছে। পুরাণ বলে মহাভারতের কৌরবরা এই জয়হাট থেকে অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করতেন। এসব নিশ্চয় স্বভূমি প্রিয় মানুষেরই গৌরবান্বিত হবার বাসনারই প্রতিষ্ঠিত প্রমাণ। এ যুগের জয়হাট সে কথাই যেন জানায় লোকশ্রুতির আবরণে। ওই পঞ্চায়েত অফিসের পাশ দিয়ে যে পথ চলে গিয়েছে, সে পথে ৬ কিলোমিটার গেলে আমাতি যাবার ট্রেকার পাওয়া যায়। কোনো অসুবিধে নেই যাতায়াতের। আমাতি পৌঁছে কসবা প্রাথমিক স্কুলের কাছে দাঁড়ালে জনরব জানাবে একদিন এইখানেই ছিল রামপালের প্রাসাদ। আজ তার কোনো চিহ্ন নেই। কিন্তু অসংখ্য টেরাকোটা, কারুকার্যময় পাথরের খিলান সেই অতীত সমৃদ্ধির সাক্ষ্য দেবে এইখানে একদিন শিল্পারূপময় জনপদের অস্তিত্ব ছিল। বৌদ্ধধর্মের উপাসক পাল সম্রাটদের ভক্তহৃদয় যে অসংখ্য বুদ্ধমূর্তি নির্মাণে শিল্পীদের প্রাণিত করেছিলেন, তারই অত্যাশ্চর্য নিদর্শনও পর্যটকের চোখ এড়াবে না। গোল পাথরের ওপর অষ্টবুদ্ধ দ্বাদশ বুদ্ধের মূর্তি বিস্ময় জাগাবে।

আমার কল্পনা ইতিহাসের রথ এসে থেমে যায় রামাবতীর শ্মশানভূমিতে। ইতস্তত ছড়ানো কয়েকটি অস্থি আর টুকরো টুকরো দেহাংশের মতো ভাঙা ইঁট, পাথরের মূর্তি, খিলানের ভগ্নাবশেষ পরিবৃত হয়ে আমি রামাবতীর আত্মার পূর্ণজাগরণের মন্ত্র পাঠ করি ইতিহাসের ভাষায়।

ডঃ নীহাররঞ্জন রায় 'বাঙ্গালীর ইতিহাস'-এ লিখেছেন—

'পাল আমলের জয়স্কন্ধাবারগুলির সামরিক গুরুত্ব লক্ষণীয় এবং অনুমান হয়, এই সামরিক গুরুত্ব বিবেচনা করিয়াই জয়স্কন্ধাবারগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পাটলিপুত্র, মুদগাগিরি, বিলাসপুর, হরধাম, রামাবতী বটপর্বতিকা —প্রত্যেকটিই গঙ্গার তীরে অবস্থিত। ....গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী নগরের অদূরে গঙ্গা মহানন্দার সঙ্গমস্থলের সন্নিকটে ছিল রামাবতীর অবস্থিতি।'

'রামচরিত'-এ সন্ধ্যাকর নন্দী বলছেন—

'রামাবতী অমরাবতী তুল্য, বুধজন পরিব্যাপ্ত সজ্জনদিগের বাসভূমি। স্বর্ণরত্নাদি শোভা, সূক্ষ্ম চন্দ্র কস্তুরী অগুরু চন্দনাদি ও শিল্পকর্ম অতুলন।'

কিন্তু সেই অতুলন ঐশ্বর্য আর রূপময়তা, বৈভব আর বিত্তের সমারোহ কেন মনোহব করে তুলেছিল রামাবতীকে? আর শুধু কি রূপৈশর্য বিলাসব্যসন আর স্থানীয় সৌন্দর্যের চমৎকারিত্বের জন্যই রামাবতী স্মরণীয়?

ইতিহাস বলে—না, শুধু শারীরিক সৌন্দর্যে নয়, মানুষের অগ্রগতির কাহিনিতে এক পট পরিবর্তনের যুগান্তকারী ঘটনার সাক্ষী হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রামাবতী মানবিক বলিষ্ঠতার এক নিদর্শন রেখেছে মহাকালের পৃষ্ঠায়।

সে ঘটনা বাংলার প্রথম গণ বিদ্রোহের স্বতঃস্ফূর্ত বিস্ফোরণের প্রচণ্ডতায় শক্তিধর—অত্যাচারী শোষকের বিরুধে প্রজা সাধারণের রুখে দাঁড়াবার এক দৃপ্ত প্রয়াসে অনুপ্রেরণাময়।

পাল সম্রাটদের জনকভু বরেন্দ্রভূমি তখন কৈবর্তশক্তির করায়ত্ত্ব। কিছুদিন আগেই ঘটে গেছে কৈবর্ত্য-বিদ্রোহ। বরেন্দ্রীর সিংহাসনে তখন দ্বিতীয় মহীপাল। ঘরে-বাইরে অশান্তির ধূমায়িত অন্ধকার, কু-শাসনের বিকৃতিতে রাজ্যময় অরাজকতার আস্ফালন। নিজের দুই ভাই শূরপাল এবং রামপাল-ই এসবের মূল কারণ—এই অনুমানে দুজনকেই কারারুধ করলেন মহীপাল। তারপর বিদ্রোহী সামন্তদের দমন করার জন্য অস্ত্রধারণ করলেন।

জানতেন না মহীপাল, জানতে চেষ্টাও করেন নি তিনি—সৈন্যদলে ইতিমধ্যেই বিশৃঙ্খলা কিভাবে শক্তিক্ষয় করেছে তাঁর। কৈবর্ত্য-নায়ক দিব্বোকের চূড়ান্ত আঘাতে তাঁর ভুল বিশ্বাসের স্বর্গ ভেঙে গেল। সিংহাসনে অতঃপর এলেন রামপাল। শূরপাল অবশ্য সম্রাটের স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন, তবে তা অল্প কিছুদিনের জন্য। সম্রাট রামপাল এরপর নিজ রাজ্য বরেন্দ্রী পুনরুধারে সচেষ্ট হলেন। দিব্বোকের গৌবব-সূর্য তখনো অস্তমিত নয়। বিফলকাম হলেন রামপাল, দিব্বোকের পর এলেন তাঁর ভাই রুদোক। রামপাল এবারও ব্যর্থকাম হলেন। রুদোকের পর এলেন ভীম।

বুঝতে পেরেছিলেন রামপাল, জনপ্রিয় ঐ সামন্ত নায়কের প্রতিপক্ষ হিসেবে তাঁর একক শক্তি একান্তই দুর্বল। তাই প্রচুর অর্থ এবং অপরিমিত ভূমি বন্টন করে তিনি ক্রয় করলেন প্রতিবেশি সামন্ত নায়কদের সহায়তা।

বাংলা-বিহার সমেত বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত প্রায় পনেরোজন সামন্ত নায়ক তাঁকে সাহায্যের জন্য অস্ত্রধারণ করলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন—১. তাঁর মাতুল রাষ্ট্রকূট বংশীয় সামন্ত মথন, ২. মগাধিপতি, ৩. কোটাটরীর রাজা (বর্তমান বিষ্ণুপুরের কাছে কোটেশ্বর অঞ্চল), ৪. দণ্ডভূক্তির রাজা, ৫. বাল-বলভী অর্থাৎ বর্তমান মেদিনীপুরের পশ্চিম দক্ষিণাংশের

রাজা, ৬. মান্দারণ সরকার, ৭. বর্তমান সাঁওতাল পরগনার দুমকার নিকটবর্তী কুজবটীর রাজা, ৮. বর্তমান পুরুলিয়ার তৈলকম্প বা তেলকুপির নৃপতি, ৯. বর্তমান বীরভূমের জৈন উঝিয়াল, সেই সময়ের উচ্চালাধিপতির রাজা, ১০. কজঙ্গল—মন্ডলাধিপতি অর্থাৎ বর্তমান রাজমহলের অধিপতি, ১১. বর্তমান হুগলীর সঙ্কোটধিপতি, ১২. ঢেকুরীয় অর্থাৎ বর্তমান কাটোয়ার অন্তর্গত ঢেকুরীর রাজা, ১৩. নিদ্রাবলীর রাজা, ১৪. পদুবন্বার রাজা এবং ১৫. কৌশাম্বীর রাজা দ্বোপরবর্ধণ।

এই কৌশাম্বী বর্তমান বাংলাদেশের বগুড়া জেলার কুশুম্বি পরগণা বা রাজসাহীর কুশুম্বা বলে অনেক ঐতিহাসিকের অনুমান। আমার পক্ষপাতিত্ব সেদিকেই। কুশুম্বি আমার পিতৃভূমি।

আমি রামাবতী ইতিহাসের গভীরে আমার নিজস্ব ভূমণ্ডলের বিস্তার প্রত্যক্ষ করি অনুভবে। বুঝতে পেরেছিলেন ক্ষৌণানায়ক ভীম, এই সম্মিলিত শক্তির প্রবলতার সঙ্গে যুধে জয়লাভ নিশ্চয় অসম্ভব। গঙ্গার উত্তর তীরে তুমুল যুধের শেষে বন্দী হলেন ভীম। কিন্তু ভীমের অন্যতম সহায়ক হরি আবার আক্রমণ করেন রামপালের পুত্রকে। কিন্তু রামপাল তখন নতুন বলে বলীয়ান। অজস্র অর্থে বশীভূত করল হরিকে। ভীম নিহত হলেন সপরিবারে।

রামপাল বরেন্দ্রী উধার করে রাজধানী স্থাপন করলেন রামাবতীতে ১০৭৭-৭৮ সালে।

এই সেই রামাবতী যেখানে দীর্ঘ প্রায় তেতাল্লিশ বছর রাজত্ব করেছিলেন রামপাল।—তাঁর পূর্বসূরীর মতো অলস শয়ন-স্বপনে আবেশ বশে কাল কাটাননি তিনি। অস্ত্রের ঝঙ্কারে নিজ শৌর্যের বিক্রমে পরে রাজ্যসীমা সম্প্রসারিত করেছিলেন। নিজ রাজ্য পুনরুধার ছাড়াও উড়িষ্যা ও কামরূপে আধিপত্য বিস্তার, একাধিক বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করা এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত রাজ্যে সুশাসনের সু-বাতাস বহমান রাখার কৃতিত্ব অবশ্যই তাঁর।

কিন্তু শেষ বয়সে কে জানে কেন তিনি গঙ্গায় আত্মবিসর্জন দেন! তাঁর চার ছেলের মধ্যে বিত্তপাল ও রাজ্যপাল সিংহাসনে বসেননি। অপর দুজনের মধ্যে প্রথমে কুমারপাল (১১২০-২৫), পরে মদনপাল (১৪৪০-৫৫) সম্রাট হন। রামচরিত-এর বর্ণনা এই মদনপালের রাজত্বকাল পর্যন্ত সীমায়িত—যদিও ঐতিহাসিকদের অনুমান উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সিংহাসন অরোহণের এই ক্রমের মধ্যে কিছু পারিবারিক অশান্তির আভাস রয়েছে।

সে যাই হোক, মদনপালই হলেন বাংলার শেষ স্বাধীন সম্রাট—এরপর কর্ণাটীর সেনবংশ গৌড় অধিকার করে।

হারিয়ে যায় গোপাল-ধর্মপালের গড়া বিশাল সাম্রাজ্যের গৌরবের নানারঙের দিনগুলি।

হারিয়ে যায় রামাবতীরও ঐশ্বর্যের গৌরব। স্থানীয় মানুষেরা বলেন, আগে এই জায়গা ছিল কলকাতা। পরে যখন ব্যাঙে মানুষ খেতে শুরু করল, আর এই রাজ্যও ধ্বংস হয়ে গেল। এই লোক কাহিনি শুনে অনুমান করতে অসুবিধে হয় না, একসময় বর্তমান কলকাতার মতো সমৃধি ছিল রামাবতীর এবং এক প্রচণ্ড নিষ্ঠুর দুর্ভিক্ষে যখন মানুষের মৃতদেহ সৎকারের অভাবে মনুষ্যেতর প্রাণীর খাদ্য হয়ে গেল তখন লুপ্ত হয়ে গেল এর জীবনের সব স্পন্দন।

এই কাহিনির সমর্থনও মেলে হান্টারের স্ট্যাটিসটিক্যাল রিপোর্ট অন রঙ্গপুর-দিনাজপুর-মালদহ'তে। এক দারুণ দুর্ভিক্ষের নির্মম আঘাতে থেমে যায় এই নগরীর হৃৎস্পন্দন।

শুধু আজকের আমাতি গ্রাম তার বুকে তুলে ধরে রেখেছে অতীতের কিছু স্মৃতির সাক্ষী। বড়ো বড়ো থাম, খিলান, ভাঙা মন্দিরের লুপ্তপ্রায় অংশ আর এখান থেকে পাওয়া অবলোকিতেশ্বর, মহাসরস্বতী, গণেশ, কিছু সদাশিবের মূর্তি, অজস্র টুকরো ইটের খণ্ডাংশ, পার্শ্ববর্তী জগদ্দল মহাবিহারের ধ্বংসাবশেষ, মকর মুখের অংশ—সুনিশ্চিতভাবে রামাবতীর অতীত গৌরবকে বর্তমানকালের মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়।

আর রত্নাহার, ইচ্ছাহার, মানকাহার কবিতার মতো নামের দিঘিগুলির জলের কল্লোলে মৃদু হিল্লোলে ধ্বনিত হতে থাকে হারিয়ে যাওয়া দিনের কাহিনি।

রামাবতীর অবস্থান দেখে বুঝতে অসুবিধে হয় না, কেন রামপাল এখানে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। এই দিঘিগুলি সবই আগে মহানন্দার সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং এই ভূখণ্ড গঙ্গা ও করতোয়ার মধ্যবর্তী স্থানে হওয়াতে শাসনকার্যের দিক থেকেও সুবিধাজনক ছিল।

তখন ভারতের জন-জীবনের শ্রবণে ধ্বনিত হয়েছে বখতিয়ার খিলজীর দর্পিত অশ্বক্ষুর-ধ্বনি। একটার পর একটা মহাবিহার, সৈন্যনিবাস ক্রমে ধ্বংস করতে করতে এগিয়ে আসছেন বখতিয়ার। জগদ্দলও সেই ক্রোধানলে ভস্মীভূত হলো। কথিত আছে, এই বিহারে দিনে সূর্য ও রাতে উজ্জ্বলতম আলো জ্বলতো জ্ঞানের প্রতীক হিসেবে। আজ অগণিত ও অসংখ্য সোপানের চিহ্ন দেখে সেকথা অনুমান করতে পর্যটকের কল্পনা ব্যথিত হয়ে ওঠে।

হারিয়ে গেছে রামাবতী। আমি ফিরে চলি বিষণ্ণ পায়ে, জন-জীবনের কলধ্বনিতে মুখর আমাতি এখন নতুন দিনের কথা বলে।

কে জানে, আগামী কোনো যুগে হয়তো কোনো সন্ধ্যাকর নন্দী নতুন করে লিখবেন সেই মহাজীবনের গান!

সম্প্রতি উত্তরবঙ্গের ইতিহাস অনুসন্ধানী ধনঞ্জয় রায় এবং তাঁর সহযোগীদের উদ্যোগে আমাতি সম্পর্কে আরও বিস্তৃত তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। আয়োজিত হচ্ছে রামাবতী উৎসব। মানুষও উৎসাহিত হয়ে এগিয়ে এসেছেন রামাবতীর ঐতিহ্য সংরক্ষণে।

নুদীয়া/নবদ্বীপ

উঠিল সেখানে মুরজ মন্ত্রে
নিমাই কণ্ঠে মধুৎ ভান—
—দ্বিজেন্দ্রলাল

পাল সম্রাটদের মতো সেন সম্রাটরাও বাংলার বিভিন্ন স্থানে রাজধানী, জয়স্কন্ধাবার বা শাসনকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কখনো তা ছিল গৌড়-লক্ষ্মণাবতীতে, কখনো শ্রীবিক্রমপুরে, কখনো নুদীয়ায় আবার কখনোবা সোনারগাঁ-এ। গৌড়-লক্ষ্মণাবতী যখন সম্রাট লক্ষ্মণ সেনের প্রধান রাজধানী ছিল তখন ধার্মিক পরমভক্ত এই সম্রাট ধর্মালোচনা এবং নির্জনবাসের জন্য গঙ্গাতীরে নুদীয়াতে আর একটি শাসনকেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু সেই নুদিয়া কোথায়? সে কি আজকের নবদ্বীপ? সেই আজকের নবদ্বীপ এবং তার নিকটবর্তী অঞ্চলগুলোও ইতিহাস গর্ভ, জনশ্রুতি মুখর, কিংবদন্তি আশ্রিত।

সম্ভবত বল্লাল সেনের আমল থেকেই এখানে রাজপ্রাসাদ ইত্যাদি ছিল। যার স্মৃতি স্থানীয় মানুষের মনে 'বল্লাল ঢিবি'-র উচ্চতা নিয়ে জেগে আছে। সৌভাগ্যের বিষয়, সম্প্রতি নদিয়া জেলায়ও বল্লাল ঢিবি খনন করা হয়েছে। একটি রিপোর্টে জানা যায়—

'...বল্লাল ঢিবির নীচে এক প্রাচীন পূজামণ্ডপ আবিষ্কৃত হয়েছে। ঢিবিটি পিরামিড আকৃতির। এর চারপাশে ছিল ইটের বিশাল দেওয়াল।' একটি সরকারি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, 'আবিষ্কৃত কাঠামোটির পরিকল্পনা ক্রুশাকৃতি এবং নির্দিষ্ট ব্যবধানের অলিন্দে ফাঁকা জায়গা আছে। পূর্বদিকে দেওয়াল ২৩ মিটার ও দক্ষিণ দিকের দেওয়াল ৫০ মিটার লম্বা।' দু-মাস ধরে খননের সময় কয়েকটি সুন্দর মাথার ছাঁচ পাওয়া গিয়েছে বলে জানা যায়। বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা হয়েছে, কিছু সংখ্যক ছাঁচের মাথা দেবতাদের এবং কিছু সংখ্যক ছাঁচ দৈত্যদের। মনে হয়, এটা ছিল পশ্চিমবঙ্গের একটি ছাঁচ তৈরির কেন্দ্র। খননকার্য পরিচালনা করেন ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সমীক্ষার (পূর্বাঞ্চল) সুপারিনটেনডেন্ট্ শ্রী এন. সি. ঘোষের নেতৃত্বে একদল পুরাতত্ত্ববিদ্। এঁরা মনে করেন, আগামী সময়ে আরো খননকালে বাংলা দেশের ৯ম ও ১২শ শতাব্দীর মধ্যবর্তীকালের অনেক অজানা অধ্যায় জানা যাবে।

কোনো সন্দেহ নেই, বাংলার ইতিহাসের ঐ সময় সেন রাজবংশ রাজত্ব করতেন এবং বল্লাল সেন ও লক্ষণ সেনের আমলের অনেক অজানা তথ্যও আবিষ্কৃত হবে সযত্ন অনুসন্ধানে। বৃধরাজা রায় লছমনিয়া, গৌড় বঙ্গাধিপতি লক্ষ্মণ সেন রাজধানী সরিয়ে এনেছিলেন লক্ষ্মণাবতী থেকে নদিয়ায়। নিজের নামেই নামকরণ করেছিলেন সেনবংশের

কুলতিলক বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষণ সেন, লক্ষণাবতী। বড়ো প্রিয় রাজধানী ছিল তাঁর। পবিত্র গঙ্গা নদী বয়ে চলেছে মহানন্দার খাত বেয়ে। ধর্মপ্রাণ সম্রাট শাস্ত্র আলোচনায়, মহাপণ্ডিত হলায়ুধ মিশ্রের তীক্ষ্ণধি বুদ্ধির নিরাপদ তত্ত্বাবধানে জয়দেব-শরণ-ধোয়ী প্রমুখ সুহৃদয় কবিদের সান্নিধ্যে সুখেই কালযাপন করছিলেন। কিন্তু রাজ জ্যোতিষিরা জানিয়ে দেন এ সুখ স্থায়ী হবে না। শোনা যাচ্ছে এক দুর্দম তুর্কিবীর বখতিয়ার উদ্দিন খিলজীর দর্পিত আগ্রাসনের অশ্বক্ষুর-ধ্বনি। লক্ষণাবতী আক্রমণ করবেন বখতিয়ার। কিন্তু তার আগেই রাজধানী সরিয়ে নিলেন লক্ষণ সেন। গঙ্গা ক্রমশ সরে যাচ্ছে পশ্চিমে। লক্ষণাবতী শ্রীহীন হয়ে পড়ছে। বসবাসের অযোগ্য হয়ে ওঠায় ধমচর্চায় এবং শাসনকাজের সুবিধের জন্য গঙ্গার নিকটবর্তী নদিয়াতে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে এসেছেন। এসেছেন বিপুল সংখ্যক গৌড়-লক্ষণাবতীর নাগরিকেরাও। ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যে, প্রমোদ বিলাসের বিহ্বল স্রোতে নিয়তি নির্ভর শাসনকাজ পরিচালনার আলস্যে আনন্দেই আছেন রায় লছমনিয়া আর গৌড় নাগরিকেরা।

সোনার থালায় দ্বি-প্রহরের আহারে বসেছিলেন লক্ষণ সেন। হঠাৎ কানে এল রাজদ্বারেব সামনে কোলাহল। দ্বাদশ অশ্বারোহী নিয়ে, অশ্ব-বিক্রেতার ছদ্মবেশে বখতিয়ার এসেছেন নুদিয়ার দখল নিতে। সভায় উঠে দাঁড়ালেন লক্ষ্মণ সেন। খিড়কির দরজা দিয়ে পূর্বপ্রস্তুত নৌকায় সোজা যাত্রা করলেন সুবর্ণগ্রামের দিকে। রাজধানী সেখানে। নুদিয়া বিজয় করে গৌড়বঙ্গে মুসলমান যুগের সূচনা করলেন বখতিয়ার।

কিন্তু সেই নুদিয়ার চিহ্ন আজ আর কোথাও নেই। শুধু নবদ্বীপের থেকে কিছু দূরে ওই বল্লাল টিবির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেন, ওইখানেই ছিল বল্লাল সেনের রাজবাড়ি। প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান কিছু হয়েছে। পাওয়া গেছে প্রাচীন দেবালয়ের কিছু প্রত্ন নিদর্শন। অনুমান করেন ঐতিহাসিকেরা, সেই নুদিয়া বিলীন হয়েছে গঙ্গাগর্ভে। বল্লাল টিবি উৎখননের ফলে ইটের দেওয়াল, যা পূর্বদিকে ২৩ মিটার দক্ষিণে ৫০ মিটার আবিষ্কৃত হয়েছে। পাওয়া গেছে দেবতা ও দানবের মাথার ছাঁচ। কেউ কেউ বিশ্বাস করেন, আজকের নবদ্বীপ-ই সেই নুদিয়া। এই বিশ্বাস বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে অনেকটাই আহত হয়।

ঐতিহাসিক মিনহাজউদ্দিন সিরাজ ১২৪৩-এ নুদিয়ায় আসেন। দেখা হয় বখতিয়ারের সৈন্য সঙ্গী দুই বৃধ হুসামুদ্দিন ও হাসিমুদ্দিনের সঙ্গে। তাদের সঙ্গে কথা বলে এবং প্রত্যক্ষ নুদিয়া পরিভ্রমণের প্রেক্ষিতে তিনি লেখেন তবকাৎ-ই-নাসিরি। তিনি নুদিয়াকে বড়ো শহর বলেই উল্লেখ করেন। শহর ঘেরা ছিল দেওয়াল দিয়ে। প্রাসাদের সামনে ছিল দরজা, যার ভেতর দিয়ে অশ্ব-বিক্রেতার ছদ্মবেশে বখতিয়ার প্রবেশ করেন এবং নুদিয়া দখল করে প্রচুর ধনরত্ন লুঠ করেন।

ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু ভিন্ন মত পোষণ করেন নুদিয়া সম্বন্ধে। মিনহাজের 'নৌদিয়া' যে রাজসাহীর নৌদিয়া এমন কথাও বলেছেন কোনো কোনো ঐতিহাসিক। সে যাইহোক বখতিয়ার এরপর রাজধানী সরিয়ে নেন দেওকোটে বা দেবীকোটে। নুদিয়া বা নদিয়া ইতিহাসের আড়ালে চলে যায়। আবার সে ফিরে আশে ষোড়শ শতকে বৈষ্ণব কবিদের লেখায়, শ্রীচৈতন্যদেবের কারণে। সিলেট থেকে বিদ্যাচর্চা কেন্দ্র নবদ্বীপে

আসেন এঁর পূর্বপুরুষ আরো অনেক সিলেটবাসীর মতোই। এসময় নবদ্বীপ ছিল গঙ্গার পূর্ব পাড়ে, অনেকটা দ্বীপের মতো। শহরের উত্তরে ছিল উদ্যান-শোভিত কাজীর বাড়ি। পশ্চিমে চারটি বাঁধানো ঘাট, চৈতন্যদেবের বাড়ির কাছের ঘাটের নাম চৈতন্য ঘাট। পরে যার নাম হয় প্রভুর ঘাট। ইতিমধ্যে শ্রীশূন্য সপ্তগ্রামের বণিকেরা আসতে শুরু করে শহরে। বহু লোকের বসতির কারণে অপরিকল্পিতভাবে শহরটি গড়ে উঠতে থাকে। নদীর ধারে বাড়ি করেন শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, গদাধর পণ্ডিত। কিছু ভিতর দিকে কবিরাজ মুকুন্দ দাশের বাড়ি, যিনি সুলতান হোসেন শাহর চিকিৎসক ছিলেন। জনাকীর্ণ শহরটি ক্রমেই ঐশ্বর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। ক্রমে বাণিজ্যিক শহরের চেহারা নেয়। পরে চৈতন্যদেবের প্রভাবে তা ধর্মীয় শহরে পরিণত হয়।

কিন্তু সেই শহর ষোড়শ শতকের মতো আজও যথাযথ আছে কিনা এ নিয়ে ঘোর সংশয় ঐতিহাসিকদের মনে। কেউ বলেছেন মায়াপুর-ই ষোড়শ শতকের নবদ্বীপ। হাইকোর্টের মতে, এখানেই চৈতন্যদেবের জন্ম। যদিও অনেকের মতে সেই জন্মস্থান গঙ্গাগর্ভে। শ্রীরামকৃষ্ণ নবদ্বীপে এসে তাঁর অন্তর্ধ্যানী মত প্রকাশ করে বলেছিলেন প্রকৃত স্থানটি গঙ্গারই বুকে শায়িত আছে।

এসব তর্ক-বিতর্ক নবদ্বীপের বাতাসে ভাসে। বল্লাল ঢিবির ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া কালের হাওয়ায় অনুসন্ধিৎসু পর্যটক কান পাতেন। সঠিক কোনো তথ্য আর মেলে না। শুধু গঙ্গা দিয়ে ইতিহাসের প্রবহমান স্রোতের মতো অনেক জল গড়িয়ে যায়। ইতিহাসের সেই স্রোতধারা বেয়ে লক্ষণ সেনের মতো আমিও পা বাড়াই সোনারগাঁর দিকে।

সুবর্ণপুর/সোনারগাঁ

আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।
—রবীন্দ্রনাথ

এই সেই সুবর্ণ গ্রন্থি। এখানেই পরবর্তীকালে সেন সম্রাট লক্ষ্মণ সেন তুর্কি আক্রমণের পর নুদীয়া থেকে এসে রাজত্ব করেন কিছুদিন। সেদিন দ্বি-প্রহরে নুদীয়ার প্রাসাদে সোনার থালা রুপোর বাটি সাজিয়ে যখন মধ্যাহ্নাহারে বসেন সম্রাট লক্ষ্মণ সেন, তখন হঠাৎ এক প্রবল কোলাহল আর আর্ত চিৎকারের আঘাতে সচকিত হয়ে আসন ত্যাগ করলেন তিনি। বুঝতে পেরেছেন তিনি প্রাসাদ-দুয়ারে এসেছে বলদর্পী বখতিয়ারউদ্দিন খিলজীসহ সেই দুর্দম তুর্কি সেনা, জ্যোতিষিরা যার শক্তিমত্তার কথা আগেই শুনিয়ে দিয়ে তাঁকে সতর্ক করে দিয়েছেন। বৃথা সময় নষ্ট না করে প্রাসাদের খিড়কি-দুয়ার দিয়ে গঙ্গার ধারে চলে এলেন লক্ষ্মণ সেন। নৌকা বাঁধা ছিল ঘাটে। নুদীয়া ছেড়ে পূর্ববঙ্গের সুবর্ণগ্রাম বা সোনারগাঁ-এর দিকে যাত্রা করলেন তিনি।

কোন্ সুবর্ণগ্রাম? ইতিহাস বলে, আগে যেমন গৌড় বলতে কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থান বোঝাতো না, যখন যেখানে তিনি রাজধানী স্থাপন করেছেন সে স্থানই অভিহিত হয়েছে গৌড় নামে—সুবর্ণগ্রামের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। সুবর্ণগ্রাম একটি প্রাচীন ভূখণ্ডের সংজ্ঞা যেন। ঐতিহাসিকরা বলেন, পূর্বে মেঘনা, পশ্চিমে শীতলক্ষা, উত্তরে একারাসিন্দুর ও দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র-ই ছিল মোটামুটি সোনারগাঁ বা সুবর্ণগ্রামের সীমানা। ব্রহ্মপুত্র সোনারগাঁর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পূর্ব ও পশ্চিম সোনারগাঁ তৈরি করেছে। এর মধ্যে পশ্চিম সোনারগাঁ-ই প্রাচীনতম।

১২৭৯ সালে তুঘ্রিল সুলতান মুঘিসুদ্দিন এখানকার শাসনকর্তা ছিলেন। দিল্লির গিয়াসুদ্দিন বলবন একে হত্যা করে তাঁর ছেলে বোঘরা খানকে শাসনভার দেন। এর পরবর্তী ইতিহাস সেই গুপ্তহত্যা, অস্ত্রের শোণিত পিপাসা আর যুধ বিগ্রহের ইতিবৃত্ত! এরই মধ্যে ব্যাবসা-বাণিজ্যে সোনারগাঁ-র খ্যাতি বাড়ে। বিশেষত মসলিনের জন্য, যার উল্লেখ করেছেন আবুল ফজল।

১৪৩২-এ চিনা দূত ফা-হুয়ান এখানে আসেন। আসেন আরও অনেক পর্যটক—যার মধ্যে নিকোলো কান্তি অন্যতম। এঁদের বিবরণ থেকে জানা যায়, শহরটি ধনী এবং বড়ো, নদীর বিস্তারও বিশাল। নদীর দু'পাশে চমৎকার সব বাড়ি। পরিব্রাজক র‍্যালফ ফিচ এই শহরে তাঁদের কাপড়ের বৈশিষ্ট্যেরও উল্লেখ করেছেন। ফিচের বিবরণীতে আছে, বাড়িগুলো মাটি ও খড়ের সমন্বয়ে তৈরি। নিরামিষাসী ধনী ব্যক্তিদের সংখ্যা বেশি। জনসাধারণের

পরনে কাপড়, ঊর্ধাঙ্গ নিরাবরণ। কাপড় ও চাল রপ্তানি হয় দেশে-বিদেশে। সোনার গাঁ মোগলদের দখলে আসে ১৬১১-এ।

অষ্টাদশ শতকে রেনেলের লেখায় দেখা যায়, সোনারগাঁ ক্রমে সত্যিই গ্রামে পরিণত হয়েছে। উত্থান হয়েছে ঢাকার। ঊনবিংশ শতকে সোনারগাঁ সম্পূর্ণভাবে পরিত্যক্ত হয়। অবশ্য পরবর্তীকালে নতুন জনবসতি হয় বিংশ শতাব্দীতে।

সোনারগাঁ-এর শুরু বোধকরি মহাভারতের আমলে রাজা জয়ধ্বজের সময়ে। কিংবদন্তী শোনায় পঞ্চপাণ্ডব সোনারগাঁ-এর লাঙলবন্ধ ও পঞ্চমীঘাটে এসেছিলেন। আবার ফরিদপুব থেকে প্রাপ্ত ষষ্ঠ শতাব্দীর তাম্র ফলকে সুবর্ণবীথির উল্লেখ পাওয়া যায়।

সম্রাট লক্ষ্মণ সেন এসেছিলেন এই সুপ্রাচীন ভূখণ্ডে। এখান থেকেই তিনি গৌড়বাংলার একটি বিশেষ ভূখণ্ডকে শাসন করতেন। আজ সোনারগাঁ একটি ইতিহাস সমৃধ অতীতের স্মৃতিময় ভূখণ্ড মাত্র। আজও সুবর্ণগ্রাম, সোনারগাঁ নামে এক সমৃধ গ্রাম হয়ে মুন্সীগঞ্জের বিপরীতে ধলেশ্বরী নদীব তীরে অতীত কাহিনি শোনাবার জন্য যেন অসংখ্য প্রত্নবস্তুতে উন্মুক্ত হয়ে রয়েছে। সেনদেব আর দুটি জয়স্কন্ধাবার ছিল রাজসাহীর বিজয়নগর এবং হুগলির বিজয়পুর-এ। মুঘল পূর্ব যুগে পূর্ববঙ্গে মুসলমান রাজাদের রাজধানী ছিল এই সোনারগাঁ-এ। এখন তা স্মৃতির গহ্বরে। বিলুপ্ত হয়েছে সেই রাজধানী। বখতিয়ার নুদীয়া বিজয়ের পর রাজধানী স্থাপন করেছেন দেবীকোটে। এবার যাব সেখানে।

বিলুপ্ত রাজধানী ১০

দেবীকোট/দেওকোট

এই বঙ্গরাজ্যে হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতিই প্রধান। পরস্পরের এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, ধর্মে ভিন্ন, কিন্তু মর্মে এবং কর্মে এক—সংসারকার্যে ভাই না বলিয়া আর থাকিতে পারে না।

—মীর মশারফ হোসেন

অবিশ্বাস্য মনে হয়।

এইখানে, এই দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর থানার নারায়ণপুর মৌজায় পুনর্ভবা নদীর তীরে ঘন জঙ্গলে ঢাকা পাথর, ইট আর ভাঙা খিলানের এই বিশাল সমাধি-সৌধের নীচে চিরকালের মতো ঘুমিয়ে আছেন বখতিয়ার—

মহম্মদ-ই-বখতিয়ার খিলজী!

উচ্চাকাঙ্ক্ষী ভাগ্যান্বেষী সেই দুর্ধর্ষ যুদ্ধ ব্যবসায়ী, সুবিখ্যাত ওদন্তপুরী মহাবিহার ধ্বংসকারী এক লুণ্ঠক, বঙ্গ-বিহার বিজয়ী এক প্রবল পরাক্রমী সেনানায়ক, বাংলায় প্রথম মুসলমান রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা, দুর্গম তিব্বত অভিযানের নায়ক, বাংলার শাসনকর্তা সেই বখতিয়ার খিলজী—জনজীবনের কোলাহল থেকে দূরে নির্বাসিতের মতো এই নির্জন ভূখণ্ডে অবহেলিত এক নিভৃত অঞ্চলের ঘন অরণ্যের এই জটিল আশ্রয়ে নীরব হয়ে আছেন তিনি।

অবিশ্বাস্য মনে হয়।

এই সেই দেবীকোট বা দেওকোট! বাংলার মুসলমান যুগের প্রথম রাজধানী, পরবর্তী যুগে সুলতান হুসেন শাহর অন্যতম শক্তিশালী সেনানিবাস, সুশাসক পাল সম্রাটদের 'জনকভূ' বরেন্দ্রভূমির পরিবর্তিত নামের বরিন্দ্ অঞ্চল—সুপ্রাচীন কোটিবর্ষ বা কোটিকপুরের ভিত্তিভূমির ওপর গড়ে উঠেছিল যে বিশাল মহানগরী দেবকোট বা দেওকোট। না, এখন আর কোনো চিহ্নই খুঁজে পাওয়া যাবে না সেই মহানগরীর। পশ্চিমবাংলার ছোটো একটি জেলায় ছোটো একটি থানার অন্তর্গত সামান্য কিছু ভূখণ্ড ছড়ানো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কয়েকটি ভগ্নপ্রায় মসজিদ, অসংখ্য ভাঙা পাথরের টুকরো, ইটের কঙ্কাল আর কয়েকটি নিঃস্ব গৃহপ্রাচীরের অস্তিত্ব নিয়ে নিতান্ত নগণ্য এক গ্রাম হয়ে বাংলার এই রাজধানী এখন মুমূর্ষর মতো ম্রিয়মাণ।

বিশ্বাস হয় না—এইখানে বাস করতেন দেবহুতি নামে এক রাজা। কথিত আছে—তাঁর নামেই এ জায়গার নাম হয় দেবকোট! কোট বা গড় শব্দের অর্থ দুর্গ বা দুর্গতুল্য রাজপুরী। এই জায়গারই অপর নাম কোটিবর্ষ, প্রাচীন গোকলিকামণ্ডল ও হলবর্তমণ্ডল যার অন্তর্ভুক্ত ছিল। জৈন কল্পসূত্রে—জৈন সাধুগণের কোটিবর্ষীয়া পুণ্ড্রবর্ষীয় তাম্রলিপ্তিকা শাখার উল্লেখ আছে। অনুমানে অসুবিধে নেই, এই অঞ্চল বিখ্যাত তাম্রলিপ্ত বন্দরেরই সমসাময়িক এবং

একদা এখানে জৈনধর্মেরও অন্যতম কেন্দ্র ছিল। যতদূর জানা গেছে, এখানে একটি প্রসিধ্ধ বৌধ্ধবিহারও ছিল। কিন্তু এসবই সম্ভবত মুসলমান পূর্বযুগের ঘটনার ইতিবৃত্ত। রাজ্যব্যাপী মাৎস্যন্যায় দূর করার অভিপ্রায়ে প্রকৃতিপুঞ্জ যাঁকে রাজলক্ষ্মীর কর গ্রহণ করিয়েছিল সেই বপ্যট বংশোদ্ভূত গোপালদেব অশান্ত বাংলায় দীর্ঘ দুশো বছর ব্যাপী এক সুশাসন প্রবর্তন করে পালরাজত্বের এক শুভময় ইতিহাসের সূচনা করেন এইখান থেকেই। অদূরবর্তী ওই বাণগড়ই ছিল তাদের রাজধানী, মাটির গভীর স্তরে নিহিত আছে যার সাক্ষ্য। তারপর সেনরাজত্বের সূচনা। রাজধানী স্থানান্তরিত হল লক্ষ্মণাবতীতে। এখান থেকে দূরে, বরেন্দ্রভূমি থেকে গৌড়ে। আর তারপর...

বিলুপ্ত রাজধানী পরিক্রমায় উৎসুক পরিব্রাজক আমি একে একে গঙ্গে, মহাস্থানগড়, কর্ণসুবর্ণ, বাণগড়, এরপর আবার এসে দাঁড়িয়েছি সেই বরেন্দ্রভূমি বাণগড়েরই কাছে—দেবীকোটে। স্তব্ধ বিস্ময়াহত হয়ে তাকিয়ে আছি তার জীর্ণ অবশেষের দিকে। না, কোথাও আর শোনা যায় না সেই দুর্ধর্ষ বখতিয়ারের অশ্বক্ষুর-ধ্বনি। শুধু মালদহ-বালুরঘাট সংযোগকারী জাতীয় সড়কের ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে অজস্র ট্রাক, বাস, ট্যাক্সির যান্ত্রিক আওয়াজ; শোনা যায় গ্রামীণ মানুষের সংলাপ, পুনর্ভবা, টাঙ্গন আর ব্রাহ্মণী নদীর অস্ফুট কলস্বর।

বঙ্গ বিজয়ের পর এখানেই প্রথম রাজধানী স্থাপন করেছিলেন বখতিয়ার খিলজী ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্বাহ্ণে।

শুনেছিলাম, একদা যাঁর প্রচণ্ড দাপটে বাংলায় হিন্দু সাম্রাজ্যের ভিত ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল, ছদ্মবেশী আঠারোজন অশ্বারোহীর নাটকীয় ছলনা এবং সুতীব্র আক্রমণের মুখে দিশেহারা হয়ে পর্যুদস্ত হয়েছিল বাংলার সৈন্যবাহিনী—সেই দুর্বার সমরনায়ক বখতিয়ারের প্রচণ্ড প্রতাপের চিহ্ন রেণু-রেণু হয়ে আছে এখানকারই মাটিতে, নারায়ণপুর মৌজায় পীরপাণ্ডি বা পীরপাল নামের জায়গাটিতে। কেউ আসেন না আর। দেশি-বিদেশি কোনো পর্যটক বা কৌতূহলী কোনো গবেষক পর্যন্ত না। এমনকি বাংলার ইতিহাস বিষয়ক কোনো বইতেও এখানকার কোনো ছবি নেই। কোথায় কোন্ সমাধির আড়ালে চিরকালের মতো ঘুমিয়ে আছেন সেই অশান্ত সেনানায়ক, স্থানীয় মানুষ সঠিকভাবে তাও বলতে পারেন না। পুঁথি পিপাসু কোনো গবেষকের কৌতূহলও স্পর্শ করে না বিষয়টিকে। শুধু অনুমানে বলেন—এই গঙ্গারামপুরের কাছেই কোথাও আছে বখতিয়ারের সমাধি। ফলে সেইসব অস্পষ্ট নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছতে সময় এবং পরিশ্রম হল অনেক বেশি পরিমাণে।

গঙ্গারামপুরে নেমে জিজ্ঞেস করলাম একজনকে—কোথায় আছে সেই সমাধিস্থান? জানালেন—পুনর্ভবার বড়ো সেতুটি পার হলে ব্রাহ্মণীর ছোটো সেতু, সেটি পেরোলেই যে কাঁচামাটির রাস্তা নেমে গেছে লক্ষ্মীপুর গ্রামের দিকে—সে পথে এগোলেই যাওয়া যাবে সেখানে। শীতের বিকেলে আসন্ন সন্ধ্যার আমেজ। রিক্সা নিয়ে লক্ষ্মীপুর পৌঁছলে সেখানকার অধিবাসীরা জানালেন—সেই পীরপাল এখানে নয়। গ্রামের শেষপ্রান্তে যে ছোটো নদী—খেয়া পার হয়ে মাঠ বরাবর মাইল দেড়েক গেলেই দেখা যাবে সেই আকাঙ্ক্ষিত চিহ্ন—কিন্তু একটু পরেই সন্ধ্যা নামবে। ভাবলাম ওই নির্জন স্থানে না যাওয়াই নিরাপদ। ফিরেই আসছিলাম, কিন্তু কলকাতা থেকে এতটা পথ এসে শেষ পর্যন্ত না দেখে ফিরে যাবার ক্ষোভ নিরন্তর পীড়িত করবে এমন আশঙ্কায় রিক্সাওয়ালাকে বললাম—যাবেন?

অবাঙালি চালক, দীর্ঘকাল এখানে থাকার ফলে ভাষায় পোশাকে বাঙালি হয়ে গেছেন। প্রায় সানন্দেই রাজী হলেন। কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ আর ক্যামেরা দেখে কিনা কে জানে! ফটো ও অর্থপ্রাপ্তির যৌথ সম্ভাবনাই তাকে উদ্দীপ্ত করে থাকবে বোধহয়। যদিও নিশ্চিতই ছিলুম ছবি তোলা আজ আর হবে না। রিক্সা পাড়ে রেখে নৌকোয় উঠতেই মাঝি জানালেন—এই পাড় ঘেঁসে কিছুটা এগোলেই হেঁটে পার হওয়া যাবে নদী এবং ওপাড়ে উঠলেই যে আলপথ মিলবে, সেটি ধরে এগোলেই তাড়াতাড়ি পৌছনো যাবে। দেখছিলাম, সূর্য শীতের ভয়ে অন্ধকারের পর্দা গায়ে টেনে নিচ্ছে দ্রুত, পা চালাতে হল দ্রুততর বেগে। কিন্তু গ্রামের দেড় মাইল আঙ্কিক হিসেবে কখনোই যথাযথ হয় না। আবছা আলোর আড়ালে এক সময় দেখলুম এক সমাধি-সৌধ আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে। বিশাল পাথরে গাঁথা তার ভিত্তিভূমি, চারদিকে ছড়ানো অজস্র তার ভগ্নাংশ, ঘন লতাগুল্মোয় আচ্ছন্ন হয়ে আছে এর রাজকীয় মহিমা।

এই কি সেই বখতিয়ারের শেষ চিহ্ন! ঝালরের ওপারে সমাধি-সৌধ, সেখান থেকে ভেসে ওঠে বাংলার ইতিহাসের এক অত্যাশ্চর্য কাহিনি।

গৌড়ের সিংহাসনে আসীন সম্রাট লক্ষ্মণসেন। দানশীল, সুশাসক, সংস্কৃতিবান এই সম্রাট ছিলেন একান্তভাবে ধর্মনিষ্ঠও। লক্ষ্মণাবতীতে থেকেও তীর্থভূমি নদিয়া-নবদ্বীপের প্রাসাদে নিয়ত ধর্মচর্চা এবং কাব্য সুধারস পানেই তাঁর অনুরাগ বেশি। মহাসন্ধি কবিগ্রহিক হলায়ুধ মিশ্র, কবি উমাপতিধর, শরণ প্রমুখ পণ্ডিতজনের সমাহারে গঠিত 'নবরত্ন' পরিবেষ্টিত হয়ে সুখেই ছিলেন তিনি। সুশাসকই ছিলেন। ঐতিহাসিক মিন-হাজ-উদ্দীন সিরাজও স্বীকার করেছেন—'মহৎ রাজা... যিনি এক লক্ষ কড়ির কমে কাউকে কিছু দান করতেন না।' সুবিশাল গৌড়ের মসৃণ জীবনযাত্রার স্বরূপ তাই তাঁকে নিশ্চিন্তই করেছিল, আরো অখণ্ড মনোযোগে ধর্মচর্চায় মন দিতে পেরেছিলেন। এমনকি ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদেরও সাদর অভ্যর্থনায় স্বাগত জানিয়েছিলেন তাঁর রাজসভায়। এই কিছুদিন আগে, পীর শেখ জালালুদ্দীন তাব্রেজীর ক্ষমতায় মুগ্ধ হয়ে পাণ্ডুয়ায় কিছু জমিও দিয়েছেন তাঁকে মসজিদ নির্মাণের জন্য।

জানতেন না সম্রাট লক্ষ্মণসেন, ধর্মের মর্মের আড়ালে লুকানো থাকে অজস্র বিষাক্ত কীট, যা ক্রমে জীর্ণ করে দেয় সকল সতর্ক প্রহরা। তাই ওই পীর যে ধর্মপ্রচারের ছদ্মবেশে এদেশে এসেছেন আর একটি গুরুতর অভিপ্রায়ে, আর পাণ্ডুয়ার গোপ কালু ঘোষ কালু পীর নাম নিয়ে ভয়ঙ্কর এক ষড়যন্ত্রের খেলায় মেতে উঠেছেন—সে সংবাদ অস্পষ্টভাবে কানে এলেও গ্রাহ্য করেননি তিনি।

কিন্তু তাঁর সুখী শ্রবণকে চমকে দিয়ে আচমকা বেজে উঠল এক দূরাগত অশ্বক্ষুর-ধ্বনি। সংবাদ পেলেন তিনি, বিহার ও মগধ অধিকার করে গৌড়-লক্ষ্মণাবতীর দিকে দ্রুত এগিয়ে আসছেন এক মহাপরাক্রমী সমরকুশলী তুর্কি সেনাপতি! নাম মহম্মদ বখতিয়ার খিলজী। শঙ্কিত হয়ে উঠলেন সম্রাট। ডাক পড়ল রাজ জ্যোতিষীদের—যাঁদের পরামর্শ ছাড়া রাজকার্য পরিচালনা করেন না তিনি।

তারপর?

এক আশ্চর্য চাঞ্চল্যকর উপন্যাসোপম ঘটনা ঘটল এরপর। তীব্র সংঘাতময় রাজ্য-রাজধানী পরিবর্তনের এক চমকপ্রদ নাটকীয় কাহিনি—পৃথিবীর ইতিহাসে এ জাতীয় কোনো দ্বিতীয় উদাহরণ আছে কিনা আমার জানা নেই।

সামান্য জায়গীরদার ছিলেন বখতিয়ার। চুণারের এগারো মাইল পূর্বে ভূইলি নামে যে গ্রাম আছে, সেখানকার জায়গীরদার। কিন্তু সামান্য ধনে সন্তুষ্ট ছিলেন না। গাহড়বার সামন্ত রাজাদের পরাভূত করে তিনি মুঙ্গের ও বিহার অঞ্চলে লুঠতরাজ শুরু করলেন। ক্ষমতা ও অর্থের লোভই ছিল বখতিয়ারের বেশি। যেখানেই রাজশক্তির দুর্বলতা টের পেতেন সেখানেই ক্ষমতা অধিকারের চেষ্টা করতেন। ১১৯৯ সালে আচমকা তিনি হিসার-ই-বিহার বা বিহার দুর্গ আক্রমণের ফলে প্রচুর ধনরত্নের অধিকারী হলেন। তাঁর আক্রমণে পুড়ে গেল অসংখ্য মহামূল্যবান গ্রন্থ।

ভুলই করেছিলেন তিনি। ভেবেছিলেন ওটা বোধহয় দুর্গ। আসলে বিখ্যাত ঔদণ্ড বা ওদণ্ডপুর মহাবিহার ছিল এটি এবং যাঁরা নিহত হলেন তাঁরা সবাই মুণ্ডিতমস্তক ভিক্ষু। পরের বছর একই ভুলের ফলে ধ্বংস হয়ে গেল বিক্রমশীলা বিহার। খবর পেয়েছিলেন বখতিয়ার, পূর্ব ভারতের গৌড় রাজ্যেও অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ক্রমশ বিশৃঙ্খলার রূপ ধারণ করেছে। স্বয়ং সম্রাট এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ উদাসীন।

খবর পেয়েছিলেন সম্রাট লক্ষ্মণ সেনও। একজন মদগর্বী যবন তাঁর রাজ্য অধিকার করতে এগিয়ে আসছেন। আতঙ্কিত এবং উদ্বিগ্ন মহামন্ত্রী এবং উৎকণ্ঠিত সম্রাটকে বিমূঢ় করে ঘোষণা করেছেন রাজ জ্যোতিষীগণ, আজানুলম্বিত-বাহু কুৎসিত দর্শন এক যবনের হাতে এ রাজ্য পরাজিত হবে, শাস্ত্রেও নাকি লেখা আছে সেকথা। সম্রাটের গোপন দূত ঝটিতি খবর এনেছেন সেই তুর্কি সমরনায়কের চেহারার সঙ্গে বাস্তবিক-ই শাস্ত্রের বর্ণনায় মিল রয়েছে। লক্ষ্মণাবতীতে বিদ্যুৎবেগে ছড়িয়ে পড়ল ভীতি আর অনিশ্চয়তা। ব্রাহ্মণ এবং বণিকেরা পালিয়ে গেলেন পূর্ববঙ্গ এবং আসামে। শুধু মন্ত্রীমণ্ডলী এবং রাজ জ্যোতিষীদের সকল সতর্ক, উপদেশ এবং পরামর্শ অগ্রাহ্য করে অসাধারণ রাজকীয় মর্যাদাবোধ এবং সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে নদিয়ার প্রাসাদে একাকী রয়ে গেলেন বৃদ্ধ সম্রাট লক্ষ্মণসেন— রায় লছমনিয়া। ১২০১ সাল। বিহার শরীফ থেকে গয়া ও ঝাড়খণ্ডের ভেতর দিয়ে দ্রুত অগ্রসর হলেন বক্তিয়ার। তাঁর চকিত গতির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারল না সৈন্যদল। মাত্র আঠারোজন অশ্বারোহী সঙ্গে নিয়ে নুদিয়ার সীমায় এসে দাঁড়ালেন মহম্মদ বখতিয়ার খিলজী।

তারপর?

লক্ষ্মণাবতী-নদিয়া বিজয়ের পঞ্চাশ বছর পর প্রখ্যাত ঐতিহাসিক মিন-হাজ-উদ্দিন সিরাজ তাঁর 'তবকাত-ই-নাসিরী'তে লিখেছেন :

...বখতিয়ার নুদিয়ায় প্রবেশ করিলেন এত সহসা এবং দ্রুত যে, তাঁহার অশ্বারোহীদের ভেতর আঠারোজন ছাড়া আর কেহ তাঁহার সঙ্গে তাল রাখিতে পারিলেন না...। নগরের দ্বারে পৌঁছিয়া তিনি কাহারো ওপর কোনো অত্যাচার করিলেন না, বরং নীরবে এবং বিনীতভাবে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কেহ-ই সন্দেহ করিতে পারিল না যে, ইনিই বখতিয়ার। বরং সকলেই ভাবিল এই আগন্তুকেরা বোধহয় ব্যবসায়ী এবং মহার্ঘ অশ্ব বিক্রয় উদ্দেশ্যেই ইহাদের আগমন। বখতিয়ার রাজপ্রাসাদের দ্বারে আসিয়া কোষ হইতে তরবারি উন্মুক্ত করিলেন এবং বিধর্মীদের হত্যা শুরু করিয়া দিলেন। তখন দ্বি-প্রহর, রায় লছমিয়া ভোজনে বসিয়াছেন, এমন সময় রাজপ্রাসাদের দ্বার হইতে এবং নগরের কেন্দ্রস্থল হইতে তুমুল আর্তনাদ উত্থিত হইল। লক্ষ্মণ সেন ব্যাপার কি বুঝিবার আগেই বখতিয়ার

রাজপ্রাসাদের ভিতর ঢুকিয়া পড়িলেন এবং নরহত্যা আরম্ভ করিয়া দিলেন। রায় তখন নগ্নপদে প্রাসাদের পশ্চাৎদ্বার দিয়া পলাইয়া গেলেন।

নৌকা প্রস্তুত ছিল ঘাটে। অসহায় সম্রাটকে নিয়ে সংকনাট এবং বঙ্গ অভিমুখে যাত্রা শুরু করল সেই নৌকো।

'ফুতুহ্-উস-সালাতিন' গ্রন্থ প্রণেতা ইস্‌মী লিখেছেন প্রায় একই কথা। তাতার, অশ্ব, চিনা বস্ত্রসম্ভার এবং অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্য পরীক্ষার জন্য সম্রাটকে আহ্বান জানিয়েছিলেন ছদ্মবেশি বখতিয়ার। রায় যখন কারাবানে এলেন তখন তাঁকে ছলনায় বশীভূত করে বন্দি করলেন সহজেই। দুটি বিবরণীর ভেতর যে সামান্য পার্থক্য আছে তা শুধু এই জায়গাতেই।

'সদুক্তি কর্ণামৃত' গ্রন্থ, বিক্রমপুর থেকে জয়স্কন্ধাবার প্রচারিত 'ভাওয়াল' ও 'মাধাইনগর লিপি', উমাপতি ধর এবং শরণের শ্লোক বলে—সম্রাট লক্ষ্মণ সেন শেষজীবনে কিছুকাল পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করেছিলেন।

সে যাই হোক, সুচতুর বখতিয়ার তখন গৌড় অধিকার করেছেন। লক্ষ্মণাবতীর নাম পরিবর্তন করে রেখেছেন লখ্‌নৌতি। রাজধানী স্থাপন করেছেন দেবকোটে এবং তারপর দিল্লিশ্বর কুতুব-উদ্দীনকে সন্তুষ্ট করার জন্য কিছু উপঢৌকনসহ্ রওনা হয়েছেন দিল্লির দিকে। বাংলায় স্থাপিত হয়েছে মুসলমান রাজত্ব।

কিন্তু তবু ভরিল না চিত্ত। রক্তে যাঁর হয়রাজের হ্রেষাধ্বনি বাজে, তিনি রাজধানীতে কাল কাটাতে পারলেন না। ১২০৬ সালে দেবকোট থেকে এক সামরিক অভিযান চালালেন সুদূর তিব্বত জয়ের জন্য।

পরবর্তীকালে গৌহাটির কাছে ব্রহ্মপুত্রের কানাইবরশীবোয়া নামে এক জায়গায় পথের লেখা এক লিপি বলে :

'শাকে ১১২৭ শাকে তুরগযুগ্মেশে
মধুমাস ত্রয়োদশে।
কামরূপং সমাগতা তরুওকা ক্ষয়মাযযুঃ।।'

অর্থাৎ ১১২৭ শকাব্দে কামরূপ অভিযান করেন তুর্কিরা। কিন্তু না, এবার ভুল করলেন বখতিযার। যুধজয়ের নেশায় উন্মাদ হয়ে তিনি নিজের শক্তির পরিমাপ করতে পারেননি তখনও। তিব্বত অভিযান অসমাপ্ত রেখে শোচনীয় ব্যর্থতা বরণ করে ফিরে এলেন তিনি। শুরু হল এবার থেকে তাঁর পরাজয়ের পালা। রাজধানী স্থানান্তরিত হল লখ্‌নৌতিতে। মিন-হাজের কাছে যে দুই বৃধ সৈনিক নুদিয়া বিজয়ের কাহিনি বলেছিলেন, সেই দুইজন অকপটে এবার ব্যক্ত করেছিলেন সেই করুণ কাহিনি।

ভগ্ন স্বাস্থ্য এবং ভগ্ন মনোরথে বখতিয়ার ফিরে এলেন রাজধানীতে। সবিস্ময়ে লক্ষ করলেন, যেখানে তাঁর ভয়ে গৌড় নাগরিকেরা সদা সন্ত্রস্ত থাকত, সেখানে যেন এক উদ্ধত স্পর্ধার হাওয়া তুমুল চিৎকার তুলেছে। এই ব্যর্থ সমরাভিযানে যেসব সৈনিক মারা গেছেন, তাঁদের শোকার্ত পরিবারবর্গ কটূক্তি আর অভিশাপের বাণী উচ্চারণ করে লখ্‌নৌতির আবহাওয়াকে যেন ভয়াবহ করে তুলেছে। দেবকোটে ফিরলেন তিনি। সেখানেও সেই একই হাহাকার, একই কান্নার তীব্র আঘাত। পথে বেরোতে শঙ্কিত হন বখতিয়ার। সুদৃশ্য অট্টালিকাগুলোর দরজা-জানালা তাকে দেখামাত্র এক অশুভ ছায়ার প্রবেশ নিষেধ করার

জন্যই যেন সশব্দে বন্ধ হয়ে যায়। কখনো তাঁর ক্ষণিক অন্যমনস্কতার সুযোগে চকিতে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করে প্রবল ধিক্কার আর ক্ষমাহীন ভৎর্সনা করেন নিপীড়িত নাগরিকেরা।

বিষাদে ভেঙে পড়েন দুর্ধর্ষ বখতিয়ার। যে প্রচণ্ড শক্তিতে তিনি সামান্য এক জায়গীরদার থেকে আজ গৌড়ের সিংহাসনে উঠে আসতে পেরেছেন, তার কোনো চিহ্নই খুঁজে পান না তিনি দেহে বা মনে। ক্ষোভে, অপমানে, দুঃখে রাজপ্রাসাদের নিভৃত কক্ষে আত্মগোপন করেন। কিংবদন্তী জানায়, এ-সময় কঠিন কুষ্ঠব্যাধিতে আক্রান্ত হন তিনি। আজানুলম্বিত বাহু, খর্বাকৃতি, অ-সুন্দরদর্শন এই সমরনায়ক তখন যেন জীবন্ত প্রেতের মতো প্রাসাদপুরীর কক্ষে বন্দি। সভয়ে দেখতে পান, ইতিহাসের চাকা তাঁকে গুঁড়িয়ে দেবার জন্য এবার দ্রুত এগিয়ে আসছে। বিরুদ্ধপক্ষীয়রা রাজ্যের ভেতর এক ষড়যন্ত্রজাল বিছিয়েছেন। অসহায়ের মতো নিস্ফল আক্রোশে গুমরে উঠতে থাকেন তিনি। তারপর একদিন তাঁর দেহমনের সকল যন্ত্রণার অবসান ঘটাতে এল আলি মর্দান নামে এক আততায়ীর নিষ্ঠুর ছুরিকা! শেষ হয়ে গেল মহম্মদ-ই-বখতিয়ার ভাগ্যাহত জীবন।

এই সেই দেবকোট! আর ওই কি সমাধিভবন? আমি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ি। কোথায় চুণারের ভূইলিগ্রাম আর কোথায় এই গঙ্গারামপুর থানার নারায়ণপুর মৌজার এক অবহেলিত গ্রাম পীরপাঞ্জি বা পীরপাল! কতদূর পথ অতিক্রম করে সাফল্যের চূড়ায় উঠতে গিয়ে ক্ষমতালোভী এক সুলতানের বিজয়ী অশ্ব এইখানে এসে মুখ থুবড়ে পড়েছিল। কি করুণ এক নাটকীয় পরিণতি!

এখানেই পরবর্তী সুলতান গিয়াসুদ্দীন প্রথম টাঁকশাল স্থাপন করেন এবং এখান থেকেই মুদ্রা প্রচলন করেন ১২১১ থেকে ১২২৭ সালের মধ্যে।

এখান থেকেই ওয়েস্ট ম্যাকট সাহেব পান চারটি শিলালিপি। প্রথমটি সুলতান কায়কাউসের (৬৯৭ হিজরা বা ১২৯৭ সালের), দ্বিতীয়টি সুলতান সেকেন্দার শাহর (৭৬৫ হিজরা বা ১৩৬৫ সালে), তৃতীয়টি সুলতান মুজফ্ফর শাহর (৮৯৬ হিজরা বা ১৪৯৬ সালের), চতুর্থটি সুলতান হুসেন শাহর (৯১৮ হিজরা বা ১৫১৮ সালের) এবং এখানেই হুসেন শাহ্ পরে নিকটবর্তী সেনানিবাসের সঙ্গে এই দেবকোট সেনানিবাসের যোগাযোগের জন্য একটি পথ নির্মাণ করেন।

কোথায় আজ সে-সব! সন্ধ্যায় গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে সব প্রত্নচিহ্ন! দ্রুত হাতে সমাধিভবনের একটি স্কেচ করে নিলাম ফটো তোলা নিরর্থক জেনে।

রিক্সাচালক বললেন—এটা কি বাবু? বললাম। খুব মনোযাগ সহকারে শুনলো সব। ঘাড় নেড়ে বিস্ময়াহত গলায় বললেন :

—এখানে রাজা ছিলেন, এতদিন তো জানিনি?

আমিই কি জেনেছি আগে! স্কুল বা কলেজে কোনো শিক্ষক মহাশয় এ কথা বলেননি, কোনো পাঠ্য বইতেও নেই। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা দেশের ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানবার সুযোগ দেয় না। অতএব নিরক্ষর এই রিক্সা চালকের অকৃত্রিম আগ্রহ পূরণ করবার জন্য গল্পের আকারে সবই বলতে হল ফেরার পথে। ক্ষত-বিক্ষত চষা মাঠের সংকীর্ণ আলপথ অতিক্রম করতে দুঃসহ কষ্ট হচ্ছিল! ইতিমধ্যে কয়েকটি কুকুর নিকটবর্তী গ্রাম থেকে অচেনা মানুষের ঘ্রাণ পেয়ে যথেষ্ট বিরক্ত বোধ করে আমাদের উদ্দেশ্যে দ্রুত এগিয়ে

আসছিল। সমূহ বিপদ জেনে কি করব ভাবছি। কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। কিছু একটা অনুমান করে কুকুরগুলো নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখেই আমাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটতে লাগল। আল-কেউটের কথা শুনেছিলাম, অতঃপর তাদের কথা মনে হল। আমাকে কামড়ালে ক্ষতি নেই, কিন্তু রিক্সাচালককে কামড়ালে তার এই সবল শরীর বহন করব কিভাবে! ভাবতে ভাবতেই দেখলুম—কাছেই নদী, নক্ষত্রের আলোয় মৃদু হাসছে।

মালদায় ফিরতে হল ট্রাকে করে। বাস ছিল না অত রাতে! মনে মনে ধন্যবাদ এবং বাস্তবে একটু বেশিই টাকা দিয়ে এসেছি বিক্শা চালককে। কোনো ক্ষোভ নেই তারজন্য। এমন দুর্গম জায়গায় অবেলায় যেতে এমন অকপটে কেউ কি রাজী হত!

শুধু একটু সংশয় রয়ে গেল। ওই সমাধিভবনই কি বখতিয়ার-এর সমাধিস্থান! কোথাও তো কোনো প্রস্তরলিপি চোখে পড়ল না! তাহলে?

সুযোগ মিলল কিছুদিন পরই। সরকারি কাজে বালুরঘাট গিয়েই যোগাযোগ করলুম জেলা গ্রন্থাগারিক শ্রীচিত্ত দত্ত মহাশয়ের সঙ্গে। ওই সমাধিভবনের ছবি দেখালেন শ্রীদত্ত। বললেন—বাণগড় বিষয়ক আমার লেখাটি অমৃত পত্রিকায় পাঠ করে তিনি এবং ডি. এস. ই. ও. শ্রীসচ্চিদানন্দ দে রায় মহাশয় গিয়েছিলেন বাণগড়ে এবং ওই সমাধিস্থান দেখেও এসেছেন। শুনেছেন ওখানকার প্রস্তরলিপিটি নাকি নিকটবর্তী ধলদিঘির পারে এক মসজিদের গায়ে সংলগ্ন আছে। বেরিয়ে পড়লুম দু'জনে। ধলদিঘির কাছাকাছি জাতীয় সড়কে নেমে সেই মসজিদে ঢুকতেই দেখি একটি প্রস্তরলিপি। ফটো নেওয়া হল। ভেতরে একজন পীরসাহেবের সমাধি। তার সামনে নীরবে কি পাঠ করছেন একজন মুসলমান ভদ্রলোক। জিজ্ঞাসার উত্তরে জানালেন—এই পীরের নাম আতাউল্লা! আর তিনি পীরভৃতা সৈয়দ শাহ্ আহম্মদের অধস্তন পুরুষদের একজন। জানা গেল, এই ধলদিঘি যা পৌরাণিক বাণরাজার মহিষী ধলরানির নামে স্পন্দিত। তার দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ ৪০০০ এবং ১০০০ ফুট এবং এই প্রস্তরলিপি পীর জাফর গাজির নির্মিত ও সুলতান কায়কাউসের সময় অর্থাৎ ১২৯৭ খ্রিস্টাব্দে এখানে স্থাপন করা হয়েছে। মসজিদটি সেকেন্দার শাহ ১৩৬৮-তে শেষ করেন। বাংলার ১২৬২ সালে করমালী শাহ ফকির দিঘির দক্ষিণপাড়ে এক মেলা বসান। সেই থেকে আজও সেই মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। বিখ্যাত এই ধলদিঘির মেলার আকর্ষণে বহু ভক্ত এখানে উপস্থিত হন। দেখলুম দূর থেকে সারিবদ্ধ উট নিয়ে আসছেন একদল মানুষ—মেলা আসন্ন। এই মসজিদের কাছে উত্তর পাহাড়ের ভূগর্ভে চিল্লার মধ্যে সাধুগণের উপাসনার স্থান ছিল। কাছেই আছে এক ফকির পাড়া। সন্দেহ নেই দীর্ঘকাল আগে থেকেই এখানে এঁরা বাস করেন।

কিন্তু এই প্রস্তরলিপি কি বখতিয়ার সমাধিলিপি? আরবি জানা ছিল না বলে বালুরঘাটে এসে একজনকে ধরে পড়িয়ে নিতে হল। না, তা নয়—এটি যে পীর আতাউল্লারই সমাধিস্থান তারই ইঙ্গিত আছে ওই লিপিতে।

তবে ওই দূর দুর্গম নির্বাসিত সমাধিভবনটি কার? সুলতান শাহ বোখারীর? পীরশাহ সাহাউদ্দীনের দরগা তবে কোন্‌টি? পীর নিমাই শাহের সমাধিটি কোথায়? বাণগড়ের ধ্বংসস্তূপে পীরশাহ বোখারীর নির্মিত মসজিদ আছে। আছে বালুরঘাট টাউনের তিন মাইল দক্ষিণে মহীসন্তোষ নামে এক ঐতিহাসিক স্থান, যেখানে বখতিয়ার দক্ষিণহস্তস্বরূপ শিরাণ

খিলজীর সঙ্গে যখন দিল্লি থেকে প্রেরিত সুবাদারের যুধ হয় রাজ্য অধিকার নিয়ে, তখন শিরণ এখানে আশ্রয় নেন। আছে এমন ইতস্তত ছড়ানো অংসখ্য প্রত্নচিহ্ন, জেলা গেজেটিয়ারে যার উল্লেখ আছে সংক্ষিপ্তাকারে।

না, কেউই এখন আর কৌতূহলী নন। ইতিহাস-বিমুখ বাঙালি বর্তমান নিয়ে অস্বাভাবিক ব্যস্ত। অথচ দেশের ইতিহাস আনুপূর্বিক না জানা থাকলে যে নতুন ইতিহাস রচনা করা প্রায় অসম্ভব, এ ধারণা করবার মতো শিক্ষা আমাদের বিদ্যালয়গুলো দেয় না। ফলে কিসের টানে এখানে ছুটে আসবেন তাঁরা। আজ আর রাজপ্রতাপের কোনো চিহ্ন নেই, নেই রাজছত্রের বিপুল বিস্তার। শোনা যায় না রণডঙ্কার বজ্রনির্ঘোষ!

কতদিন আগে হারিয়ে গেছে সেসব, কত জল বয়ে গেছে পুনর্ভবা দিয়ে।

শুনেছিলাম অবসরপ্রাপ্ত জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক শ্রীঅমলচন্দ্র চক্রবর্তীর কাছে—প্রায় বছর চল্লিশেক আগে এখান দিয়ে গোরুর গাড়ি করে বিদ্যালয়ে পরিদর্শনে যখন তিনি যেতেন, তখন তাঁকে গাড়ি থেকে নেমে হেঁটে যেতে বলতেন গাড়োয়ানেরা। এ অঞ্চলের মানুষ নাকি কেউই খাট-পালঙ্কে শুতেন না, মাটিতে বিছানা করতেন। কারণ এখানকার মাটির নীচেই তো চিরকালের মতো শয্যা পেতেছেন স্বয়ং সুলতান মহম্মদ-ই-বখতিয়ার খিলজী।

বুঝতে অসুবিধে নেই, তখনো মানুষের হৃদয়ের কিছুটা অংশ নিজের অধিকারে রাখতে পেরেছিলেন প্রবল প্রতাপান্বিত সেই তুর্কি নায়ক। কিন্তু আজ আর পারেন কিনা আমি জানি না। শুধু জানি, রাজাদের দিন শেষ হয়ে গেছে। রাজছত্র ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে মিশে গেছে মাটিতে। শুধু বিশাল বট আর অশ্বত্থ সমাধি-সৌধগুলোর দেওয়াল ফাটিয়ে এর রাজকীয় দম্ভ চূর্ণ করার প্রতিজ্ঞায় যেন ফণা মেলেছে মাথার ওপর। ঘন বাঁশবন এক দুর্ভেদ্য বেষ্টনী রচনা করে ঘিরে ধরেছে অসহায় এক সুলতানকে। এখানে, এই বরেন্দ্রভূমির মাটিতেই একদিন বাংলার প্রথম গণতান্ত্রিক নির্বাচনে সিংহাসনে এসেছিলেন গোপালদেব। এখানেই অত্যাচারী সম্রাট ২য় মহীপালের বিরুধে কৈবর্ত্য নায়ক দিব্বোকের নেতৃত্বে সাধারণ মানুষ জোটবধ হয়েছিলেন। এখান থেকে বেশিদূর নয় সেইসব পুণ্যস্থানগুলো।

আজ প্রকৃতি যেন তার প্রতীক হয়ে সেই পবিবেশই রচনা করছে। দেবীকোট নামের কোনো চিহ্নই নেই আর। সেই কোট বা দুর্ভেদ্য গড়বেষ্টিত প্রাসাদেব মহিমা লুটিয়ে পড়েছে ধুলোয়—অসংখ্য ছোটো ছোটো গ্রাম আর সাধারণ মানুষের সংঘবধ জীবন, আর তাদেরই রচিত এইসব বাঁশবনের ঘনবেষ্টনী আজ এক রাজধানীকে বিস্মৃতির অতলে নির্বাসিত করেছে।

অতীতের দেওকোট শুধু তার পরিষ্কার ছবি দেখায় বিভিন্ন গবেষকের লেখায়। বালুরঘাট কলেজের অধ্যাপক অচিন্ত্যকৃষ্ণ গোস্বামী 'দেওকোটের এক দরগা : দুই দিঘি : তিন লিপি' প্রবন্ধে লিখেছেন, 'নগরের নাম দেওকোট। বঙ্গ বিজয়ী তুর্কিবীর বখতিয়ার খিলজীর রাজধানীর দার-উল-মুলক্। তবে মিন হাজের বর্ণনা অনুসরণে বলতে হয়—প্রথম নয় দ্বিতীয় রাজধানী। সুরক্ষিত দেওকোট নগরেই তিনি স্থাপন করেছিলেন সেনানিবাস (দমদমা) এবং তা ধলদিঘি ও কালদিঘির পাড়েই। এখানকার বৌধবিহার এবং হিন্দুদের দেবীর মন্দিরে গড়ে উঠেছিল খানকাহ্, মুশাফিরখানা, মহাফেজখানা আর মাদ্রাসা। এখানেই তিনি ধর্মান্তরিত করেন মেচ উপজাতিদের প্রধানকে। ধর্মান্তরিত প্রধানের নাম হল আলি মেচ। তার কাছ থেকেই তিব্বত অভিযানের পথঘাট, প্রধান প্রধান শহব, বন্দর ইত্যাদি সম্পর্কে

সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করে দশ হাজার সৈন্য নিয়ে বখতিয়ার সুপরিচালিতভাবে তিব্বত অভিমুখে অগ্রসর হন এবং তিব্বত-ভুটান সীমান্তে পৌঁছন। পথে কামরূপরাজের 'পোড়ামাটি নীতি' এবং গেরিলা আক্রমণের ফলে সমরনায়ক মাত্র ১০০ জন সৈন্য নিয়ে কোনোরকমে দেওকোট ফিরে আসেন।'

লিখছেন মিন-হাজ-উদ্দিন সিরাজ : 'দেওকোটে ফিরে অত্যন্ত মানসিক যন্ত্রণায় রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন।... কেউ কেউ বলেন যে আলি মর্দান নামে তাঁর এক দুঃসাহসী ও দুর্ধর্ষ আমির ছিলেন। নারকোটি অঞ্চলের জায়গীর তাঁব ওপর ন্যস্ত ছিল। এই দুঃসংবাদ পেয়ে তিনি দেওকোটে আসেন। মহম্মদ বখতিয়ার তখন শয্যাশায়ী ছিলেন এবং তিন দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও কেউ তাঁর দর্শনলাভে সক্ষম হয়নি। আলি মর্দান কোনো উপায়ে তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর মুখের ওপর থেকে চাদর সরিয়ে ফেলেন এবং তাঁকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করেন।'

অচিন্ত্যবাবু জানিয়েছেন : 'নদীমাতৃক বাংলায় পুনর্ভবা নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এই সমৃধ জনপদ শুধু গুপ্তযুগ থেকে শাসনকেন্দ্র রূপেই নয়, ধর্ম-শিক্ষা-শিল্প-সাংস্কৃতিক কেন্দ্ররূপেও এই নগরের পরিচিতি ও মর্যাদা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। এই নগরে রাজন্যবর্গের নির্মিত পরিখাবেষ্টিত দুর্গ ছিল, ছিল রাজকীয় প্রাসাদ ও হিন্দু-বৌধদের মন্দির-বিহার, ছিল অনেক বড়ো বড়ো দিঘি। আর ছিল রাষ্ট্রের অধিকরণ গৃহ—কোষাগার সার্থবাহ বণিক নাগরিকদের বাসগৃহ, সৈন্য-সামন্তের আবাসস্থল। মন্দিরের শঙ্খ-ঘণ্টা ধ্বনিতে সন্ধ্যাবেলা মুখরিত হয়ে যেত নগরটি। তখন নগরের নাম ছিল দেবীকোট। পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্গত কোটিবর্যের সমৃধ নগর এই দেবীকোট। মৌর্যযুগ থেকে আরম্ভ করে বঙ্গদেশে যে কয়টি স্থানে নগরায়ণের কাজ শুরু হয়েছিল তার মধ্যে প্রাচীনতম মহাস্থানগড় (জেলা বগুড়া, বাংলাদেশ)। তারপরেই দেবীকোট (গঙ্গারামপুর, জেলা দক্ষিণ দিনাজপুর)। ... তুর্কি বিজয়ের অনেক আগে থেকেই দেবীকোট ছিল এক সমৃধ জনপদ। .... ১২০৫ খ্রিস্টাব্দের ১০ মে ... বখতিয়ার ইসলামের বিজয় পতাকা এখানকার মাটিতে প্রোথিত করে এবং দেবীকোট তুর্কিদের মুখের উচ্চারণে পরিবর্তিত রূপ নিয়ে বাংলার মানচিত্রে দেখা দেয় দেওকোট/দেবীকোট/দীওকোট রূপে। ... বখতিয়ার সুরক্ষিত দেওকোটে মসজিদ, মাদ্রাসা ও উপাসনালয় স্থাপন করেছিলেন। ধলদিঘির পারে আতাশাহ্ ফকিরের দরগার প্রশস্ত চত্বরে মসজিদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (মক্তব বা মাদ্রাসা) ও উপাসনালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যাদের অস্তিত্ব এখন আর দেখা যায় না।'

হ্যাঁ, আজ তার কোনো চিহ্ন নেই। দেওকোট এখন শুধু তুর্কি সেনানায়কের সমাধি ভূমিই, অতীতের সমৃধি আর বৈভবের সমাধিস্থান যেন। ইতিহাসের ক্রম-পরিণতির পথে আবার পা বাড়াই।

কিছুই যেন আর অবিশ্বাস্য মনে হয় না!

পাণ্ডুনগব/ফিরোজাবাদ/পাণ্ডুয়া

অতিথিপরায়ণ বঙ্গ কখনো অতিথিকে ফিরায়ে দেয় নাই।
.. সেদিন যে ইসলামের অর্ধচন্দ্র শোভিত পতাকা হাতে
করিয়া গৌড়ের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, আজ তাঁহারা আমাদের প্রতিবেশী
... বাঙ্গালা তাঁহাকে তাহার বুকের কাছে টানিয়া লইয়াছে।

—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ

অস্ত সূর্যের বিলীয়মান রক্তিম আলোর দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে গঙ্গার তীরে দাঁড়িয়েছিলেন মহারাজাধিরাজ লক্ষ্মণ সেন এবং তারই মহাসন্ধিবিগ্রহিক হলায়ুধ মিশ্র।

বৃদ্ধ হয়েছেন মহারাজ. গৌড় রাজ্যের জটিল রাজনীতি স্নায়ুকে বড়ো বেশি বিচলিত করেছে ইদানীং। তাই রাজধানী লক্ষ্মণাবতী ছেড়ে গঙ্গার তীরে নুদীয়ার প্রাসাদে সারাক্ষণ ধর্মচর্চায় নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছেন। অবশিষ্ট ক'টা দিন এভাবেই যদি কাটাতে পারেন তবেই পরমশান্তি। আত্মগত ভাবনায় তন্ময় হয়ে এই প্রশান্তিটুকু অনুভব করেছিলেন লক্ষ্মণ সেন। গঙ্গার বুক থেকে স্নিগ্ধ বাতাস ভেসে এসে তাঁর সারা শরীরে প্রগাঢ় মমতার হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই ওই গঙ্গার-ই বুকে জেগে ওঠা একটা অদ্ভুত দৃশ্যের আঘাতে চমকে উঠল তার মুগ্ধ চোখ।

একি আশ্চর্য ঘটনা ঘটে চলেছে তাঁর সম্মুখে। গঙ্গার প্রশান্ত বুকের ওপর হেঁটে আসছেন একজন ফকির। হ্যাঁ, স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে—হেঁটেই আসছেন, ধীর ও নির্ভুল পায়ে!

রোমাঞ্চিত বোধ করেন রাজা লক্ষ্মণ সেন। সঙ্গী হলায়ুধকে ইঙ্গিতে বলেন দৃশ্যটি দেখতে। দেখেছেন হলায়ুধও। তারপর ফকির যখন এপাড়ে পৌঁছে যান তখন স্ব-স্থানে তাঁর দিকে তাকিয়ে অভিবাদন জানাতে হয়েছে তাঁর। কিন্তু কিছু করার আগেই মহারাজকে প্রশ্ন করেন সেই ফকির :

—আপনি কে?

উত্তর দেন মহারাজ :

—আমি পৃথিবী পালক মহারাজাধিরাজ লক্ষ্মণ সেন।

সামান্য হাসেন সেই ফকির। বলেন :

—আপনি যদি পৃথিবী পালকই হবেন তবে ওই যে বকটি মাছ ধরেছে, ওকে মাছ ছেড়ে উড়ে যেতে বলুন।

বিব্রত বোধ করেন মহারাজ।

—তা কি করে হয়! বকটি তির্যকযোনি, ও আমার কথা শুনবে কেন?

ফকির তেমনিই হাসেন। বলেন :

—আমার কথা শুনবে। এই দেখুন :

বলেন আর যেন হুকুমই করেন। আর সত্যিই তখন বকটি মাছ ছেড়ে উড়ে চলে যায়। বিস্ময়ে, শ্রদ্ধায় অভিভূত বোধ করেন মহারাজ লক্ষ্মণ সেন। বিনম্র সম্ভাষণের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করেন :

—কে আপনি? কি আপনার পরিচয়?

তেমনিই বিনয়নম্র বচনে উত্তর দেন সেই ফকির :

আমি পীর জালালুদ্দীন তাব্রেজী। আনন্দিত মনে তাঁকে নিজের রাজসভায় নিয়ে আসেন লক্ষ্মণ সেন এবং ওই অলৌকিক ক্ষমতায় মুগ্ধ হবার স্বীকৃতি স্বরূপ পাণ্ডুয়ায় কিছু জমি দান করেন তাঁকে, যাতে নিশ্চিন্তে ধর্মচর্চা করতে পারেন জালালুদ্দীন। প্রীত হন পীর এবং মহারাজের দানের মর্যাদা রক্ষা করার জন্য প্রশস্ত এক মসজিদ নির্মাণ করেন পাণ্ডুয়ায়, আর ওই মসজিদ তৈরির সময় মাটি খুঁড়ে পাওয়া রত্নহার উপহার দেন রাজনটী বিদ্যুতলতাকে।

এই সেই পীর জালালুদ্দীনের মসজিদ। আমি এখন যার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছি। একটি ছোটো দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকতে হয়। ঢোকার মুখেই ছোটো একটি ঘরে চাঁদ খাঁয়ের সমাধি, যিনি ভাণ্ডারখানা তৈরি করেছিলেন পাণ্ডুয়ায়। আর একটু এগোলেই প্রশস্ত অঙ্গন, যার সামনে জামা মসজিদ এবং তার বাঁ-হাতি পুকুরের পড়ে লক্ষ্মণসেনী দালান। ডানদিকে হাজী ইব্রাহিমের সমাধি আর ভাণ্ডারখানা, যা পীর জালালুদ্দিনের দ্বিতীয় চিল্লাখান নামে প্রসিদ্ধ।

আমি প্রবেশ করি মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাসের সমাধিভূমিতে। কে জানে, পীব জালালুদ্দীনের পাণ্ডুয়ায় আগমনের সেই কাহিনি নিছকই হয়তো কল্পনার গল্প-কাহিনি! কিন্তু এই পাণ্ডুয়া একেবারেই বাস্তব এক ঐতিহাসিক স্থান। লোকে বলে—বহুকাল আগে মহাভারতের পাণ্ডবেরা অজ্ঞাতবাসের সময় এখানে এসেছিলেন বলেই তাদের নামে এই নাম। শুধু পাণ্ডুয়া নামেই নয়, আদিনা মসজিদের উল্টোদিকে ঘন জঙ্গলে ঢাকা সাতাশঘরা বা ইলিয়াসশাহি সুলতান সিকান্দার শাহের রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে রয়েছে যে পাণ্ডবরাজার দালান তাও পাণ্ডবদেরই স্মৃতির এক ভগ্নাংশ। আর ওই সাতাশঘরা দিঘিও নাকি মধ্যম পাণ্ডব অর্জুনেরই এক কৃতিত্বের সাক্ষী। বুকানন হ্যামিল্টন আর র‍্যাভেনশ-এর মতো ঐতিহাসিকেরাও এই কিংবদন্তীর উল্লেখ করেছেন তাঁদের গ্রন্থে। অনুমান করতে ভুল হয় না, পাণ্ডুয়া পাণ্ডববর্জিত জায়গা নয়, তখনও ছিল না—এখন তো নয়ই।

ইতিহাস জানিয়েছে, পাণ্ডুয়া ছিল পাঁচিল দিয়ে ঘেরা একটি শহর। কাছেই একডালা দুর্গ। শহরের কাছ দিয়ে বয়ে চলেছে মহানন্দা নদী। রেনেলের মানচিত্রও তারই সাক্ষ্য। পঞ্চদশ শতকে চিনা বণিক ইং ইয়াই সোং লান সুমাত্রা থেকে প্রথমে চট্টগ্রাম, সেখান থেকে সোনারগাঁ হয়ে পাণ্ডুয়ায় আসেন। চিনা বণিক সেং চে শেং লান আসেন ১৪১৫ সালে। তাঁদের বিবরণে জনপূর্ণ সমৃদ্ধ নগর পাণ্ডুয়ার যে ছবি আঁকা আছে, আজ পাণ্ডুয়ার মাটিতে দাঁড়িয়ে মনে হয় যেন গল্পের কল্পনা। লিখেছেন তাঁরা, শহরের পথের দু'ধারে ছিল বড়ো বড়ো বাড়ি আর বিপণীশ্রেণি। নানা ধরনের মূল্যবান বস্ত্র পাওয়া যায় সেইসব বিপণীতে। নাগরিকেরা প্রায় সবাই সোনার জরি বসানো ভেড়ার চামড়ার জুতো পরেন। মেয়েদের বসন রেশমের। হাতে

সোনার আংটি। গলায় মণিময় মালা। কোমরে ও পায়েও রত্নভূষণ। তাঁরা সংগ্রহ করেন মসলিন। কবে কালের স্রোতে ভেসে গেছেন সেই সব বিত্তবান পাণ্ডুয়াবাসীরা। সেই পর্যটকরাও আর নেই। বহুযুগ পরে তাঁদেরই একজন হয়ে যেন আমি এক পর্যটক আজ এসেছি একালের পাণ্ডুয়ায়।

মালদা শহর থেকে যে জাতীয় সড়ক মহানন্দার বুকের ওপর দিয়ে ওপারে গিয়ে পথিককে পৌঁছে দিচ্ছে শিলিগুড়ি বা বালুরঘাটে, সেই রাস্তা ধরে এগারো মাইল গেলেই চোখে পড়বে অতীতের পাণ্ডুয়ার শেষ সাক্ষী কয়েকটি মসজিদের নীরব অস্তিত্ব। আর রাস্তার দু'পাশে মাঝে মাঝে জেগে ওঠা বাদশাহী সড়কের কঙ্কাল। কৈশোরে আমি এই পথে গেছি বালুরঘাটে, তখনো পিচের রাস্তা হয়নি। খোয়ায় ভরা জীর্ণ পথে সেই যাত্রা তখন আরো অনেকখানি শক্তি নষ্ট করে দিত। এই পাণ্ডুয়াতেও দর্শনার্থীরা আসতেন মালদাকোর্ট স্টেশনে ট্রেনে। নামতেন একলাখি, আদিনা, নিমাসরাই বা পুরাতন মালদা স্টেশনে। এখন সেই দুঃসহ দিনের অবসান হয়েছে। অংসখ্য বাস ও ট্যাক্সি আর টমটম মিলবে মালদা শহর থেকে। যদিও টমটম কমে গেছে এখন। দেশ বিভাগের পর ছিন্নমূল মানুষেরাও এখন ঘর বেঁধেছেন পাণ্ডুয়া-আদিনায়। অতীতের পাণ্ডবদের মতো এ যুগেও তারা যেন ঘুরতে ঘুরতে ঘর বেঁধেছেন এই পাণ্ডুয়াতে।

হুগলি জেলাতেও আর একটি পাণ্ডুয়া আছে, আমি দেখেছি। পশ্চিমবাংলার অধিকাংশ মানুষই পাণ্ডুয়া বলতে হুগলির পাণ্ডুয়াকেই বোঝেন। অনেকেই মালদার এই আদি পাণ্ডুয়ার নাম-ই শোনেননি। অথচ ঐতিহাসিক গুরুত্বের দিক থেকে মালদার পাণ্ডুয়াই প্রসিদ্ধ। এই বিভ্রান্তি এড়াবার জন্যই কানিংহাম মালদার পাণ্ডুয়াকে 'হজরত পাণ্ডুয়া' নামে অভিহিত করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। পীর জালালুদ্দীন পারস্যের তাব্রীজ থেকে দিল্লি হয়ে এসেছিলেন এই পাণ্ডুয়াতে। মহারাজ লক্ষ্মণ সেন এখানকার ভূ-সম্পত্তি এবং এরই নিকটবর্তী দেওতলা গ্রামেরও কিছু অংশ তাঁকে দান করেছিলেন। এই সম্পত্তি বাইশহাজারী নামে খ্যাত। প্রতি বছর শাহ জালাল এবং আর একজন পীর নূল-কুতুব-উল আলমের স্মরণে মেলা বসে এখানে। দূরদূরান্ত থেকে ফকিরেরা আসেন। বহুযুগ পর কয়েকদিনের জন্য অতীতের পাণ্ডুয়ার আত্মা পুরনো বৈভব ফিরে পাবার জন্য যেন ছটফট করতে থাকে। এখন পাণ্ডুয়ায় মেলার সময় নয়, তবুও আমি অনুভব করি হাজার স্মৃতি ভরা অতীতের স্পন্দন। পুরনো দিনের গন্ধ এখনো ভেসে বেড়ায় এখানকার বাতাসে। আমার সামনে এখন জামা মসজিদ। শাহ জালাল যেখানে উপাসনায় বসতেন, সেখানেই এই মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন সুলতান আলাউদ্দিন আলি শাহ ১৩৪২ সালে। পরে গৌড়ের ফিরোজপুরের শাহ নিয়ামাতুল্লা এর সংস্কার করেন। এরই ভেতর এখন সংরক্ষিত আছে সেই রুপোর তৈরি পবিত্র ঝাণ্ডা। মসজিদের সম্মুখে চমৎকার খোদাই করা দুটি পাথরের স্তম্ভ আমার দৃষ্টিকে মুগ্ধ করে। কারুকার্য দেখে কোনো সন্দেহই থাকে না এগুলো হিন্দু মন্দির থেকে সংগৃহীত। এর পাশেই ভাণ্ডারখানা, পীর জালালউদ্দিনের দ্বিতীয় আস্তানা। কাহিনি বলে—যখন তার গুরু শেখ শিহাবুদ্দিন পাণ্ডুয়ায় এসেছিলেন তখন নাসুয়া শাহ জালাল তাঁর উপাসনার স্থানটি তাকে ছেড়ে দেন এবং শিহাবুদ্দিন চলে যাবার পর ওই আসন তিনি আর ব্যবহার করেননি শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসেবে। এর উল্টো দিকে লক্ষ্মণসেনী দালান। কে জানে, কেন এই দালানে লক্ষ্মণ সেনের নাম যুক্ত আছে! ইতিহাস

আর কিংবদন্তী একাকার হয়ে ছড়িয়ে আছে পাণ্ডুয়ার মুক্ত বাতাসে। ওই তো সেই রসুইখানা! যেখানে শাহ জালালই স্বয়ং রান্না করতেন। আর ওই তো সেই সেলামী দরওয়াজা। যেখানে বসে শাহ জালাল উপদেশ দিতেন। এর পাশে পুরনো নিমগাছটি এক মমতাময় ছায়ার-মায়ায় ঢেকে দিয়েছে ওই জায়গাটি। লোকে বলে শাহজালালের ব্যবহৃত কয়েকটি দাঁতনকাঠি থেকেই গাছটির জন্ম। এরই কাছে ছিল গুল-ই-চিন নামে এক পুষ্পিত গাছের শাখা, যার ফুল জালালউদ্দিনের আসনে ঝরে পড়ত শ্রদ্ধায়।

সেই কবে হারিয়ে গেছে সামান্য এক বৃক্ষের অসামান্য শ্রদ্ধার অর্ঘ। কিন্তু আজও পাণ্ডুয়ার মানুষ মনে রেখেছে তার কথা। মনে রেখেছে ওই বড়ো দরজার অভ্যন্তরে সযত্নে রক্ষিত সংস্কৃত ভাষার এক পুঁথির কথাও। ১৮৯২ সালেও ছিল সেই পুঁথি। তৎকালীন জেলাশাসক ইউ. সি. বটব্যাল এক চমকপ্রদ কাহিনিরও উল্লেখ করেছেন তাঁর বিবরণীতে। বহুকাল আগে কিঙ্করনারায়ণ চৌধুরী নামে একজন হিন্দু রাজকর্মচারি ছিলেন পাণ্ডুয়ায়। বিশেষ এক অপরাধে তাঁকে গ্রেপ্তার করে ঢাকায় কারারুদ্ধ করা হয়। একদিন রাতে প্রার্থনার পর স্বপ্ন দেখেন তিনি। গঙ্গাদেবীর কাছে তাঁর প্রয়োজনীয় কাগজপত্র আছে এবং সেগুলো নকল করে আসলগুলোকে আবার গঙ্গাগর্ভেই দিয়ে দিতে হবে। সেই মতো নবাব পরেরদিন গঙ্গার তীরে কিঙ্করনারায়ণের সঙ্গে একজন অন্য লোককে পাঠান এবং সত্যই দেখা যায় স্রোতের তরঙ্গে ভেসে যাচ্ছে দুটি পুঁথি। সেগুলোর নকল করা হয়। কিঙ্করনারায়ণ মুক্তি পান এবং নবাব এক লক্ষ টাকা দেন দানের জন্য। সেই পুঁথির নকল অনেকদিন পর্যন্ত যত্ন করে রাখা ছিল পাণ্ডুয়ার এই মসজিদে। শ্রীপঞ্চমীর সময়ে একজন ব্রাহ্মণ এসে তার পুজো করতেন, তালপাতায় লেখা সেই পুঁথির চিহ্ন আজ আর নেই। কিন্তু পবিত্র সেই স্মৃতি অ-মলিন অক্ষরে লেখা আছে পাণ্ডুয়ার ইতিহাসের পাতায়। ইতিহাসের অনুমান, ওই পুঁথিরই নাম শেখ শুভোদয়া। আমি যেন সেই পাতায় পাতায় অশরীরীর আত্মার মতো বিচরণ করি, পায়ে পায়ে পৌঁছই এবার ছোটো দরগায়। এখানে আছে আর একজন সাধক নূর-কুতুব-উল-আলম এবং তাঁর পিতা আলাউল হকের সমাধি। পিতাপুত্র দু'জনেরই আধ্যাত্মিক জগতের দু'জন প্রখ্যাত পুরুষ। আলাউদ্দিন হক গৌড়ের প্রসিদ্ধ পীর আখি সিরাজুদ্দিনের সার্থক উত্তরাধিকারী ছিলেন।

আর পুত্র নূর-কুতুব যে কত বড়ো সাধক ছিলেন, সেই কাহিনির সাক্ষী হিসেবে আজও তাঁর সমাধি ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে চারটি লাল পাথরের স্তম্ভ আর ওই সমাধির পাশের পঞ্চম স্তম্ভটি।

আমি যেন মুহূর্তের মধ্যে কল্পনায় দেখি—নূর-কুতুব আলম ক্ষৌরকার্যে বসে কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছেন এবং হঠাৎই ক্ষৌরকারকে চমকে দিয়ে হুকুম করছেন কাজ বন্ধ করে চোখ বুজে বসে থাকতে! বিভ্রান্ত ক্ষৌরকার সভয়ে তাই করল। আর কিছুক্ষণ পর নূর-কুতুবেরই আদেশে চোখ খুলে সবিস্ময়ে দেখতে পেল সাধকের দু'হাত ভরে গিয়েছে জলে। বিস্মিত হয় ক্ষৌরকার। কৌতুহলে ব্যাগ্র হয়ে ওঠে। এই আশ্চর্য কাণ্ড ঘটল কিভাবে! নূর-কুতুব হাসেন, কিছু বলেন না। শেষে অনেক উপরোধ-অনুরোধের পরে বলেন—কিছুক্ষণ আগে একজন পারস্য দেশীয় এক ব্যবসায়ীকে সমুদ্রবক্ষের ঝড় থেকে তিনি মন্ত্রবলে বাঁচালেন। হাতে তাই সমুদ্রের জল লেগে রয়েছে। অবিশ্বাস্য এই কাহিনি সত্যবলে প্রমাণিত হয়। সেই বণিক ভারতে এসে নূর-কুতুবের সঙ্গেই প্রথমে দেখা করেন এবং ওই পাঁচটি স্তম্ভ উপহার দেন। তার সমাধি আজও পাণ্ডুয়াতে আছে।

সামনে ওই জল টলটল করছে মিঠে পুকুরের, ওর গভীরেও লুকোনো আছে এমন আর একটি অলৌকিক গল্প। একবার এক হিন্দু যোগী নুর-কুতুবকে একটি পরশপাথর উপহার দেন। কিন্তু তিনি তা ওই পুকুরের জলে ফেলে দেন। আর হিন্দু যোগী তা পুনরুদ্ধারের জন্য পুকুরে নামলে সবিস্ময়ে দেখেন অনেক পরশপাথর সেখানে রয়েছে। যাই হোক, পরে অতিকষ্টে তিনি নিজেরটিকে উদ্ধার করেন।

এইসব গল্পের শব্দ এখনো বেজে চলে ওই জলের ঢেউ-এর কলরোলে। এই যে মুসাফিরখানার সামনে দুটো বড়ো তামার ডঙ্কা রয়েছে—এগুলো এখন অতিথিদের খাবার দেবার সময় আর বাজে না, তবুও এর ভেতর নীরব হয়ে আছে অতীতের বৈভব আর বিত্ত, প্রথা ও জীবনযাত্রার বিচিত্র ধ্বনি। আমি কান পাতলে আজও যেন স্পষ্ট শুনি সেই ভাষা। সেই শব্দের অনুরণন বাজতে থাকে পাণ্ডুয়ার সোনা মসজিদ বা কুতুবশাহী মসজিদের মিনারে। আর সেই অব্যক্তস্বর নিদারুণ এক বেদনার মতো গুমরে উঠছে একলাখী মসজিদের অভ্যন্তরে।

এই সেই সুবিখ্যাত একলাখী! মসজিদের সামনে দাঁড়িয়ে আমি অভিভূত চোখে দেখতে থাকি পোড়ামাটির অভূতপূর্ব অলঙ্করণ। পশ্চিমবাংলায় যেমন বিষ্ণুপুর আঁটপুর টেরাকোটা কাজের জন্য পরিচিত—উত্তরবাংলায় তার সঙ্গে পাল্লা দেবার মতো সৌন্দর্য সারা অঙ্গে ধরে রেখেছেন একমাত্র ওই একলাখী মসজিদ আর গৌড়ের তাঁতিপাড়া মসজিদ। প্রতিটি ইটের গায়েই কারুকার্য, প্রত্যেকটির থেকে প্রত্যেকটি আলাদা। কি বিপুল শ্রম, দক্ষতা আর শিল্পচেতনা এর ওপর ব্যয়িত হয়েছে, ভাবলে বিস্ময়ে এবং শ্রদ্ধায় মন ভরে ওঠে। আর অর্থব্যয়ও কি কম হয়েছে!

১৪১২ সালেই এটি তৈরি করতে লেগেছিল এক লক্ষ মুদ্রা। তাইতো এর নাম একলাখী। ইতিহাস অনুমান করে, এই সুদৃশ্য মসজিদের তোরণদ্বারে এবং দেওয়ালে হিন্দু দেবদেবী মূর্তির চিহ্ন বিকৃত হয়ে এখনো স্পষ্টভাবেই প্রমাণ করছে, এই মসজিদটি আসলে হিন্দুদের তৈরি এবং তৈরি করেছেন পাণ্ডুয়ার একমাত্র হিন্দুরাজা গণেশ। এই একলাখী মসজিদই ছিল রাজা গণেশের রাজদরবার, পরবর্তীকালে যা রূপায়িত হয়ে যায় এক সমাধিভূমিতে এবং এখানে সমাহিত আছেন রাজা গণেশেরই ধর্মান্তরিত পুত্র যদু জালালউদ্দিন, তাঁর বেগম আসমান তারা এবং পুত্র আহম্মদ।

বাংলার ইতিহাসের এক বিচিত্র অধ্যায়ের সাক্ষী এই একলাখী মসজিদ। 'রিয়াজ-উস-সালাতীন' আর 'তারিখ-ই-ফিরিশতা'র পাতায় পাতায় লেখা আছে সে ইতিহাস। রিয়াজ বলে—রাজা গণেশ একদিন এমন একটি ঘরে বসেছিলেন যার দরজার উচ্চতা খুব কম। সকলকে মাথা নীচু করে ঢুকতে হত। দরবেশ শেখ বদর-উল ইসলাম এই হিন্দু রাজার কাছে মাথা নীচু করে না ঢুকে প্রথমে পা ঢুকিয়ে তারপর ঘরে ঢোকেন। একলাখীর ছোটো দরজাটি দেখে এই ঘটনাটি যেন চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত মুসলমান শাসনাধিকারে ছিল বাংলা। এরই মাঝখানে পঞ্চদশ শতাব্দীতে চকিত বিস্ফোরণের মতো দিনাজপুর ভাতুরিয়ার জমিদার গণেশ, দনুজমর্দ্দন দেব, মুসলমান ঐতিহাসিকদের ভাষায় কংসরায় সামরিক শক্তির বলে ইলিয়াস সাহি সুলতান আলাউদ্দিন ফিরোজশাহকে অপসারিত করে বাংলার রাজা হয়েছিলেন।

তখনো প্রধান দরবেশ নূর-কুতুবের ক্ষমতা অম্লান ছিল। রাজা গণেশের সঙ্গে স্বভাবতই তার বিরোধ বেঁধে ওঠে। নূর-কুতুব গূঢ় চক্রান্তে গণেশপুত্র যদুকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করেন। গণেশের রাজসভায় প্রকাশ্যে বদর-উল-ইসলাম মহারাজকে অভিবাদন না করে ঘোষণা করেন—'শিক্ষিত লোক বিধর্মীকে অভিবাদন করেন না।' ক্রুদ্ধ গণেশ তাঁকে হত্যা করেন এবং সমগ্র পাণ্ডুয়াতে তারপর এক ত্রাসের শাসনে অন্যান্য দরবেশ এবং উলেমাদের জলে ডুবিয়ে বধ করেন। বুকাননের বিবরণ, রিয়াজের পাতা থেকে সেই মর্মান্তিক কাহিনির আর্তনাদ এখনো ভেসে ওঠে। নূর-কুতুবও নিষ্ক্রিয় থাকেন না। তাঁর ক্ষোভের কথা লিপিবদ্ধ করেন এক চিঠিতে :

'ঈশ্বরের কি অদ্ভুত লীলা! হাজার হাজার ধার্মিক এবং শিক্ষিত লোক আজ চারশো বছরের জমিদার এক বিধর্মীর অধীনস্ত হয়েছে।'

জৌনপুরের তৎকালীন রাজা ইব্রাহিম শর্কীর সাহায্য প্রর্থনা করেন নূর-কুতুব। সসৈন্যে এগিয়ে আসেন শর্কী। গণেশ বাধ্য হয়ে সিংহাসন ত্যাগ করেন। নূর-কুতুব ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করে যদু জালালউদ্দিনকে সুলতান পদে অভিষিক্ত করেন। 'রিয়াজ-উস-সালাতীন-এর ভাষায়—'বাংলায় ইসলামের আইন-কানুন জারি হল।'

এই সময়েই সুদূর চিনদেশ থেকে এসেছিলেন ফেই-শিন সম্রাট য়ুংলোর পাঠানো একজন প্রতিনিধির সাথে। তাঁর লেখা 'সিং-ছা-শ্যং-লান' গ্রন্থে আছে :

'প্রধান দরবারে দামী পাথরে খচিত উঁচু এক সিংহাসনে পায়ের ওপর পা রেখে রাজা বসেছিলেন। তার কোলের ওপর ছিল দু'দিকে ধারযুক্ত তলোয়ার।... সুলতান রাজা প্রতিনিধিদের ভোজসভায় আপ্যায়িত করলেন। ভোজসভায় সোনার আধারে রাখা সোনার পাতের ওপর লেখা বাণী দিলেন চিন সম্রাটকে দেবার জন্য।

প্রাসাদটি সাদা রং করা। ছাদ সমতল। কয়েকটি সিঁড়ি অতিক্রম করে প্রাসাদের দরবার কক্ষে যাওয়া যায়। দরবারের ভেতরে দরজা আছে। চকচকে পিতল দিয়ে ঢাকা স্তম্ভ আছে অনেক। স্তম্ভের গায়ে ফুল, পাখি, পশুদের ছবি খোদাই করা। দরবারের সামনে বড়ো বারান্দা। তার দু'পাশে অস্ত্র-সজ্জিত সৈন্যরা।'

আজ কোথায় হারিয়ে গেছে সেই পর্যটকদের পদচিহ্ন! পঞ্চদশ শতাব্দী পার হয়ে অনেক সময় গড়িয়ে গেছে পাণ্ডুয়ার ওপর দিয়ে। ১৮০৮ সালে বুকানন হ্যামিলটন এসেছিলেন পাণ্ডুয়ায়। চিনা পর্যটকদের পথ অনুসরণ করেই তিনি এসেছিলেন এখানে। কিন্তু চিনা পর্যটকদের বর্ণনায় আঁকা সেই সমৃদ্ধ গৃহ বা বিপণী শ্রেণি তখন ধ্বংসস্তূপমাত্র। শহরের মাঝখানে একটি তিন-খিলানযুক্ত সাঁকো আছে। শহরের বাইরে দেওকোটের দিকে আছে নগর প্রাকার, প্রবেশদ্বার। পশ্চিম দিকে অনুরূপ প্রাকার। অনুমান করেন বুকানন—পাণ্ডুয়া থেকে মালদা পর্যন্ত ছিল এই নগরের শহরতলি।

কানিংহাম উনবিংশ শতাব্দীর পাণ্ডুয়ার ধ্বংসাবশেষ দেখে সিদ্ধান্ত করেছিলেন, এই শহরের আয়তন ছিল লম্বায় সাড়ে চার মাইল ও চওড়ায় দুই মাইল। কিন্তু জনাকীর্ণ বৈভবপূর্ণ এই রাজধানী পরে সরে যায় গৌড়ে। ঐতিহাসিকদের অনুমান হয়তো বা মহানন্দা নদী দূরে সরে যাবার ফলেই এই পরিবর্তন। পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি থেকে এই স্থানান্তকরণ ঘটতে থাকে। পাণ্ডুয়া তখন হয়ে ওঠে শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় শহর,

হজরত পাণ্ডুয়া। দেশি-বিদেশি পর্যটকদের আনাগোনা কমতে থাকে। অবশেষে এক সময় বিলুপ্তির পথে হারিয়ে যায় পাণ্ডুয়া! বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে আমি এক অখ্যাত পর্যটক এই একলাখীর সম্মুখে দাঁড়িয়ে কল্পনায় যেন ছায়াছবির মায়া দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেছি। পাণ্ডুয়ার এরপরের ইতিহাস আরো বৈচিত্র্যময়। তরবারির শোণিতাক্ত চমকের ঘটনা। নূর-কুতুবের মৃত্যুর সুযোগ নিয়ে রাজা গণেশ আবার জালালউদ্দিনকে হিন্দুধর্মে দীক্ষিত করে নিজে সিংহাসনে বসেছেন। সুবর্ণ নির্মিত গাভীর মুখ দিয়ে জালালউদ্দিনকে প্রবেশ করিয়ে অধোদ্বার দিয়ে তাকে বের করে যদুতে ধর্মান্তরিত করা হয়। কিন্তু প্রধান ইমাম বসবার পাথরের মিম্বার সম্মুখের বিশাল অঙ্গন আমাকে মুহূর্তের মধ্যে যেন অতীতে প্রোথিত করে দেয়। না, কোনো রাজকীয় সমারোহ আর নেই, বেগমেরা অবগুণ্ঠনের আড়াল থেকে সকৌতুহলে লক্ষও করেন না কোনো আগন্তুককে, মিম্বার থেকে কোনো ইমামও প্রার্থনার বাণী আর উচ্চারণ করেন না। সমগ্র পাণ্ডুয়ার নাগরিক শুক্রবারের নামাজ পড়তে আর সমাবেত হন না আদিনা মসজিদ প্রাঙ্গণে—আজানের ধ্বনি আর ছড়িয়ে পড়ে না বাতাসে। শুধু ইতস্তত আড়াল থেকে স্তূপীকৃত বিরাট বিরাট পাথরের কারুকার্যমণ্ডিত স্তম্ভ আর খণ্ড খণ্ড অংশ গভীর হতাশায় মূক হয়ে অবলুপ্তির প্রহর গুনছে। যদু নয়, জালালুদ্দীনও নয় এখন আমার মতো সাধারণ মানুষের-ই আনাগোনা এখানে।

যদুর হৃদয় তখন মুসলমান ধর্মে অনুরক্ত হয়ে গিয়েছে। সে কাহিনি রিয়াজ-এ নেই। 'তারিখ-ই-ফিরিশতা'-ও বলেনি সেকথা। শুধু পাণ্ডুয়ার এক গ্রাম্য কবির লেখা 'ফুলজানি নামা' নামে এক গ্রন্থ আজও বলে—যদু এই পাণ্ডুয়াবই এক মুসলমান রমণী ফুলজানির প্রণয়াশক্ত হয়ে তাঁকে হৃদয়ের আসমান তারা করে নিয়েছেন। তাই বন্দি যদু ভৃত্যদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে একদিন পিতাকে হত্যা করতেও দ্বিধা করেননি। কিন্তু এখানেও এ বিচিত্র ঘটনা শেষ হয়নি। আবার এক চক্রান্তে জালালউদ্দিনকে হত্যা করা হয়, সিংহাসনে বসানো হয় তার শিশুপুত্র আহম্মদকে। ভাতুরিয়ায় শ্বশুরের ভিটেয় চলে যান আসমান তারা। শোনা যায়, সেখানে নাকি হিন্দু বিধবার মতো নৈষ্ঠিক জীবনযাপন করেন শেষদিন পর্যন্ত—শুধু এই অভিলাষ নিয়ে, যেন মৃত্যুর পর তাকে সমাহিত করা হয় তার স্বামীর পাশে ওই একলাখীতে। হ্যাঁ, তার সেই অভিলাষ পূর্ণ হয়েছিল। এই তো সেই একলাখী! যেখানে সমস্ত চঞ্চলতার অবসানের পর স্তব্ধ বেদনার মতো জেগে আছে পাশাপাশি তিনটি সমাধিভূমি—জালালউদ্দিন, আসমান তারা আর তাদের সন্তান আহম্মদ।

কোথায় সেই গোয়ালপাড়ার মাঠ! যেখানে সিকান্দার শাহের সঙ্গে প্রচণ্ড যুধ হয়েছিল তাঁরই প্রিয় পুত্র গিয়াসুদ্দিন আজম শাহের! আমি জানি না। শুধু সেই যুধক্ষেত্রে বর্শাবিদ্ধ সিকান্দারের সঙ্গে আজম শাহের অশ্রুসজল শেষ সাক্ষাৎকারের ছবিটি যেন পাণ্ডুয়ার বাতাসে ভেসে বেড়ায়। ভাসে সেই কথাগুলো, যা বলেছিলেন সিকান্দার—আমার জীবনের কাজ শেষ হয়েছে, এ রাজ্য তোমার, রাজা হিসেবে তুমি সমৃধি লাভ করো।

হ্যাঁ, সমৃধিশালী সুলতানই হয়েছিলেন গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ! ইলিয়াস শাহ আর সিকান্দার শাহের তৈরি সুবিশাল প্রাসাদে অত্যন্ত সুখেই তিনি রাজত্ব করছিলেন। প্রজানুরঞ্জক ছিলেন তিনি। আর ইতিহাস তাঁর এক চমকপ্রদ গুণেরও উল্লেখ করে—কবি ছিলেন সুলতান আজম শাহ। একবার তাঁর কঠিন অসুখের সময় হারেমের সর্ব, গুল ও টিউলিপ

নামে যে তিনটি মেয়ে তাঁর সেবা করেছিল, আরোগ্য লাভের পর তাদের উদ্দেশ্যে ফারসিতে তিনি একটি কবিতার চরণ রচনা করলেন :

'সাকী! এ সেই সর্ব, গুল আর টিউলিপের গল্প।' কিন্তু পরের ছত্রটি রচনা করতে গিয়ে কল্পনা ব্যর্থ হল তাঁর। কোনো সভাকবিও তাঁকে সাহায্য করতে পারলেন না। তখন তিনি ইরানের শিরাজ শহরের প্রসিধ কবি হাফিজের কাছে দূত পাঠালেন কবিতার সম্পূর্ণ শরীর নির্মাণের জন্যে। কবি হাফিজকে তিনি পাণ্ডুয়ায় আসার আমন্ত্রণও জানালেন। সেই আমন্ত্রণে সাড়া দিয়েছিলেন হাফিজ। নিজে আসতে না পারলেও কবিতাটি সম্পূর্ণ করে পাঠিয়েছিলেন। 'রিয়াজ-উস-সালাতীন' আর 'আইন-ই-আকবরী' এই অপূর্ব ঘটনার কথা বুকে ধরে রেখেছে।

ইতিহাস নীবব হয়ে গেছে পাণ্ডুয়ায়। শুধু এই দারুণ দ্বি-প্রহরে কোথায় যেন ক্লান্ত এক ঘুঘু পাখির ডাক অবিরাম গুমবে ওঠা কান্নার মতো ছড়িয়ে পড়ছে পাণ্ডুয়ার বাতাসে— আর একলাখী যেন কান পেতে শুনছে সেই কান্না।

আমি বিষণ্ণ পায়ে এগোতে থাকি। কত যুগের কত ঘটনার স্মৃতি রেণু রেণু হয়ে মিশে আছে পাণ্ডুয়ার ধুলোয়। এবার আমার সামনে বিশাল আদিনা মসজিদ যেন পথরোধ করে দাঁড়ায়। ভারতের সবচেয়ে বড়ো মসজিদগুলোর মধ্যে আয়তনের দিক থেকে এটি দ্বিতীয়— সিকান্দার শাহ তৈরি করেছিলেন এই মসজিদ। ওই তো সিকান্দারের কক্ষ! যা এক দুঃখ-বেদনায় মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। রাজা গণেশ কিছুকাল একে কাছারিবাড়ি হিসেবে ব্যবহার করেন—তাই কি মসজিদের দেওয়ালগুলোতে হিন্দু দেবদেবীদের এত মূর্তি! কোনো হিন্দুমন্দিরের ভগ্নাবশেষ দিয়ে তৈরি কি না তাই বা কে জানে! এসব ঐতিহাসিক গবেষণা আমার বিস্ময়কে আহত করে না। অতি অপূর্ব কারুকার্যমণ্ডিত বাদশাহ্-কি-তখত্ পাথরের কারুকাজ আমাকে অভিভূত করে।

আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি সেই সুবিশাল প্রাসাদের সামনে, যা ভেঙেচুরে, ঘন জঙ্গলের হিংস্র নখে ফেটে চৌচির হয়ে এক অদ্ভুত বিকৃতমূর্তির ভগ্নাবশেষ হয়ে কোনোক্রমে যেন দাঁড়িয়ে আছে।

এখানে এসেছিও এক বিচিত্র উপায়ে। আদিনা মসজিদের এলাকা ছাড়ালেই জাতীয় সড়ক। আগেই শুনেছিলাম, তারই উল্টোদিকে ঘন অরণ্যে ঢাকা আছে 'সাতাশঘরা'।

সহযাত্রী গৌরীশঙ্করকে ডেকে বললাম :

—যাবেন তো দেখতে?

জানতাম সাহসের অভাব অনেক দুর্লভ-দর্শন জিনিসের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ থেকে বঞ্চিত করে মানুষকে। কাজেই যা হয় হোক ভেবে রওনা হওয়া গেল। কিছুদূর এগোতেই দেখি একটি রাখাল বালক কাস্তে হাতে ঘাস কাটছে। পথনির্দেশ চাইতেই সে জানাল—সাপ আছে, বাঘ থাকাও বিচিত্র নয়। তবুও সে যেতে রাজি। তাকেই কাণ্ডারী করে হুঁশিয়ার হয়ে এগোনো গেল। সে চলেছে বন কাটতে কাটতে, গা ছমছম ভাব নিয়ে তার পিছু পিছু আমরা। অবশেষে বনের গভীরতম অংশে এসে থমকে দাঁড়ালাম। সম্মুখে এক গভীর দিঘি, কালো হয়ে গেছে জলের রঙ—বহুযুগের ওপার থেকে ম্লান চোখ মেলে তাকিয়ে আছে আগন্তুকের দিকে। কেন এর নাম সাতাশঘরা কে জানে! তবে কি এই প্রাসাদে

সাতাশটি কক্ষ ছিল? আট কোণা এক দালানের ভগ্নাংশের গায়ে কোনো বৈভব আর সৌন্দর্যের চিহ্নমাত্রও এখন আর নেই। বট আর অশ্বত্থের চারা তার পাঁজর ফাটিয়ে ক্রমশ মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। বিশ্বাস হয় না, কল্পনা করতে গিয়েও মন থৈ পায় না যে, এই প্রাসাদেই ছিল গিয়াসুদ্দিনের সেই হারেম! একদিন এখান থেকেই তাঁর দূত গিয়েছিলেন ইরানে কবি হাফিজের কাছে! এখান থেকেই আজম শাহ গিয়েছিলেন সেই কাজীর কাছে যিনি সুলতান বলে তাঁকে শাস্তি দিতে কুণ্ঠিত হননি। কোথায় কবে হারিয়ে গেছে সেইসব মানুষেরা, আর সেইসব ঘটনার ঘনঘটা! পাণ্ডুয়ার এই সাতাশঘরার বাতাস তার চাপা দীর্ঘশ্বাসে যেন ফিসফিস করে। সেই পথপ্রদর্শক রাখাল বালকটি বলল—ওই পুকুরের ধারে নেমে দেখুন, দরজা আছে। সংবাদ বিস্ময়কর। গৌরীবাবু এবং আমি অনেক পরিশ্রম এবং সতর্কতা নিয়ে নামলাম। পা ফসকে গেলেই মুহূর্তের মধ্যে হারিয়ে যাব প্রায় সাতশো বছরের গভীর জলের ভেতর। নেমে দেখলাম সত্যিই আশ্চর্যবোধ করার মতো দৃশ্য। পরপর প্রায় আটটি দরজা, সময়ের পলি পড়ে বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যায়। অনুমান করতে ভুল হয় না, হারেম থেকে বেগমরা আসতেন এই পথে স্নানের জন্যে। মনে পড়ল, দিল্লির প্রসিদ্ধ হাউজ-ই-সামসির অনুকরণে এটি তৈরি হয়েছিল। কেউ কেউ বলেন, তেরশো চুয়ান্ন সালে দিল্লিশ্বর ফিরোজ শাহের বঙ্গাভিযানের অন্যতম কারণও ছিল তৎকালীন বঙ্গের ইলিয়াস শাহের এই স্পর্ধার নিদর্শনটি। বিস্মিত চোখ নিয়ে উঠে আসি। এবার রাখাল বালক ওই প্রাসাদ এলাকায় দক্ষিণ-পূর্ব দিকের পাণ্ডবরাজা দালানের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। আগেই লিখেছিলাম, পাণ্ডুয়া নামটির সাথেই জড়িয়ে আছে পাণ্ডব রাজাদের স্মৃতি। কে জানে পৌণ্ড্রবর্ধনের ছায়াও লুকিয়ে আছে কিনা এর গভীরে! পাণ্ডুয়ার মানুষেরা আজও বলেন, এই পাণ্ডব রাজা দালানের সামনের পুকুরটিই নাকি মধ্যম পাণ্ডব অর্জুনেরই কৃতিত্বের সাক্ষী। সে যাই হোক, পাণ্ডুয়ার মাটির বুকে এমন একটি কাহিনির কথা আজও অনেক দিঘিই বলে চলেছে। ওই আটবাঘ দিঘি, নাসিরশাহ দিঘি, সুখনদিঘির বুকে বহু ইতিহাস এখনো ঘুমিয়ে আছে। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ একটু সযত্ন প্রচেষ্টা করলেই বাংলার ইতিহাসের অনেক গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন পাবেন এই প্রাসাদ সংলগ্ন এলাকাগুলোতে—এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এ বিষয়ে আমি আমাদের মাননীয় পূর্তমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই উদ্যমটুকু দেখানো আমাদের জাতীয় কর্তব্য। নইলে একদিন পাণ্ডুয়ার ইতিহাস থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এই প্রাসাদ এলাকার সম্ভাবনাময় নিদর্শনগুলো।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগ ও পূর্তবিভাগের উদ্যোগে খননকার্য হয় এবং ভূগর্ভ থেকে আত্মপ্রকাশ করে ইলিয়াস শাহের সেই বিখ্যাত স্নানাগার। প্রায় সাতাত্তর বছর আগে বুকানন হ্যামিল্টন প্রথমে তাঁর 'ডেসক্রিপশন অব দিনাজপুর' গ্রন্থে এই স্নানাগারের একটি বিশদ বিবরণ দেন। একশো কুড়ি গজ দৈর্ঘ্য ও আশি গজ চওড়া একটি পুকুরের উত্তর-পশ্চিম কোণে একটি ছোটো অট্টালিকা... দেওয়ালে আছে জল চলাচল করার পথ, পোড়ামাটির নল। পুকুর থেকে অট্টালিকায় প্রবেশের মধ্যে আছে কয়েকটি গোপন পথ। কানিংহাম এই মত সমর্থন করে জানিয়েছেন—এটি হল প্রাসাদের গোশলখানা টার্কিশবাথ, দিল্লির সুলতানদের তুর্কি-স্নানাগারের অনুকরণে তৈরি। এই স্নানাগারকে ঘিরেই দিল্লির ফিরোজ শাহের বাংলা অভিযান, যার বিবরণ আছে জিয়াউদ্দিন বারণীর 'তারিখ-ই-

ফিরোজশাহী', 'সামশ-ই-সিরাজ', 'সিরাৎ-ই-ফিরোজশাহী' প্রভৃতি গ্রন্থে। সেসব ঘটনা কবে নীরব হয়ে গেছে পাণ্ডুয়ার বাতাসে। ভাষা হারিয়েছে এই স্নানাগারও। আমার বার বার মনে হতে থাকে, আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্‌দের একবার এখানে এসে দেখে যাওয়া উচিত, কিভাবে বিদ্যুৎশক্তি ছাড়াই এ ধরণের ঠাণ্ডা ও গরম জলের স্রোত স্নানাগারে আনা সম্ভব—সরকারেরও উচিত একে বিশেষ যত্ন নিয়ে রক্ষা করা।

স্নানাগারের শীর্ষে উঠলে চোখে পড়ে জাতীয় সড়কের প্রায় কাছাকাছি একটি মিনারশীর্ষ। গৌড়ের ফিরোজ মিনার দেখেছি, দেখেছি পুরনো মালদার নিমাসরাই স্তম্ভও। কিন্তু এ মিনারটির কথা তেমনভাবে কেউই লেখেননি। শুধু আবিদ আলি তাঁর 'মেময়ার্স অব্ গৌড় অ্যান্ড পাণ্ডুয়া' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এই মিনারের কথা। সন্দেহ করেছেন তিনি, হয়তো এটি একটি মসজিদের মিনার। সঙ্গী অরূপ সিংহ, অনিন্দ্য, সুমন্ত, তড়িৎ, অপূর্ব সহ জলের ক্ষেত ভেঙে উঁচু-নীচু আলপথ মাড়িয়ে আমরা পৌঁছলাম মিনারের কাছে। চাষরত একজন আদিবাসী কৃষক জানালেন—মিনারের শীর্ষদেশ সিমেন্টের আস্তরণ দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে কিছুকাল আগে। নীচে মিনারের মুখোমুখি দাঁড়ালেই চোখে পড়ে—মিনারের গা ঘেঁষে ডানহাতি গড়টি কিছুদূর অবধি প্রসারিত হলেও বাঁ-হাতি গড়টি একটু গিয়ে নীচে নেমে আবার উঁচু হয়ে উঠে গেছে। মনে হয়, এর পাশে বোধহয় আরো একটি মিনার ছিল, মাঝখানে ওই নীচু অংশ প্রবেশদ্বার, মিনারটি তোরণ স্তম্ভের একটি অংশ হয়তো। হয়তো এটাই ছিল প্রাসাদে প্রবেশের পশ্চিমদিকের তোরণদ্বার।

কত যুগের কত ঘটনার ইতিবৃত্তই না ঘুমিয়ে আছে এই পাণ্ডুয়ার মাটিতে।

রজনীকান্ত চক্রবর্তী তাঁর 'গৌড়ের ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন—'পাণ্ডুয়া যে একটি হিন্দু নগর ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। পাণ্ডুয়ার দৈর্ঘ্য ১৬ মাইল ও বিস্তার ২ মাইলের কম ছিল না।' সিধান্তে এসেছিলেন তিনি, এই পাণ্ডুয়াই ছিল প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধন। তাঁর মতে—'গঙ্গতীরের গৌড়, পুনর্ভবা তীরের দেবকোট এবং করতোয়া তীরের মহাস্থান—এ রাজ্যের তিনটি প্রধান নগর ছিল।' যদিও রজনীকান্তবাবুর মত পরবর্তীকালে খণ্ডিত হয়েছে উপযুক্ত সাক্ষ্য-প্রমাণের দ্বারা। জানা গেছে—পুণ্ড্রবর্ধন হল বগুড়ার মহাস্থানগড় অঞ্চল। তবু পাণ্ডুয়ার প্রাচীনত্বের কথা, বিশাল ধ্বংসাবশেষ, কিছু স্মৃতিচিহ্ন মনে করিয়ে দেয় পুণ্ড্ররাজাদের কেউ নিশ্চয় এ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। মহাভারতের পাণ্ডবদের সঙ্গেও এর সম্বন্ধ খুঁজে পেতে চান অনেকে। হারিয়ে গিয়েছে সেই প্রাচীন পাণ্ডুয়া—হারিয়ে গিয়েছে ওই স্নানাগারকে ঘিরে যুদ্ধের সময় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল যে দুর্গ, সেই একডালা দুর্গ।

একডালা দুর্গ! কথাটা মনে হতেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটা ছবি। এখন অপরাহ্ন। সূর্যের বিষণ্ণ আলো ছড়িয়ে পড়েছে পাণ্ডুয়ার ধ্বংসাবশেষের ওপর। সাতশো বছর আগের এমনই এক অপরাহ্নে দিল্লিশ্বর ফিরোজ শাহ-র বিশাল বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণের সম্ভাবনার কথা মনে করে পাণ্ডুয়ার সন্ত্রস্থ পুরোনারীরা একডালা দুর্গের ছাদে আরোহণ করে মাথার কাপড় খুলে গভীর শোক প্রকাশ করতে লেগেছিলেন। প্রায় নব্বই হাজার সৈন্য নিয়ে বাংলার রাজধানী পাণ্ডুয়া আক্রমণ করেছিলেন ফিরোজ শাহ। প্রত্যক্ষ সংগ্রামে সেবার হাতাহাতি যুদ্ধ হয়েছিল। পরাজিত হয়েছিলেন পাণ্ডুয়ার সুলতান ইলিয়াস শাহ। সাতজন অশ্বারোহী নিয়ে একডালা দুর্গে ঢুকে দ্বার বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এক

লক্ষ আশি হাজার বাঙালির মাথা সংগ্রহ করলেন ফিরোজ শাহ। একডালা ও পাণ্ডুয়ার নাম পরিবর্তন করে রাখা হল আজাদপুর ও ফিরোজাবাদ। এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধের মাঝখানে ঘটেছিল আর এক নাটকীয় ঘটনা। 'রিয়াজ-উস-সালাতিন' বলেন দরবেশ শেখ বিয়াবানি এই সময় মারা যান, যাঁর ওপর ইলিয়াস শাহের গভীর শ্রদ্ধা ছিল। সুলতান ফকিরের ছদ্মবেশে দুর্গ থেকে বেরিয়ে তাঁর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় যোগ দেন। এমনকি ফিরোজ শাহের সঙ্গেও দেখা করে আসেন, যদিও সম্রাট তাঁকে চিনতে পারেননি। ইলিয়াস শাহের পর সুলতান সিকান্দার শাহের সময়েও দ্বিতীয়বারের জন্য বঙ্গ-অভিযান করেছিলেন দিল্লির সম্রাট ফিরোজ শাহ। সেবার সত্তর হাজার ঘোড়সওয়ার, চারশো সত্তরটি রণহস্তী, নৌকা, একশো আটটি নানা ধরনের পতাকা, তুর্যদামামা এবং উট-গাধার এক বিশাল বাহিনী ছিল তাঁর সঙ্গে। সিকান্দার সমস্ত প্রজাসহ আশ্রয় নিলেন একডালা দুর্গে। একদিন দুর্গপ্রাকার অত্যাধিক লোকের ভার সইতে না পেরে ভেঙে পড়ল। বাঙালি মিস্ত্রিরা সারা দিন-রাত খেটে তা আবার মেরামত করলেন। তুমুল যুদ্ধ শুরু হল। এবার লড়াইয়ের ফলশ্রুতি সন্ধি। দুর্গের বিশ গজ চওড়া পরিখা ঘোড়ায় চড়ে লাফ দিয়ে ডিঙিয়ে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে একডালায় ঢুকলেন মালিক কাবুল। সিকান্দারের সিংহাসন প্রদক্ষিণ করলেন সাতবার, মাথায় মুকুট, বুকে উত্তরীয় পরিয়ে দিলেন। সুলতান সন্তুষ্ট হয়ে চল্লিশটি হাতি আর মূল্যবান উপহার পাঠালেন সম্রাট ফিরোজ শাহকে।

সব এখন এই শতাব্দীর অপরাহ্নে কল্পনার গল্প বলে মনে হয়। কোথায় কবে মাটির বুকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে কাদামাটির দুর্গ একডালা, যা ছিল গঙ্গার তীরে, গঙ্গারই একটি শাখানদী দিয়ে ঘেরা জল-জঙ্গলে ভরা এক সুরক্ষিত আবাসস্থল। জিয়াউদ্দিন বারণী, সিরাৎ-ই-ফিরোজশাহীর বর্ণনার সঙ্গে মিলিয়ে বহু ঐতিহাসিক বহুবার এর অবস্থান খুঁজে বের করার চেষ্টা করছেন। রেনেল, বেভারিজ বলেছিলেন—ঢাকায়, ওয়েস্ট মেকটের মতে—মালদহে। অক্ষয়কুমার মৈত্র অনুমান করেছিলেন—মালদার দমদমায়, রজনীকান্ত চক্রবর্তী—পাণ্ডুয়ায়, আবিদ আলি—পাণ্ডুয়ার কাছে, মুর্চা গ্রামে। আবার কেউ বলেছেন—দিনাজপুরে। গবেষক ধনঞ্জয় রায়ের মতে দক্ষিণ দিনাজপুরের কুশমণ্ডী থানার বৈরাট্টা একডালা গ্রাম-ই সেই প্রাচীন একডালা। কাকই দিঘি, গড় দিঘি বেষ্টিত স্থানটির অবস্থান এই সিদ্ধান্তে আসার সহায়ক হয়েছে। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয় গৌড়ের বাইশগজী প্রাচীরের আড়ালে সুলতানদের রাজপ্রাসাদ এখন যে মাটির গভীরে মুখ লুকিয়েছে—সেই হল একডালা। তার পাশ দিয়ে গঙ্গার একটি শাখা ভাগীরথী আজও প্রবাহিত। কিন্তু এসব ঐতিহাসিক তথ্যপ্রমাণের ভারে ক্লিষ্ট হয় কল্পনা। আমি এসেছি বিলুপ্ত রাজধানী পাণ্ডুয়া দেখতে। নিছক এক পর্যটকের দৃষ্টিতে। গৌড়ের মতো পাণ্ডুয়ার বাতাসেও মিশে আছে মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের কাহিনি। কিন্তু এখন ইতস্তত ছড়ানো কয়েকটি ভাঙা মসজিদ আর প্রায় মজে যাওয়া দিঘি, বাদশাহী সড়কের খণ্ডাংশ, অজস্র টুকরো ইট আর পাথর ছাড়া কোনো কিছুই নেই, যা আমাকে বলে দেবে এ নহে কাহিনি, এ নহে স্বপন। এমনকি গৌড়কে ঘিরে যত কথা—দেশি-বিদেশি পর্যটকদের যতো বিররণী লেখা হয়েছে সে-যুগে ও এ-যুগে, পাণ্ডুয়াকে নিয়ে তাও হয়নি। বাংলার ঐতিহাসিক স্থানের মধ্যে সবচেয়ে অবহেলিত বোধহয় পাণ্ডুয়া। দ্রষ্টব্য স্থানের মধ্যে অনেক অর্বাচীন মুর্শিদাবাদের

নাম তালিকাভুক্ত করে, পাণ্ডুয়াকে নয়। অথচ আদিনা মসজিদের কষ্টিপাথরের কাজ, একলাখীর টেরাকোটার মতো দ্রষ্টব্য বাংলার আর কোথাও নেই।

সন্ধ্যা নামছে পাণ্ডুয়ায়। একদিন এমনই অস্তগামী সূর্যের ম্লান আলোর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন সম্রাট লক্ষ্মণ সেন। আর সম্মুখের গঙ্গাব জলে ভেসে উঠেছিল এক অলৌকিক দৃশ্য। আবির্ভূত হয়েছিলেন পীর জালালউদ্দিন। পাণ্ডুয়ার পত্তন হয়েছিল। সেদিন পীর শুধু ধর্মপ্রচারেই আসেননি, পাণ্ডুয়ারই গোপ কালু ঘোষকে কালু পীরে রূপান্তরিত করে মুসলমান রাজ্যের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন। সফলও হয়েছিলেন। এসেছিলেন বখতিয়ার খিলজী।

জানতেন না সম্রাট লক্ষ্মণ সেন, সেই অস্তগামী সূর্য ছিল তাঁর সাম্রাজ্যের বিলীয়মান আলোরই এক প্রতিবিম্ব। কিন্তু আমি জানি, পাণ্ডুয়ার ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলো যদি এখনো উপযুক্তভাবে সংরক্ষণ করা না হয় তবে এই সন্ধ্যার গভীর আঁধারে ঢেকে দেবে পাণ্ডুয়ার সমগ্র ইতিহাস। অবিলম্বে এখানে যদি দর্শকদের থাকার জন্যে ভালো ব্যবস্থা করে ট্যুরিস্টদের আকর্ষণ করা না হয়, তবে বাংলার ইতিহাসেরই একটি অধ্যায় চিরদিনের জন্যে আমাদের অগোচরে থেকে যাবে। আদিনার মৃগ উদ্যানকে ঘিরে চিৎকার পর্যটন আবাস গড়ে উঠতে পারে। কল্পনা শক্তিহীন, সরকারির পর্যটন দপ্তর এ কথা কবে ভাববেন কে জানে! সন্ধ্যা হয়ে এলো। সহযাত্রীদের নিয়ে এই শতাব্দীর যন্ত্রযান ছুটে যাচ্ছে মালদার দিকে। কোনো কোলাহল নেই, নেই কোনো অতিথি আপ্যায়নের ডঙ্কাধ্বনি। সেই দূরে ভগ্নপ্রাসাদের অলিন্দে হয়তো নিঃশব্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে সরীসৃপের দল। কোথায় ছিল সুপণ্ডিত বৃহস্পতি মিশ্রের ভিটে কে জানে! প্রহর ঘোষণা করছে ফেরুপাল আর শেয়ালেরা। বিলুপ্ত রাজধানী পাণ্ডুয়ার বাতাস যেন শিউরে উঠছে। আধুনিক কালের জনবসতির জীবন চাঞ্চল্যের আড়ালে অতীতের পাণ্ডুয়া ঘুমিয়ে আছে যেন।

আজ রাজপথে ছুটে যাচ্ছে বাস, ট্যাক্সি, ট্রাক। চকিত আলোয় অকস্মাৎ সকলের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে গভীর লজ্জায় আর বেদনার তৎক্ষণাৎ অন্ধকারে মুখ লুকোচ্ছে ঘুমন্ত পাণ্ডুয়ার জেগে থাকা প্রহরী একলাখি আর আদিনা মসজিদ।

যেন প্রতীক্ষা করছে আগামী সকালের। কেউ বুঝি এসে লজ্জার হাত থেকে তাকে বাঁচাবে! নতুন করে উদ্ভাসিত হবে পাণ্ডুয়ার আবহমানের পরিচয়।

গৌড়/লক্ষ্মণাবতী/লখনৌতি/জিন্নতাবাদ

উঠিল যেখানে মুরজমন্ত্রে নিমাইকণ্ঠে মধুর তান
ন্যায়ের বিধান দিল রঘুমণি চণ্ডীদাস গাহিল গান
যুদ্ধ করিল প্রতাপাদিত্য
তুই তো মা সেই ধন্য দেশ
ধন্য আমরা যদি এ শিরায় থাকে তাদের রক্তলেশ।
—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

গৌড়!

চারশো বছরেরও বেশি হয়ে গেল ধ্বংস হয়ে গেছে এই মহানগরী। আজ আমি আবার এসেছি গৌড়ে। এ নিয়ে কতবার হল? কেন এলাম আবার?

বহুজনের উপহাস, নিস্পৃহতা, আত্মীয়জনের বিরক্তি ও সন্দিগ্ধ কৌতূহল, প্রত্নতাত্ত্বিক বুদ্ধিজীবীদের তাচ্ছিল্য আমাকে গৌড়ে বারে বারে আসা থেকে নিবৃত্ত করার এইসব প্রচেষ্টাকে পরাস্ত করে শেষে হার স্বীকার করেছি নিজের কাছেই। গৌড়ের দুর্বার আকর্ষণী শক্তির কাছে ধরা দিয়ে এ নিয়ে প্রায় তিরিশ বারের মতো আমি এলাম এখানে।

গৌড় আমাকে 'হন্ট' করে, আমি জাতিস্মরের মতো ঘুরে বেড়াই গৌড়ের মাটিতে। আমি জানি, বাঙালি মাত্রকেই এই নামটি স্মৃতিচারী করে তোলে।

সে তো আজকে নয়, বহুকাল আগে থেকেই এই বিশেষ শব্দটি একটি বিশেষ দেশের, একটি জাতির, একটি বিশেষ সংস্কৃতির পরিচয় বহন করছে।

মহারাজাধিরাজ শশাঙ্কের সময়ে যে গৌড়ের উদ্ভব, পরবর্তী একশো বছর ব্যাপী ভয়াবহ মাৎস্যন্যায়ে যার ক্ষণিক অবলুপ্তি এবং তারপর পালবংশের অভ্যুদয়ে যার পুনর্জাগরণ, পরবর্তী সেনবংশ, খিলজী, পাঠান, আফগান, হাবশী, বাঙালি বা মোগল সম্রাটদের আমলে যার চূড়ান্ত স্ফূর্তি এবং আজও অসংখ্য কবির কাব্যে, লৌকিক জীবনের নানা আচরণে যার স্মৃতি ছায়া ফেলে—সেই সুপ্রাচীন ভূখণ্ড গৌড়ে এসে বার বার নিজেকে অভিভূত বোধ করি।

এই কি সেই গৌড়! পালবংশের রাজধানী বাণগড়ের পর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত নবযুগের নরনৃপতি বংশ—সেনদের রাজধানী গৌড়—যার নাম পরিবর্তন করে সম্রাট লক্ষ্মণ সেন রেখেছিলেন লক্ষ্মণাবতী। এই লক্ষ্মণাবতীই কি পরবর্তী মুলসমান শাসকদের রাজধানী লখনৌতি-গৌড়?

আমি ফিরে তাকাই এর প্রাচীন ইতিহাসের দিকে। গৌড় নামের উদ্ভব সম্ভবত 'গুড়' থেকে। এককালে এখানে ইক্ষুর চাষ হত অধিক পরিমাণে। ফলে গুড় উৎপন্ন হত। সম্ভবত

সেই থেকেই এই নামের উৎপত্তি। কোনো সঠিক সিধ্বান্তের কথা আমার জানা নেই। শুধু জানি, সুপ্রাচীন পাণিনি সূত্রে 'গৌড়পুর' নামে এক জনপদের উল্লেখ আছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে গৌড়, পুণ্ড্র, বঙ্গ আর কামরূপের শিল্প ও কৃষিপ্রসঙ্গ রয়েছে। পাণিনির টীকাকার পতঞ্জলি পরিচিত ছিলেন গৌড়দেশের সঙ্গে। বাৎসায়ণও তাঁর কামসূত্রতে গৌড় নাগরিকদের বিলাসব্যসন, গৌড়-নারীদের মৃদুবাক্য ও মৃদু অঙ্গের বর্ণনা দিয়েছেন।

মৎস্যপুরাণে উল্লেখ আছে গৌড়দেশের। বরাহমিহির গৌড়, পুণ্ড্র, বঙ্গ, সমতট, বর্ধমান ও তাম্রলিপ্তক নামে ছয়টি জনপদের উল্লেখ করেছেন। গৌড়ের উল্লেখ আছে দণ্ডীর কাব্যাদর্শে, রাজশেখরের কাব্য-মীমাংসায়, মুরারীর অনর্ঘ-রাঘবে, কৃষ্ম মিশ্রের প্রবোধ-চন্দ্রোদয় নাটকে, কল্হনের রাজতরঙ্গিণীতে এবং অসংখ্য জৈন, বৌধ, হিন্দু ধর্মগ্রন্থে, অজস্র শিলালিপিতে আর তাম্র-লেখতে। অথচ এত উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও সেই সংশয় রয়েই গেছে। বিভিন্ন যুগে গৌড় বলতে কি শুধু একটি বিশেষ ভূখণ্ডকেই বোঝাত?

কখনো মনে হয়, মুর্শিদাবাদ-বীরভূম-পশ্চিম বর্ধমান ছিল গৌড়ের সীমারেখা, যার রাজধানী ছিল চম্পানগর। সেই চম্পাই কি এখন বর্ধমান শহরের উত্তর-পশ্চিমে দামোদর নদের তীরে 'চাঁপা' গ্রাম!

ভবিষ্যপুরাণ বলে—গৌড়ের উত্তরে পদ্মা, দক্ষিণে বর্ধমান। জৈনগ্রন্থ সাক্ষ্য দেয়, মালদহ জেলার লক্ষ্মণাবতী-ই সেই গৌড়। ঈশান বর্মন মৌখরীর হড়াহা-লিপি জানায়, 'গৌড়ান্ সমুদ্রাশয়ান'। অর্থাৎ গৌড়ের সীমা সমুদ্র থেকে দূরে ছিল না। এই লিপি ষষ্ঠ শতকের। সপ্তম শতকে মহারাজাধিরাজ শশাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত 'গৌড়তন্ত্র' নামটিকে সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে দিল এই একটি শব্দের আড়ালে। বাংলা ও বাঙালির পরিচয় বিধৃত হয়ে রইল।

শশাঙ্কের গৌড় নিশ্চিতই মুর্শিদাবাদ অঞ্চল, কর্ণসুবর্ণ তাঁর রাজধানীর নাম—যা আজ রাঙ্গামাটি কানসোনা নামে এক গ্রাম হয়ে ওই জেলারই নিভৃতে তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছে।

শশাঙ্কর মৃত্যুর পর গৌড়ের ভাগ্যাকাশে দেখা যায় দুর্যোগের ঘনঘটা। দীর্ঘ একশো বছর ব্যাপী অরাজকতার অশুভ তাণ্ডব। রাঢ়, বঙ্গ, সমতট, তাম্রলিপ্তি স্বাতন্ত্র্য লাভের হিংস্র সংঘর্ষে বিশৃঙ্খল। অবশেষে একদিন সেই অন্ধযুগের অবসান ঘটিয়ে আবির্ভূত হলেন গোপালদেব, নিপীড়িত জনগণের মনোনীত প্রতিনিধি—বাংলার প্রথম গণনেতা। প্রতিষ্ঠিত হল পালবংশ। রাজধানী স্থানান্তরিত হল তাঁর জনকভূমি বরেন্দ্রভূমিতে—বাণগড়ে।

গৌড় নামটি আবার রাজ-উপাধিতে স্থান পেল। পাল-সম্রাটরা গৌড়াধিপ বা গৌড়েন্দ্র বা গৌড়েশ্বর নামে পরিচিত হলেন।

দুশো বছর রাজত্বের পর পালবংশ কর্ণাটকীয় সেনবংশের হাতে দেশ শাসনের ভার তুলে দিতে বাধ্য হলেন। রাজধানী স্থানান্তরিত হল বাণগড় থেকে গৌড়ে। বরেন্দ্রভূমি থেকে মালদহে। সম্রাট লক্ষ্মণসেনের নামে নামান্তরিত হল—লক্ষ্মণাবতী। সেই লক্ষ্মণাবতীই কি এই গৌড়?

এখন যে রাস্তা মালদহ শহর থেকে বেরিয়ে রাজমহলের দিকে গিয়েছে, ওই পথে কিছুদূর এগোলে বাগবাড়ি নামে এক জায়গায় এসে অনুসন্ধিৎসু চোখ চমকে ওঠে। দেখা যায়, ডানদিকে বিশাল গড়ের ভগ্নাবশেষ, নীচে মৃত পরিখা। এছাড়া আর কিছু নেই, তবু লোকে বলে—এই হল বল্লাল-বাড়ি, যা এখন বাগবাড়ি নাম নিয়েছে। আর এখানেই ছিল

বল্লালসেনের উদ্যানবাড়ি-রাজপ্রাসাদ। কিছুদূরে অমৃতি গ্রামের পিছলি-গঙ্গা-রামপুর নামে এক জায়গায় ছড়ানো অসংখ্য প্রত্নচিহ্ন দেখিয়ে অনেকে বলেন—এখানেই ছিল সম্রাট লক্ষ্মণ সেনের শেষ জীবনের বাসভূমি। বল্লালবাড়ি, রামভিটা, চণ্ডীপুর, পটলচণ্ডী, লোহাগড়, অমৃতি, কমলাবাড়ি ইত্যাদি গ্রামের নাম প্রাচীন হিন্দুযুগের সাক্ষ্য বহন করে আজও। ওই কমলাবাড়ি গ্রামের কাছে সাগরদিঘির উত্তর-পশ্চিমে এক মাইল দূরে কানিংহামের সময়ও গৌড়ের অন্যতম প্রধানা দেবী গৌড়েশ্বরী পূজিতা হতেন।

গঙ্গার তীরে গড়ে উঠেছিল গৌড়নগরী। মালদহের কালিন্দী নদী দিয়েই জলধারা প্রবাহিত হত বেশি পরিমাণে। পরে গঙ্গা খাত পরিবর্তন করে। ফলে হিন্দুযুগের, সেনযুগের লক্ষ্মণাবতীও স্থানান্তরিত হয়। শুধু গড়ের ভগ্নাবশেষ, পরিখার নিষ্প্রাণ দেহ, কয়েকটি গ্রামের নাম, কিছু প্রত্নচিহ্নের বুকে তার লুপ্তপ্রায় অস্তিত্ব নিয়ে সে তার অতীতকে মুখর করে তুলতে চায়। বাগবাড়ির কাছেই রাজনগরে কি বল্লালসেনের কোনো স্মৃতিচিহ্ন আছে? এখন বোধহয় তার কিছুই পাবার আর উপায় নেই।

বাণগড়ের পর যে গৌড়-লক্ষ্মণাবতী, তার চতুঃসীমায় কোনো সৌধ, কোনো মন্দির আজ আর নেই। রাজধানী পরিক্রমা করতে এসে বিভিন্ন সংগ্রহশালায় রক্ষিত প্রস্তরমূর্তি, কোনো প্রত্নরত্ন, কয়েকটি স্থান, কয়েকটি গড়ের কঙ্কাল আর সম্রাট লক্ষ্মণ সেনের আমলে খনিত, মালদা শহর থেকে মাইল সাতেক দূরে সাদুল্লাপুর মহাশ্মশানে যাবার পথের পাশে বড়ো সাগরদিঘি দেখে লক্ষ্মণাবতীর অতীত ঐশ্বর্য অনুমান করে নিতে হয়। একাদশ শতাব্দীতে দুর্ধর্ষ বক্তিয়ারের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য যখন অসহায় সম্রাট লক্ষ্মণ সেন গঙ্গাতীরস্থ তাঁর অপর রাজধানী নুদিয়া ছেড়ে সঙ্কটনাট সোনার গাঁ বা বঙ্গের দিকে চলে যেতে বাধ্য হলেন, তখন সেই নুদিয়াও ধ্বংস হয়ে গেল বখতিয়ারের হাতে।

তার চিহ্ন আজ কোথাও নেই। শুধু এখনকার নবদ্বীপ শহরের কাছে এক উঁচু ভূখণ্ড দেখিয়ে স্থানীয় মানুষেরা বলেন—ওই হল বল্লালঢিবি। ওখানেই ছিল ধর্মানুরাগী সম্রাট বল্লাল সেন-লক্ষ্মণ সেনের রাজবাড়ি। হতে পারে! ভূখণ্ডটির উচ্চতা এবং অসংখ্য ছোটো ছোটো প্রাচীন ইটের সাক্ষ্য দেখে অনুমান হয় এখানে সেনবংশীয় সম্রাটদের কোনো স্মৃতিচিহ্ন মাটির গভীর গোপনে হয়তো লুকিয়ে আছে। এখন পর্যন্তও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এটি ব্যাপক ভাবে খুঁড়ে দেখার কোনো প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। কোনো ব্যক্তিগত উদ্যমও অনুপস্থিত। ফলে বাংলার ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের কথা আজও সঠিকভাবে জানা যায়নি। যদিও এক উৎখননে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তু দেখে একে দেবালয় বলে অনুমান করছেন অনেকে।

বড়ো বিস্ময় লাগে, বাংলায় সেনবংশের রাজত্বের ইতিহাস খুব কমদিনের নয় এবং এ-বংশের দু'জন সম্রাট বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণ সেনের নাম আজও বাঙালির স্মৃতিতে, লৌকিক ক্রিয়াকর্মে এবং প্রবাদে জীবন্ত হয়ে আছে। অথচ তাঁদের রাজধানী, তাঁদের কোনো স্মারকচিহ্ন সংরক্ষণের প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। কোথায় ছিল সম্রাট বল্লাল সেনের সেই প্রাসাদ, যেখান থেকে একদিন তিনি স্বেচ্ছায় লক্ষ্মণ সেনের হাতে রাজ্যভার তুলে দিয়ে কর্ণাট-চালুক্যরাজ দ্বিতীয় ভাগদেবমল্লের মেয়ে রামদেবীকে নিয়ে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমে নিরঞ্জনপুরে

চলে যান? তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'অদ্ভুতসাগর' রচনা করেছিলেন তিনি তখন। সে গ্রন্থ কিন্তু অসমাপ্তই থেকে যায়।

কোথায় ছিল মহাকবি উমাপতি ধর, মহাপণ্ডিত হলায়ুধ মিশ্র, ধোয়ী, শ্রমণ ইত্যাদি 'নবরত্ন' পরিবৃত সম্রাট লক্ষ্মণ সেনের রাজসভা? সে কোথাকার গঙ্গার তীর, যেখানে দাঁড়িয়ে একদিন লক্ষ্মণ সেন আর হলায়ুধ প্রত্যক্ষ করেছিলেন এক অসাধারণ দৃশ্য? দেখছিলেন তাঁরা এক ফকির যেন অলৌকিকভাবে পায়ে হেঁটে আসছেন গঙ্গার ওপর দিয়ে। পার হয়ে এসে থমকে দাঁড়িয়ে সেই ফকির জিজ্ঞাসা করেন সম্রাটকে—আপনি কে?

—আমি পৃথিবী পালক সম্রাট লক্ষ্মণসেন। উত্তর দেন বিস্মিত সম্রাট।

হাসেন সেই ফকির। বলেন—আপনি যদি পৃথিবী পালকই হন তবে ওই যে বকটি মাছ ধরছে, ওকে মাছ ছেড়ে উড়ে যেতে আদেশ করুন।

বিস্মিত সম্রাট এবার ক্রোধান্বিত হন। বলেন—ওই বক তির্যকযোনি। ও আমার কথা শুনবে কেন?

—আমার কথা শুনবে।

বলেন আর বককে উড়ে যেতে আদেশ করেন ফকির। সম্রাটের বিস্ময়কে চমকে দিয়ে উড়ে যায় বকটি। এবার ফকিরের ক্ষমতায় অভিভূত বোধ করেন সম্রাট। তাঁর রাজসভায় আমন্ত্রণ জানান আব মুগ্ধতার মূল্য হিসেবে পাণ্ডুয়ার কিছু ভূখণ্ড দান করেন ফকিরকে মসজিদ তৈরির জন্য। সেই মসজিদ আজও আছে মালদহের পাণ্ডুয়ায়। পীর শেখ জালালউদ্দিন তাব্রেজী নির্মিত সেই মসজিদ। যার ভিত খুঁড়তে গিয়ে বহুমূল্য রত্ন পেয়ে যান পীর এবং তা দান করেন লক্ষ্মণ সেনের-ই পারিষদবর্গকে।

কোথায় সেই প্রাসাদ, যার কক্ষে একদিন অনুতাপ আর অনুশোচনার তীব্র অনলে পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছিলেন মহাসন্ধি বিগ্রহিক মহামন্ত্রী হলায়ুধ মিশ্র? রাজ্যের প্রজাবর্গকে রক্ষা করার দায়িত্ব যাঁর, সুনীতি রক্ষক এবং সুচরিত্রের খ্যাতিতে তিনি গৌড়ের সর্বত্র সম্মানিত, তিনি গতরাত্রে গৌড়েরই এক ছলনাময়ী নটীর মায়ায় ক্ষণিকের জন্য মুগ্ধ হয়ে নিজের শরীরী পবিত্রতা নষ্ট করেছেন। সুদেহী সুদর্শন হলায়ুধকে মোহের কাছে পরাস্ত হতে দেখে সম্ভোগক্লান্ত বারবধূ হেসে উঠেছে বিজয়িনীর মতো। আর নিজের স্ত্রী ভেবে বিলাসমত্ত হয়ে পরে যখন ভুল বুঝতে পেরেছেন হলায়ুধ, তখন তীব্র আত্মধিক্কারে নিজেকে হত্যা করার সঙ্কল্প দৃঢ় করার জন্য অস্থির পদচারণা শুরু করেছেন প্রাসাদের কক্ষে। অবশেষে সেই চরমলগ্ন। দৃঢ় অথচ গ্লানিতে বিষণ্ণ পায়ে রাজসভায় প্রবেশ করলেন হলায়ুধ। উদ্বিগ্ন সম্রাট আর পারিষদবর্গকে অকপটে জানালেন তাঁর ক্ষণিক মোহের ভুলের কথা। আর জানালেন, গৌড় রক্ষার জন্য তিনি তুষানলে প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। এ আদেশ দেশের আইনরক্ষক হিসেবে, মহাসন্ধি বিগ্রহিক হিসেবে নিজেই নিজের প্রতি জারি করেছেন। শঙ্কিত হলেন লক্ষ্মণ সেন। জানালেন—পিতার আমল থেকে যিনি সুপরামর্শ আর সুশাসনের দণ্ড হাতে রাজ্যরক্ষা করেছেন তাঁকে বিসর্জন দিতে তিনি আদৌ প্রস্তুত নন। কিন্তু হলায়ুধ তাঁর সঙ্কল্পে অটল। শেষে সকলের অনুরোধ, আদেশ আর শঙ্কাকে উপেক্ষা করে জ্বলন্ত তুষের আগুনে একটি পাবক শিখার মতোই জ্বলে উঠলেন মহাপণ্ডিত হলায়ুধ মিশ্র। গৌড় রক্ষার জন্য, সুনীতি রক্ষার জন্য একটি আদর্শ স্থাপন করলেন।

কিন্তু বোধহয় ভুলই করেছিলেন হলায়ুধ। তিনি জানতেন না গৌড়ে তখন চলছিল ব্যভিচার, অন্যায় আর দুর্নীতির প্রাবল্য।

ধর্মানুরাগী, কাব্যপ্রিয়, জ্যোতিষী নির্ভর সম্রাট লক্ষ্মণসেনের সদ্ব্যবহারের সুযোগ নিয়ে রাজ্যব্যাপী এক ষড়যন্ত্র আর বিলাস-ব্যসনের শিথিল উল্লাস দানা বেঁধে উঠছে। প্রকাশ্য রাজপথে গণিকারা প্রলুব্ধ করছে পথিকদের, ফলে সর্বত্রই চলছে অনাচার। আর এরই সুযোগে এক শ্রেণির লোক বিদেশি শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে সম্রাটের পতন ঘটাবার আয়োজনে তৎপর হয়ে উঠেছে। ওই পীরের কাছেই দীক্ষা নিয়েছেন অনেকে। পাণ্ডুয়ার গোপ কালু ঘোষ নাম নিয়েছেন কালু পীর এবং হিন্দু রাজত্বের অবসান ঘটাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। বৃধ রাজা নুদিয়ার প্রাসাদে বসে অশুভ সংকেত শুনতে পাচ্ছেন। কিন্তু কিছুই করার নেই তাঁর। এরই মধ্যে শোনা গেছে দূরাগত এক তুর্কির দর্পিত অশ্বক্ষুরধ্বনি। উত্তর ভারত, বিহার ধ্বংস করে গৌড়ের দিকে এগিয়ে আসছেন মহাপরাক্রমশালী বা মহাপরাক্রমী বক্তিয়ার খিলজী। রাজ জ্যোতিষীরাও বলেছেন বা জানিয়েছেন—এক দীর্ঘবাহু কদাকার যবনের হাতে এ দেশ বিনষ্ট হবে। এমন কথা শাস্ত্রেও আছে—সংবাদ এনেছেন গোপন-দূত। সেই দুর্ধর্ষ তুর্কি সেনানায়কের সঙ্গে শাস্ত্রের বর্ণনায় সত্যিই মিল আছে। ত্রাসে-উত্তেজনায় গৌড় ছেড়ে চলে গেছেন বণিক ও নাগরিকরা। নুদিয়ার প্রাসাদে একা অসহায় সম্রাট লক্ষ্মণ সেন। না, রাজ্য ছেড়ে ভয়ে তিনি পালাননি। প্রজানুরঞ্জক, সুশাসক সম্রাটের নীতিতে এমন কোনো নির্দেশ নেই।

অবশেষে এল ১২০১ সালের এক মধ্যাহ্ন। প্রাসাদে দ্বি-প্রাহরিক আহারে বসেছেন সম্রাট। সোনার থালায় পরিবেশিত হয়েছে ভোজ্যবস্তু। ঠিক সেই সময় প্রাসাদদ্বারে উঠল তুমুল কোলাহল। ১৮ জন অশ্বারোহীর ছদ্মবেশে তোরণদ্বার অতিক্রম করে প্রাসাদের দিকে এগিয়ে আসছেন নিষ্ঠুর বখতিয়ার। হত্যার বিভৎসতায় মেতে উঠেছে তার অনুচরেরা। আর দেরি নয়, আসন ছেড়ে দ্রুতপায়ে পশ্চাৎদ্বার দিয়ে গঙ্গাতীরে এলেন বৃধ সম্রাট। নৌকা প্রস্তুত ছিল ঘাটে। তাঁকে নিয়ে সেই নৌকা এবার এগিয়ে চলল বঙ্গ বা সঙ্কনাটের দিকে।

আর তখনই শেষ হয়ে গেল গৌড়ে হিন্দুদের আধিপত্য।

এরপর দীর্ঘ সাড়ে তিনশ বছর ব্যাপী ছিল তুর্কি, পাঠান, হাবশী, আফগান আর বাঙালি মুসলমানদের রাজত্বকাল।

সেনানায়ক বখতিয়ার শাসনকাজের সুবিধার্থে রাজধানী স্থানান্তরিত করলেন সেই প্রাচীন বরেন্দ্রভূমিতে, তাঁদের ভাষায় বরিন্দ্-এ, পাল সম্রাটদের রাজধানী বাণগড়ের কাছে দেবকোট বা দেবীকোট-এ। কিন্তু সে ছিল অস্থায়ী সেনানিবাস মাত্র। পরে রাজধানী ফিরে এল লক্ষ্মণাবতীতেই। কিন্তু এবার নাম পরিবর্তন করে রাখা হল লখনৌতি। গৌড়-লক্ষ্মণাবতী এবার হল লখনৌতি-গৌড়। হিন্দুযুগের মন্দিরগুলোর শীর্ষ লুটিয়ে পড়ল ধুলোয়। নতুন যুগের নতুন স্থাপত্যে শোভিত হল গৌড়-নগরী। গড়ে উঠল অসংখ্য মসজিদ-মিনার। জেগে উঠল নতুন গৌড়। আর এই সেই লখনৌতি! সেই গৌড়!

বল্লাল সেনের নয়, লক্ষণ সেনের নয়, মুসলমান যুগের গৌড়। হিন্দুযুগের গৌড়কে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না কোথাও। তবুও এই লখনৌতির আড়ালেই রয়ে গেছে লক্ষ্মণাবতীর স্মৃতি, আছে এখানকার অজস্র মসজিদের গায়ে প্রোথিত হিন্দুধর্মের দেব-

দেবীর মূর্তি তার আভাস। পোড়ামাটির অসংখ্য কাজ রয়েছে। হিন্দু শিল্পকলার ইঙ্গিতময় রেখাচিত্র লক্ষ্মণাবতীর শরীর জুড়ে। এই লখনৌতির সজ্জা আজ আমার সম্মুখে উদ্ভাসিত—এ সত্য ভুলতে পারি না মুহূর্তের জন্যেও। তাই বাণগড়ের পর লক্ষ্মণাবতী পরিক্রমা করতে এসে লখনৌতিতেই আসতে হয়। কৈশোর থেকে যৌবনের প্রারম্ভকাল পর্যন্ত যখন মালদায় ছিলাম তখন থেকে আজ অবধি, এত দূরে চলে এসেও বারবার এক অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণে ছুটে যেতে হয় গৌড়ে। আমি জানি—গৌড়-বাংলার ইতিহাস এক একটি যুগান্তকারী ঘটনার সাক্ষী। গৌড় ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক স্থানগুলোর মধ্যে দিল্লির মতোই গুরুত্বপূর্ণ।

ঘটনার ঘনঘটায় রাজনীতির শোণিতাক্ত চমকে, শিল্প, সাহিত্য ও ধর্মের জগতে এক-একজন যুগন্ধর প্রতিভাধরের আবির্ভাবে ভারতের ইতিহাসে গৌড় এক অনন্য রাষ্ট্র, বিস্ময়কর অধ্যায়ের জনক হয়ে উঠেছে।

অথচ আজ দেখছি তার সীমাহীন, শ্রীহীন মূর্তি। ১৫৭২ সাল। সম্রাট আকবর গৌড়-মণ্ডলের নাম পরিবর্তন করে তার নাম রাখেন 'সুবা-বাংলা'। সৈন্যাধ্যক্ষ মুনিম খাঁকে পাঠান গৌড়ের শেষ স্বাধীন সুলতান দায়ুদ খাঁর স্বাতন্ত্র্য লাভের বাসনাকে চূর্ণ করে দিতে। পরাস্ত হয়েছিলেন দায়ুদ। আর তাঁর রাজত্বের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই চিরকালের মতো হারিয়ে গেল গৌড় নামটি। এরপর শুরু হয় বঙ্গ বা বাংলার রাজত্ব। আর এই ভূখণ্ড? এতদিনের এত স্মৃতি-বিজড়িত এই নামটি হারিয়ে যাবার দুঃখ বোধহয় সহ্য করতে পারল না। এক কালব্যাধি গ্রাস করল গৌড়কে। গঙ্গা আবার খাত পরিবর্তন করল। ভয়ঙ্কর প্লেগে মারা গেলেন স্বয়ং মুনিম খাঁ। সন্ত্রস্ত নাগরিকেরা ধন-সম্পদ পরিত্যাগ করে চলে গেলেন অন্যত্র। ঘন-অরণ্য আবৃত করল গৌড়ের লজ্জা। যেভাবে হারিয়ে গেছে গঙ্গে, কর্ণসুবর্ণ, বাণগড় আর লক্ষ্মণাবতী—সেভাবেই হারিয়ে গেল লখনৌতি-গৌড়।

সে এক বেদনাময় পীড়াদায়ক নির্মম ইতিহাস। লোভী লুণ্ঠক দস্যুদল পরে এক এক করে আত্মসাৎ করল গৌড়ের পরিত্যক্ত সম্পদ। সাদৃশ্য অট্টালিকাগুলোর অলঙ্কৃত পাঁজর খসিয়ে সম্রাট হুমায়ুনের 'জন্নতাবাদ' বা স্বর্গপুরী গৌড়কে শ্মশানের ভয়ানক শূন্যতায় পরিণত করল পরবর্তীকালের মানুষেরা। রাজধানী তাণ্ডা থেকে রাজমহল, রাজমহল থেকে ঢাকা, ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদ, মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গ বা বাংলা এই নামের আড়ালে আত্মগোপন করল বাঙালির অযুত স্মৃতি-বিজড়িত 'গৌড়' নামটি আর হারিয়ে গেল বিস্মৃতির অতলে।

কিন্তু সত্যিই কি হারিয়ে গেল?

আজ আবার যখন পশ্চিমবাংলার নাম পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, তখন অনেক পণ্ডিতগণের প্রস্তাবে সেই 'গৌড়' নামটিই আবার উচ্চারিত হয়। বহু প্রতিষ্ঠানের নামের সঙ্গে অসংখ্য কবির রচনায় এই নামটির ছায়া দেখতে পাই। স্বীকার করতেই হবে—গৌড় নামটির প্রতি বাঙালি-মাত্রেরই একটি প্রচ্ছন্ন দুর্বলতা আছে। সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত 'গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়' নামকরণেও তার-ই স্বীকৃতি।

আমি বাঙালি, তাই স্মৃতিতর্পণ করার পর আর একবার পা রেখেছি গৌড়ের মাটিতে, চারশো বছর আগেকার রূপ কেমন ছিল তা স্মৃতির চোখে দেখব বলে।

সম্ভব হয় না তা। কুড়ি বর্গমাইল বিস্তৃত এলাকায়, বারো লক্ষ লোকের বাসভূমি। ফরাসি পর্যটক লিখেছিলেন, চল্লিশ হাজার উনুন বা পরিবার ছিল এখানে। শুধুমাত্র বারো হাজার পানেরই দোকান সম্বলিত বিশাল এই মহানগরীর সীমা। কোথা থেকে শুরু আর কোথায় বা তার শেষ এতবার এসেও তার কোনো স্পষ্ট চিহ্ন দেখতে পাই না।

একাধিক সুউচ্চ বাঁধ আর গড় দিয়ে এ নগরী রক্ষার চেষ্টা করেছিলেন গৌড় সুলতানেরা, মণিময় প্রাসাদ আর সুরম্য অট্টালিকায় শোভিত করেছিলেন এই মহানগরীকে—প্রকৃতি ও মানুষের নির্মম অত্যাচারে আজ তার ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ভগ্নাংশমাত্র পড়ে আছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে গড়ের মাথা লুটিয়ে পড়েছে ধুলোয়, পরিত্যক্ত সম্পদের লোভে গৌড়ের বুক খুঁড়ে ক্ষত-বিক্ষত করেছে নির্বিবেক লুণ্ঠকেরা, সুদৃশ্য রাজপ্রাসাদ ভেঙে গড়ে উঠেছে মুর্শিদাবাদের হীরাঝিল প্রাসাদ। বাসগৃহের ইট পাঁচ টাকায় পাঁচশো গাড়ি কিনে উত্তরাধিকারীরা গড়ে তুলেছে মালদহ ও মুর্শিদাবাদ শহর। এমনকি কলকাতারও কয়েকটি ঐতিহাসিক সৌধ। অর্থগৃধ্ন মানুষের হাত এড়াতে পেরেছে শুধু কয়েকটি মসজিদ—তাও ধর্মীয় কারণে। আজ ধর্মকে যাঁরা স্বার্থের প্রয়োজনমতো ব্যবহার করেন তাঁদের শাবলের আঘাতে ঝরে গেছে অনেক মসজিদের মিনাকরা রঙিন কারুকার্য।

আজও ঝরে যায়। গৌড়কে শ্রীহীন করার হীন প্রয়াসে আজও মত্ত আছেন এমন অসংখ্য দর্শনার্থী, যাঁরা দেশ-বিদেশ থেকে পিকনিক করতে বা বেড়াতে আসেন এখানে, সীমাহীন অজ্ঞতা নিয়ে যাঁরা রামকেলির মন্দির, বারদুয়ারী, দখল দরওয়াজা, ফিরোজ মিনার, লুকোচুরি দরওয়াজা, কদম রসুল, চিকা মসজিদ, গুমটি দরওয়াজা, লোটন মসজিদ, চামকাটি মসজিদ, তাঁতিপাড়া মসজিদ দেখে ফিরে যান এবং তাঁরা যাবার সময় স্মারকচিহ্ন হিসেবে সংগ্রহ করেন অমূল্য প্রত্নরত্ন—সে যেভাবেই হোক।

কেউ নেই এই অসহায় গৌড়কে রক্ষা করার। রাজ প্রহরীর অস্তিত্ব তো কবে ধুলোয় হয়েছে ধুলি, এখানেও কোনো প্রহরী নেই। একজন গাইডও নেই যিনি অন্তত একটু মমতার আবেশ তৈরি করতে পারেন। ফলে পর্যটকদের তৃষ্ণা মেটে শুধু দৃশ্যমান ওই ক'টি মসজিদ, মিনার আর মন্দির দেখে। আর তাদের সামনে নীল এনামেল প্লেটে লেখা সরকারি পরিচয়জ্ঞাপক কিছু শব্দসমষ্টি পাঠ করে। একজন কর্মচারি আছেন গৌড় মিউজিয়ামে। আছেন একজন খাদেম, যাঁর কাছে হজরত মহম্মদের পদচিহ্ন সযত্নে রক্ষিত আছে। কিন্তু তাঁরাও বিস্তীর্ণ ধ্বংসাবশেষের সব পরিচয় জানাতে পারেন না। চিকা মসজিদ থেকে কিছু দূরে ওই বিশাল বাইশগজী প্রাচীরের আড়ালে গৌড় সুলতানদের যে রাজপ্রাসাদ ছিল ফিরোজ মিনারের পাশে বাঁশবনের অন্ধকারে আজও কিন্তু নিভৃতে জেগে আছেন গৌড়ের প্রধান আরাধ্যা দেবী গৌড়েশ্বরী—সে সংবাদ কেউই পান না। সেন আমলে গৌড়েশ্বরী মন্দির নগরীর দক্ষিণ সীমায় ফুলবাড়িতে ছিল বলে অনুমান। গঙ্গার ভাঙন থেকে রক্ষা করে পরে তা সরে আসে রামকেলির কাছে মহাজনপাড়ায়। পরে তা স্থানান্তরিত হয় কদম রসুল সংলগ্ন এলাকায়। হোসেন শাহের সময় ধর্মনিরপেক্ষতার বাতাবরণ তৈরি হয়। নতুন করে তৈরি হয় গৌড়েশ্বরী মন্দির, দাখিল দরওয়াজা ও প্রাসাদের মধ্যবর্তী স্থানে। রামকেলি মেলার সময় এখনো সেখানে ভক্তরা যান, পুজো ও পিণ্ডদান করেন। গৌড়েশ্বরীর মূর্তি অবশ্য অটুট নেই আর। সাধারণ পর্যটকরা এ খবর রাখেন না।

আর মালদহ শহর থেকে গৌড়ে যাবার পথে ডানহাতি সাদুল্লাপুর মহাশ্মশানে যাবার রাস্তার ধারে যে বিশাল বড়ো সাগরদিঘি—প্রকৃতপক্ষে ওখান থেকেই যে গৌড়ের দ্রষ্টব্যস্থান শুরু হল তার খবরই বা ক'জন রাখেন! এই সেই বড়ো সাগরদিঘি, যেটি খনন করেছিলেন সম্রাট লক্ষ্মণ সেন—এবং এর মাটি দিয়েই তৈরি হয়েছিল গৌড়ের নিকটবর্তী বিখ্যাত কাদামাটির দুর্গ—একডালা। সেই একডালা যে কোথায় আজও তা সঠিকভাবে নির্ণীত হয়নি। এ নিয়েও অনেক গবেষণা সাম্প্রতিক কালে হয়েছে। তার স্থানও নাকি নির্ণয় করা গেছে। কিন্তু সবাই কি এ বিষয়ে একমত?

এক মাইল দীর্ঘ ও এক মাইল চওড়া এই দিঘিরই উত্তরে যে উঁচু জায়গাটি, সেটি ছিল গৌড়ের বাণিজ্যকেন্দ্র। কাছেই পীরান-ই-পীরের মসজিদে যাবার পথে যে পুরনো সাঁকো আছে তার তলা দিয়ে নৌকো করে গৌড় শহরের ভেতরে মাল সরবরাহ করা হত।

এরই কাছে দ্বারবাসিনী দেবীর মন্দির। গৌড়ের অন্যতম প্রধানা উপাস্যদেবী। গৌড়ের আর এক স্মৃতিচিহ্ন পিরান-ই-পীরের মসজিদ বা আখি সিরাজুদ্দিনের সমাধিস্থান এবং ঝনঝনিয়া মসজিদ। এছাড়াও রয়েছে নিকটবর্তী আরো দুটি দ্রষ্টব্যস্থান। মুসলমান যুগের সাগরদিঘির উত্তর-পশ্চিম কোণে আখি সিরাজুদ্দিনের সমাধিস্থান। ইনি একজন বিখ্যাত পীর ছিলেন এবং পাণ্ডুয়ার নূর-কুতুব-উল আলমের ধর্মীয় পিতামহ হিসেবে অত্যন্ত সম্মানিত ছিলেন। শোনা যায়, নূর-কুতুবের পিতা শেখ আলাউল হক ছিলেন এঁর শিষ্য এবং আজও যখন ঈদ-উল-ফিতর এবং বকর-ঈদ উপলক্ষে এখানে বিরাট মেলা বসে তখন পাণ্ডুয়া থেকে ঝাণ্ডা, নূর-কুতুবের পাঞ্জা ইত্যাদি এখানে আনা হয়। পীরের সমাধিস্থানের সম্মুখ দেওয়ালের দু'দিকে যে শিলালেখ আছে, তা থেকে জানা যায় সুলতান হুসেন শাহ এবং তাঁর পুত্র নসরৎ শাহের সময় এখানকার প্রবেশদ্বার ও সমাধিস্থান তৈরি হয়েছিল। প্রবেশদ্বারগুলো এখন আর অক্ষত নেই। কিন্তু পোড়া ইটের কারুকার্যমণ্ডিত শোভা আজও বুকে ধরে রেখেছে। সমাধি যেখানে দেওয়া হয়েছে সে জায়গাটি বেশ বড়ো। কথিত আছে, পীরের সঙ্গে তাঁর নিত্যব্যবহার্য কোরান্-ই-শরীফ তরবীহ এবং বই রাখার স্ট্যান্ডটিও তাঁর শিয়রের কাছে রাখা ছিল।

এরই কিছু দূরে ১৫৩৮ সালে সুলতান গিয়াসুদ্দিন মহম্মদ শাহর তৈরি ঝনঝনিয়া মসজিদ, যাকে র‍্যাভেনশ তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে জানজান মিঞার মসজিদ বলে উল্লেখ করেছেন। মসজিদে প্রোথিত শিলালিপি থেকে জানা যায়—মালতি নামে একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা এই মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন এবং নির্মাণ সময়ের উল্লেখ থেকে মনে হয় সম্ভবত গৌড়ে তৈরি এটিই সর্বশেষ মসজিদ। কিছুকাল আগে বা পরে লুকোচুরি দরওয়াজা তৈরি হয়। কিন্তু কে ছিলেন এই মসজিদ নির্মাণকারিণী মালতি আজও তা জানা যায়নি। শুধু নীরব পাথরের অক্ষর তাঁর স্মৃতিকে অক্ষয় করে রেখেছে। আমি যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছলাম, তখন বিশেষ পরব উপলক্ষে সেই মসজিদের ভেতর থেকে বিংশ শতাব্দীর ধর্মপ্রাণ মানুষের প্রার্থনার স্বর ভেসে আসছিল। তাঁদের আন্তরিক আহ্বানে মনে হচ্ছিল যেন, এক-একটি যুগের সীমা অতিক্রম করে সেই পুরনো দিনগুলোকে স্পর্শ করতে চাইছে এ-যুগ।

ফিরে আসতে হয় পুরনো পথেই। এবার মালদহ-গৌড় সড়ক। এই পথেরই দু'ধারে ছড়ানো আছে গৌড়-নগরীর অন্যান্য স্মারকচিহ্ন। কিছুদূর এগোলে আগ্রহী চোখ থমকে

দাঁড়ায় বাঁহাতি দুটো বড়ো পাথরের স্তম্ভ দেখে। লোকে বলে, এ দুটো নাকি হাতি বাঁধা থাম। রাজার হাতি বাঁধা থাকত এখানে। ইতিহাস জানায়—আসলে এ-দুটি কোনো রাজকর্মচারির বাসগৃহের তোরণদ্বার। সেই বাসগৃহ কবে ধুলোয় একাকার হয়ে গিয়েছে। সেখানে আধুনিক মানুষ মাটির ঘর বেঁধেছেন। শুধু নিতান্ত বিসদৃশ ওই দুটি পাথরের সাক্ষী অতীতের বৈভব আর বিত্তের কথা সদর্পে জানাতে গিয়ে কেমন যেন বিব্রত, বিমূঢ়, স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আর কিছুদূরেই সেই বিখ্যাত পিয়াসবাড়ি দিঘি! গৌড়ের বন্দীশালা সংলগ্ন বিশাল জলাশয়। শোনা যায়—এর জল আগে দূষিত ছিল এবং বন্দীদের এই জল ছাড়া আর কিছুই পান করতে দেওয়া হত না। আবুল ফজল তাঁর আইন-ই-আকবরীতে বলেছেন—সম্রাট আকবর নাকি নিয়মটি বন্ধ করে দেন। মেজর ফ্রাঙ্কলিন অবশ্য পরবর্তীকালে এই মত খণ্ডন করে লিখেছেন—আসলে এর জল সুপেয় ছিল। বন্দীদের চোখের সামনে তৃষ্ণার এই শান্তি থাকা সত্ত্বেও তাদের তা স্পর্শ করতে দেওয়া হত না, ফলে আকণ্ঠ পিপাসা নিয়ে তারা মারা যেত। সেই থেকেই এর নাম পিয়াসবাড়ি। অতীতের পিপাসার্ত কতকগুলো মানুষের তীব্র হাহাকারকে যেন আজও জাগিয়ে রেখেছে। এই দিঘির জলেরই তিন ফুট নীচে বাঁধানো ঘাটের কাছে দুটো পাথরের হাতি বাঁধা আছে। কে বেঁধেছে, কেন ওভাবে রাখা হয়েছে সে কথা কেউ আজ আর বলতে পারেন না। শুধু যখন এখানে ডাকবাংলো তৈরি হচ্ছিল, তখন অসংখ্য দীর্ঘদেহী মানুষের নরকঙ্কাল পাওয়া গেছে মাটির গভীর থেকে। স্থানীয় মানুষেরা বলেন—এগুলোই সেই হতভাগ্য তৃষ্ণার্ত কয়েদীদের অসহায় অস্তিত্ব। বিষণ্ণতা অনুভব করেন পর্যটক। কিন্তু সেই বিষণ্ণতার ব্যথা মুছে যায় আর একটু এগোলে, ডানহাতি কাঁচামাটির রাস্তা ধরে প্রথমেই পড়ে রামকেলি।

রামকেলি! সেই রামকেলি গ্রাম, পাঁচশো বছর আগে নীলাচলে যাবার পথে শ্রীচৈতন্য যেখানে এসে মিলিত হয়েছিলেন পরম-বৈষ্ণব সাকর মল্লিক ও দবীর খাস সনাতন ও রূপ গোস্বামীর সঙ্গে। এইখানেই ছিল তাঁদের বাড়ি। সুলতান হুসেন শাহর বিশ্বস্ত মন্ত্রী ছিলেন তাঁরা। ওই রূপসাগর আর সনাতন সাগরের তীরে আজও তাঁদের ভিটের শেষ চিহ্ন পড়ে আছে। এই সেই পথ, যে পথের ধূলিকণা পবিত্র হয়ে গিয়েছিল মহাপ্রভুর পূত চরণস্পর্শে, ওই সেই তমালতলা, যেখানে এসে উপবেশন করেছিলেন তিনি বিশ্রামার্থে! ওই তো সেই আসন, যেখানে নিত্যানন্দ প্রভু আসন গ্রহণ করেছিলেন। এই সেই মন্দির, যেখানে আজও রূপ-সনাতনের পূজিত বিগ্রহ নিত্যসেবা লাভ করেন। তমালতলায় এখন একটি মন্দির তৈরি হয়েছে, যার ভিতর শ্রীচৈতন্যদেবের পদচিহ্ন সযত্নে রেখে দেওয়া হয়েছে। তাঁর পাশে আজও রাধাকুণ্ড আর শ্যামকুণ্ডের জল অজস্র ঢেউয়ের হাতে মৃদুসুরে নাম-গানের সঙ্গে যেন খঞ্জনী বাজিয়ে চলেছে।

তেমন উত্তাল হরিনাম ধ্বনিতে আর মুখর হয়ে ওঠে না রামকেলির বাতাস, যেমন পাঁচশ বছর আগে হয়েছিল। ওই রূপসাগর আর সনাতনসাগরের জলও তেমন কোনো পূতদেহের আনন্দ সঞ্চরণে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে না। তবু সারা দেশের বৈষ্ণবজনের কাছে আজও রামকেলি এক পবিত্র তীর্থস্থান, তাঁদের গুপ্ত বৃন্দাবন। জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তির দিন থেকে দশ দিনের জন্য একটি মেলা বসে এখানে। ওই দিন মহাপ্রভু পদার্পণ করেছিলেন এই

গাঁয়ে, তাঁরই স্মরণে। দেশ-বিদেশ থেকে ভক্তজন আসে। দোকান, পশরা, ম্যাজিক, সার্কাস আর নামগানে আবার অতীতের রামকেলি যেন কয়েক দিনের জন্য জেগে ওঠে। রামকেলির পথে হাঁটতে গিয়ে আমার কৌতূহলী কল্পনার চোখ খোঁজে রূপ-সনাতনের ভিটে, কবি চতুর্ভূজের বসতবাড়ির কোনো চিহ্ন। এই চতুর্ভূজই তো লিখেছিলেন 'হরিচরিত কাব্যম্' ১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দে ভাগীরথী পরিসরে 'শ্রীরামকেলি নগরে' বসে। এই তো সেই রামকেলি যেখানে এক সময় বাস করতেন স্বর্ণরেখ ও ভবদেব নামে দুই ভাই। স্বর্ণরেখ বরেন্দ্রভূমিতে থাকতেন বলে বারেন্দ্র এবং ভবদেব রাঢ় দেশে ছিলেন বলে 'রাঢ়ী' আখ্যা পেয়েছিলেন। বিদ্যাচর্চার জন্য সুপরিচিত এই রামকেলি আজ আর ঘরে ঘরে শাস্ত্রলোচনায় মুখর হয়ে ওঠে না। রাজকীয় এবং শাস্ত্রীয় গৌরবের ঐশ্বর্য হারিয়ে আজ রামকেলি ভক্তজনের কাছে পূণ্যভূমি, গুপ্ত বৃন্দাবন, সাধারণ মানুষের কাছে একটি গ্রামমাত্র। রূপসাগরের জল মাথায় স্পর্শ করে আমি পথ হাঁটি।

তমালতলার সম্মুখের পথ ধরে কিছুদূর এগোলেই সম্মুখে বিশাল বারদুয়ারী মসজিদ এবার দৃষ্টিকে বিস্মিত করে। যাঁরা কিংবদন্তীর গল্প জানেন, তাঁরা রোমাঞ্চিত বোধ করবেন। এক ভয়ঙ্কর ঝড়-বাদলের রাতে এই পথ ধরেই একদিন সাদা ঘোড়ায় চেপে সুলতান হুসেন শাহর আদেশে প্রাসাদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন রাজকর্মচারি সনাতন গোস্বামী। জনমানব নেই পথে। একটা বিদ্যুৎরেখার মতো সেই ঘোড়া অন্ধকারে এগিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ শুনতে পেলেন সনাতন, পথের ধারের এক বাড়ি থেকে কে যেন বলছে—এই দুর্যোগে কুকুর বেড়ালও বেরোয় না এক রাজভৃত্য ছাড়া। কোথাও কি বজ্রপাত হয়েছিল সে সময়! থমকে দাঁড়িয়েছিল সেই অথির বিজুলীর মতো সাদা ঘোড়া। নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দিয়ে ঘরে ফিরে এসেছিলেন সনাতন। অসহ্য জীবনযাপন আর রাজকর্মের বন্ধনের পীড়নে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। অবশেষে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব। সেই তৃষ্ণার শান্তি, সুন্দর কান্তির চরণস্পর্শ লাভ।

সে এক বিচিত্র কাহিনি। এই গৌড়েরই বাতাসের বুকে আজও তা ভেসে আছে যেন।

সম্মুখের ওই বারদুয়ারী ১৫২৬ খ্রিঃ সুলতান নসরৎ শাহর তৈরি ইট আর পাথরে গাঁথা সবচেয়ে বড়ো মসজিদ। বড়োসোনা মসজিদ। সোনার চিহ্ন কোথাও নেই, নেই এই মসজিদের স্বর্ণাভ দিনের গরিমা। অনেক জায়গাই ভেঙে পড়েছে এখন। এককালে এর গম্বুজগুলো স্বর্ণাভ ছিল সম্ভবত, যেমন বেশ কিছু দূরে এখন বাংলাদেশের অন্তর্গত ছোটোসোনা মসজিদের গম্বুজে দেখা যায়। কিন্তু এগারো দুয়ার সম্বলিত এ মসজিদের নাম বারদুয়ারী কেন, পর্যটকের এ প্রশ্নের উত্তর বোধহয় এই যে—মসজিদ সংলগ্ন অঙ্গন ও পার্শ্ববর্তী জেনানা মহল বা বসার গ্যালারী প্রমাণ করে, এটির অর্থ 'অডিয়েন্স হল' বা সমবেত মিলন কেন্দ্র ছিল। কোনো কোনো সুলতান নাকি একে কাছারী হিসেবেও ব্যবহার করতেন। মসজিদেরই আশেপাশে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পাথরের টুকরো ইঙ্গিত দেয় হয়তো মাদ্রাসা নতুবা বিশ্রামশালা ছিল এসব জায়গায়। অন্তত গৌড়ের বিবরণী প্রণেতা আবিদ আলীর তাই-ই অনুমান। একটি সরকারি বাসভবন এখন তৈরি হয়েছে বারদুয়ারীর পাশে। সেখানে মিউজিয়াম রক্ষক থাকেন। অতীত ঐশ্বর্যের বিলুপ্ত সম্ভারের পাশে হালকা ইটের বাড়িটি কেমন যেন দুর্বল মনে হয়। আর একটু এগোলেই গৌড় দুর্গে ঢোকার উত্তর প্রান্তিক প্রধান

তোরণ দাখিল দরওয়াজা। এর আর এক নাম সেলামী দরওয়াজা। এখানেই সুলতানদের প্রবেশের সময় তোপধ্বনি করা হত।

এখন কান পাতলে শুধু বিষণ্ণ ঘুঘুর ডাক ছাড়া কিছুই কানে আসে না আর। ভেতরে প্রহরীদের থাকার ঘরে শুধু বাতাসের হাহাকার, দু'পাশে সুউচ্চ গড়ের ওপর যেখানে আগে সেনানীদের ছাওনি ছিল, সেখানে অরণ্য জটিল অন্ধকার রচনা করেছে। কোথাও বা তাদেরও নির্মূল করে আধুনিক মানুষ ফসল ফলাবার প্রচেষ্টা করছেন। সম্মুখে শুষ্ক প্রায় পরিখা। গল্প জানায়—ওই দরওয়াজা থেকে নাকি লোহার পাত ফেলে গমনাগমন হত। তারপর তা তুলে রাখা হত, যাতে শত্রুসৈন্য পরিখা অতিক্রম করতে না পারে। এই পরিখার জলেই কি ডুবে মরেছিলেন শেরশাহের সেনাপতি খওয়াস খাঁ?

কে উত্তর দেবে তার! আমি তোরণ পেরিয়ে পেছনের জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চলার পথ ধরে এগিয়ে বাঁহাতি ফিরোজ মিনারের কাছাকাছি এক বাঁশঝাড়ের নীচে মাটিতে শুয়ে থাকা গৌড়েশ্বরী দেবীর মূর্তির সামনে এসে দাঁড়াই। এখানে ওখানে ছড়ানো রয়েছে ইট পাথরের টুকরো। একটু দূরে পাথরের স্তম্ভ চারটি। এখানেই কি ছিল তাঁর মন্দির! একদা যেখানে নিয়মিত পুজো দিতে আসতেন গৌড়-নাগরিকেরা! এখন বছরের বিশেষ দিন ছাড়া কেউ আসেন না আর। অনাদরে অবহেলায় পড়ে আছেন এই নিভৃত অরণ্যের আড়ালে, যেন আত্মগোপন করে আছেন বেদনায়। শ্রীহীন গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ যেন আর দেখতে চান না তিনি। আমি প্রণাম করি তাঁকে। চারশো বছর আগেকার মানুষের প্রণামের ধারাকে বহমান রাখার চেষ্টা করি। পেছন ফিরতেই চোখে পড়ে বাইশগজী প্রাচীরের রেখা। বাইশগজ উঁচু এবং পনেরো ফিট চওড়া এই সুবিশাল প্রাচীরের আড়ালেই ছিল গৌড় সুলতানদের প্রাসাদ। আজ তার কোনো চিহ্ন নেই। ভেঙে গেছে প্রাচীরের পুরু দেওয়াল। দরবার, রাজকক্ষ এবং হারেমে বিভক্ত বিশাল প্রাসাদের অস্তিত্ব রেণু-রেণু হয়ে মিশে গেছে মাটিতে। অজস্র মিনা করা ইট, চিনেমাটির বাসনের টুকরো, খিলানের ভগ্নাংশ, কার্ণিশের কারুকাজ এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে আছে। বাইরে দীর্ঘশ্বাসের মতো হাওয়া এসে আঘাত করছে প্রাচীরে, ভিতরে টাঁকশাল দিঘির জল ছলছল করছে বেদনায়। বুনো ঝোপ আর বনফুলের গাছও থমকে দাঁড়িয়ে আছে।

আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে চারশো বছর আগেকার এক থমকে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের ছবি। গৌড় রাজপ্রাসাদের সম্মুখে এসে দ্বিধান্বিত পায়ে অপেক্ষা করছেন কবি কৃত্তিবাস। ফুলিয়ার কবি কৃত্তিবাস। তোরণদ্বারে প্রশস্তি লেখা আছে : 'তার তোরণ আশ্রয় দান করে আত্মাকে সুগন্ধি ওষধির মতো বন্ধুদের। একটি অনির্বচনীয় তোরণ তৃপ্তিদায়ক, স্ফূর্তিজনক জীবন আশা এবং বিশ্রামের আরাম।'

বিশ্বাস করেন কৃত্তিবাস এই প্রশস্তির ভাষা। শুনেছেন তিনি, সুলতান বারবাক শাহ ছিলেন কাব্যানুরাগী সহৃদয়। তিনি মহাপণ্ডিত বৃহস্পতি মিশ্রকে 'রায়মুকুট' উপাধি দিয়েছেন। মালাধর বসুকে দিয়েছেন 'গুণরাজ খাঁ' উপাধি। তিনি তাই সাতটি শ্লোক লিখে এনেছেন সুলতানকে শোনাবেন বলে। ভিতরে সুলতানকে ঘিরে বসেছিলেন জগদানন্দ সুনন্দ, কেদার খাঁ, গান্ধর্ব রায়, তরুণীসুন্দর শ্রীবৎস ও মুকুন্দ। স-সঙ্কোচে সেখানে প্রবেশ করে বিনম্র সুললিত কণ্ঠে তিনি পাঠ করেছিলেন শ্লোকমালা এবং অভিভূতও হয়েছিলেন সুলতান।

চন্দনের ছড়ায় অভিষিক্ত করলেন তাঁকে। রামায়ণ রচনার অনুপ্রেরণা পেলেন কবি কৃত্তিবাস। রাজসভার বাইরে অপেক্ষমান বিশাল জনতা অভিবাদন জানাল কবিকে।

ভাবতেও কেমন বিস্ময় লাগে—কত ঘটনার কথা নীরব হয়ে আছে এখানকার বাতাসে। ওই প্রাচীরের আড়ালে বসেই একদিন দূর রামকেলি গ্রাম থেকে আসা হরিনাম ধ্বনি শুনে চমকে উঠেছিলেন সুলতান হুসেন শাহ। ওই প্রাসাদেরই কোনো এক কক্ষে প্রধান মহিষী একদিন পরামর্শ দিয়েছিলেন তাঁকে তাঁর প্রাক্তন প্রভু সুবুধি রায়ের জাতি নাশ করার। ওই প্রাসাদেই একদিন হাবশী সুলতান শাহাজাদাকে নাটকীয়ভাবে হত্যা করে সিংহাসনে বসেছিলেন মালিক আন্দিল। ওখানকারই কোনো এক মেঝেতে এক লক্ষ টাকা ঢেলে তাঁর বদান্যতার পরিমাণ দেখবার চেষ্টা করেছিলেন অনুচরেরা। সুলতান উল্টো বুঝে বলেছিলেন, এত কম টাকায় কি হবে! কোথায় সেই রত্নভাণ্ডার! খাজাঞ্চীখানার গহ্বরে এখন শুধু রিক্ততা! এই প্রাসাদেই বিষ দিয়ে সনাতনকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। তা আগে থেকেই অনুমান করে গোপনে পেটিকায় কাঁচা তেঁতুল নিয়ে ভোজনে বসেছিলেন সনাতন। বিষক্রিয়া নষ্ট হয় তাতে। সুলতান পরে তাঁর এই অসাধারণ বুধিমত্তার স্বীকৃতি-স্বরূপ গৌড়ের ঘরে ঘরে তেঁতুল গাছ রোপণের আদেশ জারি করেন। এটাও হয়তো কিংবদন্তীরই গল্প। কিন্তু অসংখ্য তেঁতুল গাছ দেখে এসব গল্প মনের ভেতর আশ্চর্য আমেজ ছড়ায়।

এখান থেকেই তো দেখা যায় চিকা মসজিদ—যার ভেতরে একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্ত সনাতনকে বন্দী করেছিলেন সুলতান হুসেন শাহ। হরিনাম-মুগ্ধ মুক্তিপাগল সেই বন্দীর কোনো অশ্রু জলরেখা তার অন্ধকার বিবর্ণ দেওয়াল থেকে কবে মুছে গেছে। নেই সেই প্রহরী হাবু শেখের পদচারণা, যাকে উৎকোচে বশীভূত করে গঙ্গা সাঁতরে মহাপ্রভুর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন সনাতন গোস্বামী। চিকা মসজিদের ডান পাশে তার ঘেরা জায়গায় যে পাথরের খিলান চাপা গর্তগুলো আছে, লোকে বলে ওগুলো নাকি ফাঁসির জন্য তৈরি। সম্মুখে ওই গুমটি দরওয়াজা গৌড় দুর্গে প্রবেশের পূর্বপ্রান্তিক গোপন পথ। এখানে একটি সংগ্রহশালা হয়েছে এবং অমূল্য কিছু প্রত্নসম্পদ লোভী মানুষের হাত না এড়াতে পেরে হারিয়ে গেছে চিরকালের মতো। বাঁ পাশে লুকোচুরি দরওয়াজা—শাহসুজার তৈরি গৌড় দুর্গে প্রবেশের আর এক তোরণ। ওপরে নহবৎখানা। কল্পনার গল্প বলে—এখানে নাকি বাদশা-বেগমেরা লুকোচুরি খেলতেন। তারই বাঁ-পাশে কদম-রসুল, সেখানে হজরত মহম্মদের পদচিহ্ন রাখা হয়েছিল। এখন সেটি নিকটবর্তী মহদীপুর গ্রামের খাদেমের কাছে আছে। তার কাছেই ফতে খাঁর সমাধি, যার গঠন-কৌশল মনে করিয়ে দেয় এটি কোনো হিন্দুমন্দির ছিল। ইতিহাস বলে—রাজা গণেশ নাকি এটি তৈরি করিয়েছিলেন। কেউ কেউ বলেন গৌড়েশ্বরীর মন্দির ছিল এরই আশেপাশে!

কদম রসুলে রক্ষিত মহম্মদের পদচিহ্ন নবাব সিরাজদৌল্লা নিয়ে যান, পরে মীরজাফর আবার তা গৌড়ে পাঠান। এটি আরব দেশ থেকে প্রথম আনেন একজন পীর, সঙ্গে একটি নিশান। সেটি এখন পাণ্ডুয়াতে আছে। কদম রসুলের ভেতরে একটি কাঠের ভাঙা বাক্স দেখা যায়। কথিত আছে, ওইটির ভেতরে করেই নাকি এগুলো আনা হয়েছিল। প্রাঙ্গণের বাইরে আজও বিশাল বিশ্রামশালার কঙ্কাল দাঁড়িয়ে।

এখন কে আসবেন আর এখানে বিশ্রাম নিতে ! যেমন কেউ আর আসেন না ওই দূরের 'চিরাগদানী'-র মাথায় আলো জ্বেলে কোনো সংকেত জানাতে। ওই চিরাগদানীরই অপর নাম 'পীর আসা মন্দির' বা 'ফিরোজ-মেশর'! এটি তৈরি করেছিলেন সেই মালিক আন্দিল, খেয়ালী দানবীয় পরাক্রমী এক গৌড় সুলতান। আমি ওই মিনারের দিকে তাকালে এখনো এক ভয়ানক দৃশ্য যেন স্পষ্ট দেখতে পাই! মিনার তৈরি শেষ হলে সম্রাট ফিরোজ শাহ, যাঁর অপর নাম মালিক আন্দিল, রাজমিস্ত্রীসহ উঠেছেন মিনার শীর্ষে। গর্বিত মিস্ত্রী বলে—আরো মালমশলা পেলে আরো ভালো, আরো উঁচু করে গড়তে পারতাম এই মিনার। আনন্দিত ফিরোজ শাহর কানে কথাটি তীব্র এক ব্যঙ্গের আঘাতের মতো বাজে। ক্রুধ হয়ে পড়েন অমিতব্যয়ী সুলতান। সামান্য মিস্ত্রীর এই স্পর্ধার উক্তিকে মুহূর্তমাত্রও সহ্য না করে তাকে নীচে ফেলে দেবার আদেশ দেন তিনি। তারপর এক মর্মান্তিক আর্তনাদ ভেসে ওঠে গৌড়ের বাতাসে।

ক্ষিপ্ত সুলতান নীচে নেমেই আদেশ করেন ভৃত্য হিংগাকে—তুই এখনি মোরগাঁয়ে যা। বিমূঢ় হিঙ্গা যাবার কারণ না জেনেই চলে যায়। সেখানে তাকে চিন্তিত দেখে এক তীক্ষ্ণধী ব্রাহ্মণ বলেন—এখানে রাজমিস্ত্রীর বাস, তুমি তাদের একজনকে নিয়ে যাও।

হিঙ্গা ফিরলে চমকে ওঠেন সুলতান। তৎক্ষণাৎ সেই ব্রাহ্মণকে ডেকে উচ্চ রাজপদে সম্মানিত করেন। এই ব্রাহ্মণই সেই সনাতন, সনাতন গোস্বামী। হয়তো এও কল্পনার গল্প। লুকোচুরি দরওয়াজা পেরিয়ে মহদীপুরের দিকে যেতে যে সুন্দরতম লোটন মসজিদ, তাকে ঘিরেও এমন গল্প। ওই চামকাটি মসজিদ যেখানে আগে গৌড়ের চর্মকারদের পাড়া ছিল, তাঁতিদের পাড়ায় ছিল তাঁতিপাড়া মসজিদ, কাঁচারাস্তা ধরে এগোলে পাঁচ খিলানের সাঁকোর কাছে গুণমন্ত মসজিদ—এসবকে ঘিরেই তো নানা কাহিনির মায়াজাল। ওই লোটন বিবির কাছেই নাকি প্রতি সন্ধ্যায় সম্ভ্রান্ত বুদ্ধিজীবী গৌড় নাগরিকেরা সমবেত হতেন। ওই পাঁচ খিলানের পাথরের সাঁকোর নীচ থেকে গুপ্তধন পাওয়া গিয়েছে নাকি অনেকবার।

অনুরূপ আর একটি পাথরের সাঁকো আছে কোতয়ালী দরওয়াজা যাবার রাস্তায়। কোতয়ালী দরওয়াজা গৌড়দুর্গে প্রবেশের দক্ষিণ প্রান্তিক তোরণদ্বার। এখানেই আগে প্রধান সামরিক ঘাঁটি ছিল। এখনো আছে। না, সেই সুলতানদের নয়, এ যুগের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর। ওপারেই যে বাংলাদেশ! আগে ছিল যা পাকিস্তান নামে চিহ্নিত এক অগম্যস্থান।

এখন অনুমতি নিয়ে ওপারে গেলে চোখে পড়বে ছোটোসোনা মসজিদ। তার পাশে সাম্প্রতিক মুক্তিযুদ্ধে নিহত এক সেনানীর সমাধিস্থান। একই মাটি দুটি যুগের দীর্ঘ ব্যবধানকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছে যেন। যেতে পথে পড়বে তহুখানা। নির্জন প্রান্তরে এক বিশাল আবাসগৃহ আর সংলগ্ন এক মসজিদ। গৌড়ে সম্ভবত এটিই এখন একমাত্র আবাস-গৃহ, যা কালের এবং অত্যাচারী মানুষের হাত এড়াতে পেরেছে।

এখানে বাস করতেন গৌড়ের বিখ্যাত পরিব্রাজক শাহ নিয়ামতুল্লা। এখন তাঁরই এক বংশধর বাস করেন। অন্তত আমার বিস্ময়কে চমকে দিয়ে সেই নির্জন অট্টালিকা থেকে যে বৃধ মানুষটি বেরিয়ে এলেন, তিনি তাই জানালেন।

আমি বিস্মিত চোখে সেই বাড়িটি এবং এই মানুষটিকে দেখছিলাম। গৌড়ের সুলতানদের অনেক পরিচয় নানা গ্রন্থে—শিলালিপি, পুঁথি, তাম্রলেখতে আছে। কিন্তু তখনকার সাধারণ

মানুষ কিভাবে জীবনযাপন করতেন তার নজির বড়ো একটা কোথাও পাওয়া যায় না। পার্শ্ববর্তী মহদীপুর গ্রামের হাইস্কুলের শিক্ষক মহাশয় শ্রীসৌমেন পাণ্ডের প্রযত্নে এমন একটি মূল্যবান সংগ্রহশালা স্থাপিত হয়েছে। সেখানে গৌড় নাগরিকদের ব্যবহৃত পাথরের একটি আশ্চর্য ট্রাঙ্ক বা স্যুটকেশ, বিভিন্ন তৈজসপত্র, গৃহস্থের মঙ্গলশঙ্খ, পুরনারীর গলার মালা, জলপাত্র ইত্যাদি দুর্লভ সামগ্রী আছে। এসব জিনিস অন্য কোনো সংগ্রহশালায় আছে বলে আমার জানা নেই। যাঁরা অনুসন্ধিৎসু গবেষক, গৌড়ের প্রাচীন জীবনযাত্রার অনেক মূল্যবান সাক্ষ্য সেখানে গেলে তাঁরা দেখতে পাবেন। ওই বিদ্যালয়ের শিক্ষক মহাশয়দের কাছে জাতি হিসেবেই আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা কর্তব্য। একবার টেস্ট রিলিফের কাজের সময় মাটির গর্ভ থেকে সংগৃহীত এক মাটির হাঁড়িতে একজোড়া সোনার খড়ম, মসলিন, কয়েকজোড়া শাঁখা পাওয়া যায়। আমি তার মধ্যে থেকে একটি শাঁখা সংগ্রহ করি। আজও সেটির দিকে তাকালে বহু যুগ আগের এক গৌড়নারীর শঙ্খশুভ্র হাত যেন স্পষ্ট দেখতে পাই।

মহদীপুর থেকে গড়ের চিহ্ন দেখা যায়। অনুমান করি, এটি গৌড় শহরের একটি দক্ষিণ-প্রান্তিক সীমারেখা। এর ওপরে এককালে সেনাবাহিনীর ছাউনী ছিল, কামান গর্জে উঠত। বহুকাল পর, প্রায় চারশো বছর পেরিয়ে গিয়ে বজ্রনির্ঘোষ আবার বেজে উঠেছিল পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের সময় ঠিক সেইখান থেকেই।

কিছুদিন আগে ওখান থেকে প্রাচীন যুগের একটি নরকঙ্কাল পাওয়া গেছে। বর্তমানে এই গড় কেটে যে রাস্তা তৈরি হয়েছে, তা ধরে এগোলে গুণমন্ত মসজিদ পাওয়া যাবে। তার পাশেও সাময়িকভাবে আস্তানা বানানোর সময় শরণার্থীরা একজন সুলতানের কবর আবিষ্কার করেন। কিছুই ছিল না ভেতরে বা ছিল কিনা জানার কোনো উপায় নেই আর। শুধু সেই শূন্যগর্ভ ইটে বাঁধানো সমাধিভূমি এক রহস্যময় অন্ধকারে ঢেকে রেখেছে নিজেকে।

এমন সমাধিভূমি অনেক আবিষ্কার করেছেন এর আগে অনুসন্ধিৎসু বা রত্নলোভী মানুষেরা। ফলে সুলতানদের সমাধিভূমিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বাইশগজীর কাছে খাজাঞ্চীখানার উত্তর-পূর্বে বাংলাকোট নামে জায়গায় আগে যেখানে তাঁদের সমাধিস্থান ছিল, ১৮৪৬ সাল নাগাদ তা ধ্বংস করে ফেলেন সম্পদ-লিপ্সু মানুষ। এমনভাবেই হারিয়ে গেছে পিঠাওয়ালী মসজিদ এবং নিম দরওয়াজা—যা দেখতে অনেকটা দাখিল দরওয়াজার মতো। বাংলাদেশের অন্তর্গত হওয়াতে এখন অনেক মসজিদই এপারের পর্যটকদের চোখে পড়ে না। বাংলার মতো গৌড়ও দ্বিধা-বিভক্ত হয়েছে।

লোটন মসজিদের সামনে দিয়ে ফিরে আসার সময় আবার থমকে দাঁড়াতে হয়। চাষের জন্য জমিতে কোদাল চালাচ্ছিলেন এক কৃষক। ঠিকরে উঠছিল ছোটো ছোটো প্রাচীনকালের ইট। হঠাৎই সেখানে বেরিয়ে পড়ল এক গৃহস্থবাড়ির ভিত। দ্রুতপায়ে এগিয়ে গিয়ে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। সম্ভবত কুমোরবাড়ি ছিল এটা। সারি সারি সাজানো মাটির হাঁড়ি, নানা ধরনের পাত্র, মৃৎপ্রদীপ। হাঁড়ির ভেতরে কিছু আছে ভেবে উত্তেজিত হাতে কয়েকটি ভাঙাও হল। না কিছু নেই। আমি কয়েকটি পাত্র আর মৃৎপ্রদীপ সংগ্রহ করলাম। তাঁতিপাড়ার পাশে এটা কি তবে গৌড়ের কুমোরপাড়া ছিল?

তাঁতিপাড়ার কাছে ওই ছোটো ছোটো যে সাগরদিঘি, তার পাড়ে যে বড়ো একটা অট্টালিকার ভিত, সেটা কি চাঁদ সওদাগরের ভিটে?

কদম রসুলের কাছে যে কুম্ভীর-পীরদিঘি আর তার জলে যে বড়ো কুমীরটি ছিল, সেই কি লোকশ্রুতির সেই পীরসাহেব? নিছক কল্পনার গল্প হয়তো এটিও।

তবু আজও যখন গৌড়ের সেই শিখাহীন মৃৎপ্রদীপের দিকে তাকিয়ে থাকি—ইতিহাস, কিংবদন্তী, বিশ্বাস আর কল্পনার আলো চোখের সামনে অতীতের গৌড়-লক্ষ্মণাবতী-লখনৌতির ছবি ফুটিয়ে তোলে।

১৭৮৬ ও ১৮০৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে মিস্টার ক্রাইটন সর্বপ্রথম গৌড় খনন করেন। তারপর ১৮০৮ সালে ডঃ বুকানন হ্যামিল্টন, ১৮১০-১১-তে মেজর ফ্রাঙ্কলিন এবং পরে র‍্যাভেনশ, রজনীকান্ত চক্রবর্তী, আবিদ আলি, অক্ষয়কুমার মৈত্র প্রমুখ গৌড়ভক্ত ঐতিহাসিক পরিব্রাজক গবেষকদের প্রচেষ্টায় অতীতের গৌড়ের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় এবং বিলুপ্তপ্রায় স্মারক চিহ্নের পরিচয় আমরা পেয়েছি। বিভিন্ন যুগে দেশি-বিদেশি বহু পরিব্রাজক এসেছেন গৌড়ে। ষোড়শ শতকে পর্তুগিজ পরিব্রাজক জোঁ-আ-দে বারোস গৌড়ের রাজপথের বর্ণনা করছেন—রাস্তাগুলো খুব চওড়া আর সোজা। প্রধান প্রধান রাস্তাগুলোতে দেওয়াল বরাবর সারি সারি গাছ লাগানো। এখানকার লোকের সংখ্যা খুবই বেশি এবং যানবাহনের ভীড়ে রাজপথগুলো সমাকীর্ণ। বৈষ্ণব কবির কাব্যে আছে 'জনসংঘট্টে পথ চলিতে না পারি।' যারা রাজসভায় যেতে চান তাদের ভীড় এত বেশি যে, তাদের একজন আর একজনকে অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে পারে না। এই শহরের একটা বড়ো অংশ সুরম্য ও সুনির্মিত প্রাসাদে ভর্তি।

ইবন্-বতুতা, ওয়াংতা-ইউয়ান, ফা-হোয়ান, ফে-ই-শিন, নিকলো কন্তি, বারবোসা, ভারথেমা প্রমুখ বিদেশি পর্যটক, বৃহস্পতি মিশ্র, কৃত্তিবাস, সনাতন, বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস, জয়ানন্দ প্রমুখ কবি-মনীষীদের রচনায় গৌড় বহুবার স্ব-পরিচয়ে ফুটে উঠেছে।

রজনীকান্ত চক্রবর্তী তাঁর 'গৌড়ের ইতিহাস' গ্রন্থে এক অপূর্ব স্বপ্নময় ছবি প্রত্যক্ষ করেছেন মানসচোখে—পাঠককে দেখাতে চেয়েছেন সেই ছবির অপরূপতা।

'পাঠক, গঙ্গার মধ্যে থাকিয়া মানসচক্ষে একবার গৌড়নগর দর্শন করুন, সমুদায় বাঁধের উপরিভাগ দালান কোঠায় ভরা; প্রকাণ্ড নগরের সমুদায় অংশই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকায় আচ্ছন্ন।'

লিখছেন রজনীকান্ত—

'উপনগর ধরিলে গৌড় ২১ মাইল লম্বা ও ৩/৪ মাইল চওড়া হয়। ...উত্তরে চাঁদদ্বার, দক্ষিণে কোতয়ালিদ্বার, পূর্বে মৃৎপ্রাচীর, পশ্চিমে ভাগীরথী—ইহাই পাঠানদের সময়ে গৌড়ের সীমা।... গৌড়নগর কতিপয় টোলা, টুলি ও পটীতে বিভক্ত ছিল।

...দেশের সর্বত্র ব্যায়াম চর্চার আখড়া ছিল। সেকালের বাঙালি এখনকার বাঙালির অপেক্ষা বলবান ছিল। দলাদলির চোট এদেশে খুব ছিল।

...যতদিন গঙ্গা, গৌড়ের নিকট দিয়া প্রবল স্রোতে প্রবাহিত ছিল, ততদিন গৌড় স্বাস্থ্যকর ছিল। যখন গঙ্গার স্রোত কমিয়া গেল তখন গৌড়ের ময়লা জল তাহাকে আরো দূষিত করিতে লাগিল, সেইদিন হইতে গৌড়ের স্বাস্থ্য নষ্ট হইতে লাগিল।'

নষ্টস্বাস্থ্য গৌড় তারপর একদিন ঢেকে গেল অবহেলার ঘন অরণ্যে। ধনলোভী তস্করের দল মাঝে মাঝে এসে লোভী হাতে আঘাতে আঘাতে ভেঙে দিতে লাগল সেইসব সুরম্য অট্টালিকা, ইটের পাঁজর ভেঙে মুমূর্ষু গৌড়ের মৃত্যু ঘটালো হিংস্র ডাকাতেরা।

ধ্বংস হয়ে যাওয়া মহানগরীর লুণ্ঠিত সম্পদ নিয়ে গড়ে উঠতে লাগল নতুন জনপদ। শুধু অতীত বৈভবের সাক্ষী হিসেবে দাঁড়িয়ে রইল কয়েকটি মসজিদ, ভগ্ন প্রাচীর, আর ভগ্নশীর্ষ মিনার।

এখন সবই কেমন অবিশ্বাস্য মনে হয়। স্থানীয় মানুষেরা এইসব অতিকায় মিনার মসজিদ দেখিয়ে বলেন—এসবই নাকি জিন-পরীদের তৈরি। যুক্তিনিষ্ঠ মন হাসতে গিয়ে যেন এক অলৌকিক বিশ্বাসের মায়ায় জড়িয়ে পড়ে। নির্জন এই শ্মশানভূমির শূন্যতার ভেতর ওই সব বিশালাকার সৌধগুলো মনে হয় না যেন কোনো মানুষের তৈরি, এখানে কখনো কোনোদিন জনবসতি ছিল। এখন অবশ্য গৌড়ের ভেতর অনেক জায়গায় চাষাবাদ শুরু হয়েছে, জনবসতিও গড়ে উঠেছে। আশেপাশে কদমতলি, খিড়িক, মহদীপুর গ্রামের লোকসংখ্যাও কিছু কম নয়। রাখাল বালকের বাঁশীর সুর, কৃষকের উচ্চকণ্ঠ আলাপ, হালের বলদের লেজ ঝামটানো, আমবাগানে প্রহরারত মানুষের হাঁকডাক এখন গৌড়ের বাতাসকে চঞ্চল করে তোলে। শীতের সময় আসেন অসংখ্য দর্শনার্থী আর পিকনিক পার্টি।

কাজের শেষে সবাই ফিরে যায়। বিষণ্ণ সন্ধ্যা নামে গৌড়ের বুকে। কোটি কোটি জোনাকি গৌড়ের অসংখ্য পলাতক অতৃপ্ত আত্মার মতো তাঁদের ফেলে যাওয়া সম্পদ খুঁজতে পাগলের মতো ছোটাছুটি করে, তেঁতুলগাছের পাতা লোটনবিবির পায়ের নূপুরের মতো বাজে, তীব্র যন্ত্রণার আকুতির মতো ফিরোজ মিনারের নীচে ঝিল্লির একটানা সুর শোনা যায়। বন্দী জীবনের চাপা দীর্ঘশ্বাসের মতো ডুকরে ওঠে চিকা মসজিদের ভেতরের বাতাস, দাখিল দরওয়াজার কাছ থেকে প্রহর ঘোষণা করে শেয়ালেরা, বাইশগজী প্রাচীর ম্লান ছায়া ফেলে দিঘির জলে, পিয়াসবাড়ি দিঘির জল আকণ্ঠ তৃষ্ণা নিয়ে জেগে থাকে। এখন কতকাল তাদের আরো অপেক্ষা করে থাকতে হবে কে জানে! নেতাজি সুভাষচন্দ্র নাকি একবার গৌড়কে স্বাধীন বাংলার রাজধানী করবেন বলে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত মহাবিদ্যালয়ের নামের সঙ্গেও জড়িত করেছিলেন গৌড় শব্দটিকে।

কিন্তু তারপর তেমন ব্যক্তিগত ভালো লাগা বা সরকারি উদ্যোগের কোনো উল্লেখযোগ্য চিহ্ন আর চোখে পড়ে না। গৌড় দেখবার জন্য গাইড নেই, পুস্তিকাও নেই। অবশ্য কদম-রসুলের খাদিমের কাছে মিলল মহদীপুরের কৃষ্ণকমল সরকারের লেখা গৌড় ও পাণ্ডুয়া ভ্রমণ সহায়িকা বইটি। সম্ভবত এ ধরনের পুস্তিকার সংখ্যা বেশি নেই। গৌড়ে থাকবার জন্য তেমন সুব্যবস্থাও নেই। অথচ বাংলার সবচেয়ে রূপময় এই ঐতিহাসিক স্থানটি নাকি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের আওতায়। কলকাতা থেকে বাসে বা ট্রেনে মালদায় গিয়ে ট্যুরিস্ট লজ বা হোটেলে থেকে প্রায় এগারো মাইল দূরবর্তী গৌড় দেখতে যেতে হয় ট্যাক্সি বা ঘোড়ার গাড়ি চড়ে। আর গিয়ে শুধু রাস্তার দু'ধারে যে মসজিদ মিনার আছে তাই দেখেই ফিরে আসতে হয়। সমগ্র গৌড়ের কোনো ছবিই তাতে ফুটে ওঠে না।

সম্রাট লক্ষ্মণ সেনের লক্ষ্মণাবতীর চিহ্ন আজকের গৌড়ে আর নেই। মালদহ শহর থেকে কিছু দূরের ওই বাগবাড়ি, অমৃতি গ্রাম-সাদুল্লাপুরের মহাশ্মশান, বড়ো সাগরদিঘি

আর মহদীপুর বা গৌড়-মালদার সংগ্রহশালার কয়েকটি নিদর্শন থেকে তার আংশিক পরিচয় পাওয়া যায়।

এখন শুধু বখতিয়ারের লখ্নৌতি বা পরবর্তীকালের পাঠান আফগান হাবশী আর বাঙালি সুলতানদের শেষ কিছু পরিচয় বুকে ধরে গৌড় অন্তিম মুহূর্তের প্রতীক্ষা করছে। না, তা হয়তো নয়। এখন পর্যটকরা গেলে দেখতে পান, প্রত্নসৌধগুলো ঘিরে রচিত হয়েছে নয়ন-শোভন ফুলবন পরিচ্ছন্নতার স্পর্শ সৌধের ভেতরে-বাইরে। সন্দেহ নেই র‍্যাভেনশ, হেনরি ক্রেটক, জেমস রেনেল, কানিংহাম, ল্যব্লঁ, ফেরিয়া ইসুসা, আবিদ আলি প্রমুখেরা যে গৌড় দেখেছিলেন এ গৌড় সেই ধ্বংসাবশেষে আকীর্ণ অতীতের স্মৃতি গৌরবময় গৌড় নয়। এ গৌড় অনেক সাজানো। আধুনিক কেরামতির স্থূল কৌশলে কৃত্রিমতার স্পর্শ লেগেছে প্রাচীনত্বের শরীরে। কল্পনাপ্রবণ পর্যটকের চোখে হয়তো বা বেমানান-ই মনে হয়। কিন্তু একথা মান্যতা পাবে, এরও প্রয়োজন আছে। হারানো-প্রায় বৈভবের অবশিষ্টাংশটুকু রক্ষা করার এও এক অবশ্যপালনীয় কর্মসূচি বৈকি। তাছাড়া ঐতিহাসিকদের অনুসন্ধান প্রবণতার একাগ্রতা তো এখন কার্যকর হয়ে উঠছে স্থানীয় উদ্যমে, বেসরকারি ও সরকারিভাবে নানা উদ্যোগে।

গবেষকরা চিহ্নিত করেছেন প্রাক্ মুসলমান যুগের গৌড়ের প্রত্নস্থলগুলো। যেমন পাতালচণ্ডী। এ জায়গাটি এখনকার গৌড়-মালদা রেল স্টেশন থেকে দু'কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে, কালাপাহাড় গড় থেকে এক কিলোমিটার দূরত্বে। এর পাশ দিয়ে এক সময় বয়ে যেত ভাগীরথী। সেন যুগের শেষ দিকে এখানে গড়ে উঠেছিল বাণিজ্য বন্দর। এখানকারই অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম পাতালচণ্ডী। এই দেবীর উল্লেখ আছে পদ্মপুরাণে। সেখানে যে ১০৮টি প্রধান তীর্থের নাম আছে তার মধ্যে পুণ্ড্রবর্ধনের পাতালচণ্ডীর নাম উল্লেখযোগ্য। রামায়ণে লঙ্কাকাণ্ড, লোহাগড় ও পাতালবাসিনী চণ্ডীর বর্ণনা আছে, মহীরাবণ বধের জন্য শ্রীরামচন্দ্র লোহাগড়ে চণ্ডীপুজো করেন। এই কাহিনিকে উদ্দীপিত করে এখান থেকে পাওয়া পাথরে খোদাই হনুমান মূর্তি। ইতিহাস বলে, এখানে ছিল গৌড়ের পোতাশ্রয়—যা সমর্থন করে বাণিজ্যতরী বাঁধার লোহার শেকল। আমার বাবা গ্রামে স্কুল পরিদর্শনে এদিকে এসে সেই শেকল দেখে আমাকে বলেছিলেন গৌড়ের জাহাজঘাটার কথা। এখানে এখনো দেবীর মূর্তি-অবশেষ পূজিত হন। মালদা-গৌড় সড়কে কাঞ্চনটাড়ের কাছের গড়টির নামই লোহাগড়।

ইতিহাস আর কিংবদন্তী দ্বৈতকণ্ঠে কথা বলে গৌড়ের বাতাসে। ওই গৌড়েশ্বরী, ওই পাতালচণ্ডী, ওই দ্বারবাহিনী, ওই জহরাতলা —এসবই গৌড়ের হিন্দু যুগের স্মৃতি হয়ে এখনো জাগ্রত।

ওই যে মালদহ-রাজমহল রোডের ধারে বাগবাড়ি বা বল্লালবাড়ি পেরিয়ে অমৃতি গ্রামের কাছে পিছলি, অনুমান আর অনুসন্ধান যৌথস্বরে জানায়— সেন আমলের গৌড় ছিল এখানেই। সাম্প্রতিক কালের খননকাজ অনুমানের সাক্ষী হিসেবে ইতিহাসের হাতে তুলে দিয়েছে অনেক প্রত্নসম্পদ।

খরবা থানার সামসী রেল স্টেশনের পাশে যে কাণ্ডারণ তা'ও প্রত্ন-ঐশ্বর্য ইতিহাস গর্ভ। স্থানীয় গবেষকদের একাংশ মনে করেন ওখানেই ছিল প্রাচীন গৌড়। এখানকার

বিশাল গড় দৈর্ঘ্যে প্রায় বারো কিলোমিটার, প্রস্থে আধ কিলোমিটার, চারদিকে পরিখা। উঁচু টিলা, ডসন ভিটা, বস্টুপাল নামে গ্রাম, টিবির অভ্যন্তর থেকে পাওয়া অসংখ্য মূর্তি স্থানটির ঐতিহাসিক গুরুত্বের কথা মনে আনে। মালদা-গৌড় সড়ক থেকে মহাশ্মশান সাদুল্লাপুরে যাবার রাস্তার ধারে যে বিশাল বড়ো সাগরদিঘি বা গৌড়ের সাগরদিঘি তার জলেও ভাসে সেন আমলেরই স্মৃতি। এই ছোটো সাগরদিঘির উত্তরদিকে চাঁদসদাগরের ডিঙ্গি নামের জায়গা খননের ফলে বেরিয়েছে পাথরের নক্সাযুক্ত পাথর। নিঃসন্দেহে হিন্দুযুগের নিদর্শন। গৌড়ের চিকা মসজিদের সামনে ও পেছনে যে সুড়ঙ্গের আভাস পাথর চাপা হয়ে আছে গবেষক অনিরুধ রায় অনুমান করেছেন, ওখানে হয়তো হিন্দুযুগের প্রাসাদের অস্তিত্ব ছিল! 'এটা অনুমান করা যেতে পারে লক্ষণাবতীর পুরনো প্রাসাদ এখানে ছিল যেটি সুলতানেরা বদল করে ব্যবহার করেছেন।'

এইসব অনুমান আর কল্পনায় আচ্ছন্ন পর্যটকের মনের আবেগ—লক্ষ্মণাবতীর প্রকৃত অবস্থান মালদা জেলার কতটা অংশ জুড়ে আছে! কবে কখন কে বা কারা একাজ সম্পূর্ণ করবেন কে জানে! কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস অনুসরণের দায় থেকে এ কাজ হবার নয়। তা যদি হত তাহলে স্বাধীনতা লাভের এত বছর পরেও তেমন উল্লেখযোগ্য দু-একটা কাজ ছাড়া তেমন কই আর কিছু হয়েছে! দুটি উল্লেখযোগ্য কাজের একটি হল মালদার হবিবপুর থানার তুলাভিটা খননের ফলে আবিষ্কৃত জগজীবনপুর মহাবিহার। বৌধ ধর্মাবলম্বী পাল রাজত্বকালের সাক্ষ্য হিসেবে এই মহাবিহার বিশালতায়, পোড়ামাটির কাজের ঐশ্বর্যে রাজসাহীর পাহাড়পুরের বৌধবিহারের সঙ্গে অবশ্য তুলনীয়। আর একটি হল, গৌড়ের রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন অঞ্চলের খনন কাজ। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ২০০৩ সালের জানুয়ারি মাসে প্রথম পর্যায়ের খনন কাজ শুরু করে। শেষ হয় এপ্রিল মাসে। টাঁকশাল দিঘির পশ্চিমে একটি টিলার পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় ৮৫ বর্গ মিটার এলাকার ৫৪ বর্গ মিটার খননের ফলে বেরিয়েছে সৌধের ভিত, পিলারের গোলাকার অংশ, পাঁচ-ছটি সিঁড়ির ভাঙ্গা ধাপযুক্ত একটি ইটের তৈরি গোলাকার গাঁথুনির অংশ. পাওয়া গেছে মাটির বড়ো বড়ো পাত্র, বড়ো বড়ো লোহার কাঁটা, একটি পোড়া কাঠের গুড়ি, কাঠ-কয়লা। অনেকের অনুমান, এ হল প্রাসাদের দরবার কক্ষ। শেরশাহ্ এই কক্ষ ধ্বংস করেছিলেন আগুন লাগিয়ে। এইসব দগ্ধ সামগ্রী তারই নিদর্শন। গৌড়ে দ্বিতীয় পর্যায়ের খননকাজ হয় ২০০৩-এ। এটি ভাগীরথী মজাখাতের পাশে জাহাজঘাটায়, প্রাসাদের পশ্চিম পাশে। এক সময় এখান দিয়ে ভেসে যেত বাণিজ্য-পোত। এই ঘাটে সেগুলো বেঁধে রাখা হত শেকল দিয়ে। সেই শেকলও পাওয়া গেছে। জাহাজঘাটার দক্ষিণে খাসমহলে, স্থানীয়জন যাকে বলেন হাওয়া মহল, সেখানে পাওয়া গেছে আর একটি সৌধের ভিত্তিভূমি।

তৃতীয় পর্যায়ের খননকাজ হয় ২০০৪-এর নভেম্বরে, প্রাসাদের বাইশগজী প্রাচীরের বাইরে উত্তর-পূর্ব দিকে বাংলা-কোট এলাকায়। এই এলাকাটি হুসেন শাহ্ এবং তাঁর পরিবারের সমাধিস্থল। গৌড়-পতনের পর অসভ্য দস্যুদল এই স্থানটিতে তাদের লুণ্ঠনের মাত্রা বাড়িয়ে দেয় ধনদৌলত লাভের আশায়। আর সভ্য ভদ্র ইংরেজরা ক্যাপ্টেন অ্যান্ডারসনের নির্দেশে এই সমাধি স্থলের বহুমূল্য পাথর ও মীনা করা ইট নিয়ে যায় কলকাতায় ফোর্ট

উইলিয়াম দুর্গ তৈরির জন্যে। ভ্যান্ডালিজমের দুই রূপ— অমার্জিত এবং মার্জিত। ২০০৫ সালে অসম্পূর্ণ অবস্থায় এই খননকাজ বন্ধ রাখা হয়।

আমি দাঁড়িয়েছিলাম খনিত প্রাসাদের বুকের গভীরে। এই সেই প্রাসাদ দুর্গের অভ্যন্তরভাগ ক্রেটন সাহেবের বর্ণনায় যা এক মাইল লম্বা, আধ মাইল চওড়া এলাকার মধ্যে এই সাতশো গজ লম্বা ও তিনশো গজ চওড়া, বাইশগজী প্রাচীর দিয়ে ঘেরা এক নির্জন অংশে। তিন ভাগে বিভক্ত এই অংশটিই ছিল দরবার কক্ষ। এরপর সুলতানের মহল। তারপর জেনানা মহল। ইংরেজ বণিক উইলিয়াম হেজেস ১৬৮৩ সালে এই প্রাসাদকে প্রায় অভগ্ন অবস্থায় দেখেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল কনস্টান্টিনোপলের প্রাসাদের থেকেও এটি বড়ো।

অদ্ভুত অবিশ্বাস্য মনে হয় আজ। রিক্ত শূন্য প্রাসাদের গভীরে দাঁড়িয়ে অতীতে সকলের চোখে দেখা এই প্রাসাদ আমার কল্পনায় মূর্ত হয়ে ওঠে। ওই দাখিলদরওজা পার হয়ে চাঁদ দরওজা নিমদরওজা পেরিয়ে এই বিশাল দরবার কক্ষ, ওই সুলতানদের ঐশ্বর্যময় খাসমহল যেন চোখে ভাসে। ওই তো জেনানা মহল থেকে গোপনপথ পেরিয়ে ভাগীরথী তীরে পদচারণায় বেরিয়েছেন বেগমেরা—ওই তো কিছু দূরেই সেই লালবাজার, যেখানে পসরা সাজিয়ে বসেছে গৌড়ের পসারীরা। কান্না, হাসি, অশ্রু, আনন্দ, কলরবে মুখর রাজপ্রাসাদ আমার চারপাশে সজীব হয়ে ওঠে। কে জানে এই দরবারের কোন্‌খানে বসতেন সাকর মল্লিক আর দবীর খাস, রূপ আর সনাতন গোস্বামী! কোন্‌খানেই-বা মালিক আন্দিলের হাতের কৃপাণ শোণিতাক্ত লোভে ঝলসে উঠেছিল তার প্রভুর গর্দান লক্ষ্য করে! কত জন্মদিনের উল্লাস, কত হত্যালীলার শ্বাসরোধকারী ভয়ংকর আর্তনাদ, কত মান-অভিমানের মৃদু হাওয়া, কত কলহের ঝোড়ো বাতাস একদিন এই প্রাসাদের অভ্যন্তরে ছোটাছুটি করছে! শুধু ওই ওপরের আকাশ সেসব দেখেছে। এই প্রাসাদের বৈভবের উজ্জ্বলতা, এই প্রাসাদের ধ্বংসের অন্ধকার নির্মম নিস্পৃহ উদাসীনতায় শুধু সে দেখে গেছে! আকাশের যদি ভাষা থাকত তাহলে আনুপূর্বিকভাবে সবই সে বলে দিতে পারত।

সম্বিৎ ফেরে সহযাত্রী অসিত আর টানটুর জিজ্ঞাসায়।

—এগুলো ঠিক কি বলুন তো?

হ্যাঁ, আমিও জিজ্ঞাসু! এই যে পায়ের নীচে গোল গোল স্তম্ভাংশ, বাঁধানো চৌকো মতো অংশ, বাস্তবিক এগুলোর গঠন-কৌশল কি প্রাসাদকে ধরে রাখার খিলান হতে পারে? পাশে পয়ঃপ্রণালী আর পশ্চিম দিকের ওই যে ভাগীরথী—এটা কি জল শোধনাগার, অথবা মুদ্রা তৈরির কারখানা? পাশের টাঁকশাল দিঘি কি তার-ই ইঙ্গিতবাহী? মালদার গবেষক কমল বসাকও বলেছিলেন তাঁরও সন্দেহ আছে আবিষ্কৃত এই অংশ ঠিক দরবার কক্ষের নয়। ওই পোড়াকাঠ, কাঠকয়লা কোন্ সম্ভাবনার কথা জানায়?

হয়তো এ প্রশ্নের মীমাংসা একদিন হবে। কিন্তু আবার মনে হয়, কেউ একজন যদি আন্তরিক ভালোবাসায়, প্রভূত পরিশ্রমে, অক্লান্ত তথ্য সংগ্রহে একনিষ্ঠ গবেষণায় সমগ্র গৌড়ের নিঁখুত ছবিটি লিপিবদ্ধ করতে পারতেন খুব বড়ো একটা কীর্তির স্বাক্ষর হয়ে থাকত তা! নবীন কোনো গবেষকের সারাজীবনের কাজ যেন বিছিয়ে রেখেছে গৌড়, কে কবে সে কাজ করবে আমি জানি না।

শুধু স্মৃতিভারে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে মন। গৌড়ে এলে বার বার মনে পড়ে পাঁচশো বছরের এই বিশাল গৌড়ের প্রতিটি দিন প্রতিটি রাত কেমনভাবে কাটত গৌড়-নাগরিকদের! এই যে অপরাহ্ন নেমে এসেছে, এ সময় কতজন কত ভাবেই না সময় কাটিয়েছেন, কেউ গল্পে, কেউ কলহে, কেউ হাসিতে, কেউ গভীর দুঃখে, কেউ কবিতায়, কেউ গানে—এভাবে প্রতিটি প্রহরে জন্ম-মৃত্যু লীলার কত খেলাই না এখানে হয়েছে একদিন—তারপর সব ছবি জল দিয়ে শ্লেট থেকে নিঃশেষে যেন মুছে দিয়েছে সময়। অবিশ্বাস্য মনে হয় কল্পনায়—সত্যিই কি একদিন জীবনের কোলাহলে মুখর ছিল এই গৌড়!

বিষণ্ণ পায়ে ফিরতে থাকি। কল-কল্লোলিনী কলকাতাকে মনে পড়ে। ওই মহানগরকে তিলোত্তমা করার এক উর্ধশ্বাস উদ্যম ব্যস্ত হয়ে উঠেছে এখন। আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার কৌশল ওই মহানগরীকে সুন্দরীতমা করার প্রয়াসে শতকর্মে রত। কিন্তু সেই প্রয়োগ কৌশল যদি এই বিলুপ্ত রাজধানীকে রক্ষা না করে তাহলে ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তিতে একদিন গৌড় সঙ্গী হিসেবে বেছে নেবে কলকাতাকে। বাংলার ইতিহাসে বার বার এ ঘটনাই ঘটেছে। গঙ্গে থেকে একে একে মহাস্থানগড়, কর্ণসুবর্ণ, বাণগড়, লক্ষ্মণাবতী, দেবীকোট, লখনৌতি, পাণ্ডুয়া, গৌড়, তাণ্ডা, রাজমহল, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ—বিলুপ্ত রাজধানীর এই স্রোতে ভেসে যাবে কলকাতাও।

আত্মবিস্মৃত বাঙালি আপাতত কলকাতা বাঁচাতে ব্যস্ত। বৈজ্ঞানিক কলাকৌশলের এই প্রয়োগ আমাকে আশান্বিত করে। তবু এখনো প্রশ্ন ওঠে—কলকাতা কি সত্যিই একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে?

এই উত্তর আমি জানি না।

বিলুপ্ত রাজধানী ১৩

টাণ্ডা/তাণ্ডা/তাঁড়া

এই বঙ্গরাজ্যে হিন্দু মুসলমান উভয় জাতিই প্রধান।
পরস্পর এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে ধর্মে ভিন্ন কিন্তু মর্মে এবং কর্মে এক।
—মীর মোশারফ হোসেন

গৌড়! বাংলার বিলুপ্ত রাজধানীগুলির মধ্যে এই নামটি বাঙালী মাত্রেরই পরিচিত। সহস্র স্মৃতিবহ, অজস্র ঘটনার অনুষঙ্গযুক্ত গৌড় আজও আমাদের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে, রোমাঞ্চ জায়গায়, ঐতিহাসিককে অনুক্ষণ করে, আকৃষ্ট করে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায়।

সম্রাট হুয়ায়ুন বলতেন, 'স্বর্গপুরী—জন্নতাবাদ'। গৌড়ের অপরূপ রূপে অভিভূত তাঁর কল্পনার বিস্ময় যদি রাজনৈতিক আবর্তে আবিল না হয়ে উঠত, তাহলে হয়ত তিনি গৌড়ে বসবাস করতেন। তা ঘটেনি। কিন্তু তার চেয়েও নিষ্ঠুর আর এক প্রাকৃতিক সঙ্কটে অপরূপা গৌড়ই একদিন সমস্ত রূপ-ঐশ্বর্য হারিয়ে, মনুষ্য বসবাসের অযোগ্য হয়ে ওঠে এক সুদীর্ঘ ঐতিহ্য আর ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চের ওপর যবনিকা টেনে দিয়েছিল। ১৫৭৫ সালে এক ভয়াবহ প্লেগের আক্রমণে বিপর্যস্ত গৌড় ক্রমে হারিয়ে ফেলল তার বৈভব আর বিলাসের জনজীবনের কলরোল। ভাগীরথীর গতিপথ পরিবর্তনেই এই বিপর্যয়।

বোধহয় অনুমান করতে পেরেছিলেন সুলতান সুলেমান কারনানী। আর তাই গৌড় ধ্বংস হবার বেশ কয়েক বছর আগেই তিনি বিকল্প রাজধানী হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন গৌড়ের সন্নিকটবর্তী আর একটি ভূখণ্ড—যার নাম টাণ্ডা বা তাণ্ডা। আকবরের সেনাপতি মানসিংহ শেষ পর্যন্ত সেখান থেকে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে যান রাজমহলে, ১৫৯৪ সালে।

অনেক ঘটনার ঘনঘটায় আকীর্ণ ছিল টাণ্ডা—কিন্তু বড়ো বিস্ময় লাগে এই ভেবে যে, আজও বাঙালীর স্মৃতিতে গৌড়ের নাম অম্লান—কিন্তু টাণ্ডার নাম জানেন এমন ব্যক্তির সংখ্যা আঙুলের সাহায্য ছাড়াই গণনা করা যায়।

কেউ মনে রাখেনি টাণ্ডার নাম, কোনো ঐতিহাসিকের অনুসন্ধানী চোখ আজ সেই হারিয়ে যাওয়া রাজধানীর অবস্থান খুঁজে দেখার কৌতূহলে ছুটে যায় না আগ্রহী তৎপরতায়।

শুধু মালদহ জেলার অধিবাসীদের রসনায় স্মৃতিতে আজও 'টাঁড়খাজা' নামে সরস মিষ্টান্নের উপস্থিতি মধুর হয়ে আছে। ইতিহাস আর কিংবদন্তী দ্বৈতকণ্ঠে বলে, ঐ খাজা যেখানে হতো সেই জায়গার নামই টাঁড়া বা টাণ্ডা।

কিন্তু সেই ভূখণ্ড টাণ্ডার সঠিক অবস্থিতি ছিল কোথায়? ইতিহাসের অনুমান, গৌড়ের খুব কাছেই ছিল টাণ্ডা এবং খুব স্বল্প সময়ের জন্য হলেও বৈভব আর বিত্তে টাণ্ডা ছিল সমৃধশালী। গৌড়েরই প্রায়-প্রতিদ্বন্দ্বী এক জনপদ।

—না, আজ তার কোনো চিহ্নই নাই।

মালদহ শহর থেকে গৌড়ে যাবার যে পথ এগারো মাইল এসে পিয়াসবাড়ির কাছে ডান হাতে বেঁকে ঢুকে গেছে রামকেলি গ্রামে, যে গ্রামে বারো'শ বছর আগে এসেছিলেন সপার্ষদ শ্রীচৈতন্যদেব; সেখানে এসেই থামেনি সেই পথ, একটু এগিয়ে বারদুয়ারী বা বড়োসোনা মসজিদের পাশ দিয়ে এই পথ চলে গেছে দখল দরওয়াজার কাছে এবং সেখানে গিয়ে দ্বিধা-বিভক্ত হয়েছে।

এখানে এসে একবার থমকে দাঁড়াবেন পর্যটক। সম্মুখে বিশালাকায় দখল দরওয়াজা। রাজকীয় গাম্ভীর্যের লুপ্তপ্রায় অবশেষ নিয়ে বিষণ্ণ স্থির হয়ে আছে। বাঁ হাতি পথ চলে গেছে ঐ দূরে ফিরোজ মিনারের কাছে। এই পথেই সাধারণ ভ্রমণার্থীর পদসঞ্চার। ফিরোজ মিনার যেন আকাশে হাত তুলে আহ্বান করে পথিকের দু-চোখ ভরে দেখার বাসনাকে। আর ডানহাতি এই পথ?

না, সচরাচর এই পথে স্থানীয় গ্রামীণ মানুষ ছাড়া ভ্রমণ অভিলাষীরা কেউ যান না। অথচ এই সেই পথ, যে পথ পর্যটককে নিয়ে যাবে হারিয়ে যাওয়া সেই রাজধানীর ছিন্ন স্মৃতিচিহ্নের কাছে—যে রাজধানীর নাম টাণ্ডা।

ডানহাতি এই পথ ধরে কিছুটা এগোলে পড়বে বেলবাড়ির ঘাট, খিড়কি গ্রাম। ঘাটের ওপারে গিয়ে গ্রামকে ডানদিকে রেখে মাইলখানেক গেলে পড়বে গ্রাম জালুয়াবাথান। পর্যটকের ভাবনা আর অনুমান এবারে সকৌতূহলে দাঁড়াবে এখানে। নিতান্ত সাধারণ গ্রাম জালুয়াবাথান। ঐতিহাসিকের অনুমান, এটিই রাজধানী টাণ্ডার পূর্বাঞ্চল। কাছাকাছি মল্লিকপাড়া এবং আর কয়েকটি গ্রামের সমষ্টিই হলো টাণ্ডার সামগ্রিক সীমা। যদিও ইতিহাস বলে, মূল ভূখণ্ডটি গঙ্গার গর্ভে আত্মগোপন করেছে রিক্ততার বেদনায়।

এ ঘটনা সত্য না অনুমান এ নিয়ে বিতর্ক উৎসারিত হয়, কিন্তু পর্যটকের মন এই গ্রামকে ঘিরে থাকা দীর্ঘ পরিখা, ইতস্তত ছড়ানো টুকরো ইট-পাথর আর মাঝে মাঝে মাথা তুলে দাঁড়াবার দুর্বল প্রয়াসের মতো উঁচু ঢিবি দেখে বিষাদে আচ্ছন্ন হয়, এ দেশের ইতিহাস অনুসন্ধানের অনান্তরিক পুঁথি-গন্ধময় চর্চার কথা স্মরণ করে ক্ষুব্ধ হয়, আর অধিকাংশ পর্যটকের গতানুগতিক ভ্রমণ-ইচ্ছার শৌখিন বিলাসের দৃশ্য মনকে নৈরাশ্য আর উত্তেজনার যুগপৎ অভিঘাতে চঞ্চল করে তোলে।

জালুয়াবাথান গ্রামে দাঁড়িয়ে হারিয়ে যাওয়া টাণ্ডার ইতিহাসের অস্ফুট গুঞ্জন শুনবো বলে আমি বাতাসে কান পাতি, খুঁজে ফিরি স্মৃতি চিহ্নবাহী প্রত্নরত্ন। ইতিহাস বলে, ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দে গৌড় সুলতান তাজ খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভাই সুলেনাম খাঁ কারনানী গৌড় সিংহাসনে বসেন। শুধু বাংলা নয়, দক্ষিণ বিহার এবং উড়িষ্যা ও কুচবিহার রাজ্যের কিছু অংশও ছিল তাঁর শাসনাধীনে।

স্বাধীনচেতা সুলতান ছিলেন কারনানী। তীক্ষ্ণধী রাজনীতিকও ছিলেন। বুঝতে অসুবিধে হয় নি তাঁর যে, সম্রাট আকবরের বশ্যতা স্বীকার না করলেও বিরোধিতা করাটাও সুবিধেজনক হবে না। তাই দিল্লিশ্বরের দরবারে বহুমূল্য উপঢৌকন পাঠিয়ে বিনিময় করেছিলেন বন্ধুত্ব। সিংহাসনারোহণ করে একটি সুবিবেচনার কাজ করেছিলেন কারনানী। অনুভব করেছিলেন

তিনি, গৌড়ের আবহাওয়া ক্রমেই দূষিত হয়ে উঠছে ভাগীরথীর খাত পরিবর্তনের ফলে। অস্বাস্থ্যকর জলাভূমির বিষাক্ত আবহাওয়া এক ভয়ানক অসুস্থতাকে দ্রুত ডেকে আনছে।

তাছাড়া সুশাসনের প্রয়োজনে সামরিক ও রাজনৈতিক কারণে ঘন ঘন রাজধানী যেভাবে নুদিয়া-দেবীকোট-লখনৌতি-পাণ্ডুয়া হয়ে গৌড়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—সেই কূটনৈতিক কারণও যে আবার রাজধানী পরিবর্তনের পক্ষে এক বিবেচ্য বিষয়—সুলতান সুলেমান কারনানী এটাও ভুলে যাননি।

গৌড় থেকে কোথায় সরানো হবে রাজধানী?

সুতীক্ষ্ণ অনুসন্ধানের পর নির্বাচন করা হলো টাণ্ডা নামের স্থানটিকে। গৌড়ের কাছেই—ভাগীরথীর মূল প্রবাহও খুব বেশি দূরে নয়। তবে গৌড় থেকে যেতে হলে ভাগীরথীর বিনষ্ট প্রায় খাতটি পার হয়ে অপর পাড়ে যেতে হবে। তা হোক—সুলেমান কারনানী ১৫৬৫ খ্রিস্টাব্দে রাজধানী স্থাপন করলেন টাণ্ডায়। এখানে তাঁর নিজস্ব জায়গীরও ছিল।

কারনানীর পর সিংহাসনে এলেন বায়াজিদ এবং তারপর দায়ুদ খাঁ। আর এই দায়ুদ খাঁর আমলেই টাণ্ডার ইতিহাস ঘটনার পর ঘটনার সংঘাতে উত্তাল হয়ে উঠল। দায়ুদ খাঁ গৌড়ের শেষ স্বাধীন আফগান সুলতান—সুলতান কারনানীর চেয়েও স্বাধীনতাপ্রিয় ছিলেন বেশি। তিনি সরাসরি দিল্লিশ্বর আকরবকে অস্বীকার করলেন। বন্ধুত্বের উপঢৌকনও পাঠালেন না। এই স্পর্ধার দর্প সইতে না পেরে সম্রাট আকবর গৌড়ে পাঠালেন সসৈন্যে সেনাপতি খান-ই-খানান মুনিম খাঁকে।

কিন্তু কোথায় গৌড়েশ্বর দায়ুদ খাঁ? মুঙ্গের, ভাগলপুর, কহ্‌লগাঁও পার হয়ে এলেন মুনিম খাঁ, আফগান নিশান নামিয়ে তোলা হলো মোঘল নিশান। অবশেষে রাজমহলের কাছে তেলিয়াগড়ি গিরিসঙ্কটে এসে মুখোমুখি হলেন আফগান বাহিনীর। বুঝতে পারেন মুনিম খাঁ, মাত্র বিশহাজার অশ্বারোহী নিয়ে হাজার হাজার আফগান বাহিনীর সঙ্গে মোকাবিলা করা সম্ভব নয়।

চিন্তিত হলেন মুনিম। টাণ্ডায় প্রবেশের সব আশা যখন লুপ্ত হতে চলেছে তখন কয়েকজন হিন্দু জমিদার পরামর্শ দিলেন মুনিমকে—অদূরে রাজমহলের গড়হি গৌড়পথের ভেতর দিয়ে টাণ্ডায় প্রবেশ করা যাবে। আর অপেক্ষা করলেন না মুনিম। তেলিয়াগড়িতে নকল যুদ্ধের আয়োজন করে আফগান সৈন্যদের ব্যস্ত রেখে তিনি নির্দিষ্ট গিরিপথ দিয়ে ১৫৭৪-এর ১৫ই সেপ্টেম্বর এসে পৌঁছলেন টাণ্ডায়।

বিস্মিত হতচকিত বিভ্রান্ত দায়ুদ খাঁ মুনিমকে বাধা না দিয়ে নিঃশব্দে সরে এলেন টাণ্ডা থেকে। গৌড় সেই লক্ষ্মণ সেনের পর আর একবার আক্রমণকারীর পদানত হলো।

সপ্তগ্রামের পথ ধরে উড়িষ্যায় আত্মগোপন করে দায়ুদ সহজে মেনে নিতে পারেননি দিল্লিশ্বরের এই অভিযানের স্পর্ধা ! গোপনে গোপনে প্রস্তুত হলেন দায়ুদ খাঁ। গৌড়ের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করতেই হবে।

কিন্তু এবারও তুকারই-এর যুদ্ধে পরাজিত হলেন দায়ুদ। বন্দী আফগান সৈন্যদের মাথা কেটে আটটি উঁচু মিনার তৈরি করলেন খান-ই-খানান মুনিম খাঁ। দায়ুদ কটকে পালিয়ে গিয়ে আবার শক্তি সঞ্চয় করতে লাগলেন। যদিও গৌড়-বিহার-উড়িষ্যায় তাঁর নামেই আজও খুৎবা

পাঠ হচ্ছে, কিন্তু সে তো শুধু একটি নিয়মবন্ধ প্রথারই প্রচলিত অনুষ্ঠানমাত্র। মোঘল-বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করার মতো সৈন্য ও অশ্ববল প্রায় নিঃশেষিত। আত্মসমর্পণ করলেন দায়ুদ রাজা টোডরমলের কাছে। খবর পেয়ে মুনিম খাঁ এলেন কটকে এবং অবশেষে বিজয়ীর বেশে টাণ্ডায়।

কিন্তু টাণ্ডায় এসে মন ভরে না মুনিম খাঁর। বয়স হয়েছে তাঁর। যুধক্লান্ত শরীর একটু স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য পিপাসিত। টাণ্ডার মতো অপরিসর, হঠাৎ গড়ে ওটা নগরীতে সেই বিশাল বৈভবে স্বাচ্ছন্দ্যের আয়োজন কোথায়!

অথচ কাছেই আছে বহুযুগের রাজধানী গৌড়। যদিও দীর্ঘ পঁচিশ বছর সংস্কারের অভাবে সেই নগরী এখন হতশ্রী, প্রাসাদকক্ষ ধূলি-মলিন, তবু গৌড়ের আভিজাত্য আজও শেষ আলো-আভার মতো লেগে রয়েছে এর সারা শরীরে।

মুনিম টাণ্ডা থেকে রাজধানী সরিয়ে আনলেন গৌড়ে। প্রথম দু'বছর রাজকীয় উল্লাস আর উত্তেজনায় অশীতিপর বৃধ মুনিম যেন যৌবনের জোয়ারের ডাক শুনতে পেলেন। কিন্তু তৃতীয় বছর থেকে শুরু হলো সেই জোয়ারের কলরোলের চেয়েও জোরালো আর্তনাদ আর মরণান্তিক বিলাপ। ভয়াবহ প্লেগ থাবা বসিয়েছে গৌড়ের শরীরে। শত শত গৌড় নাগরিক ইহলোক ত্যাগ করতে লাগল, অনেকে আবার গৌড় ছেড়ে পালাতে লাগলেন।

বৃধ মুনিম টাণ্ডায় ফিরলেন, সঙ্গে আনলেন প্লেগের জীবাণু। ১৫৭৫-এর ২৩শে অক্টোবর মৃত্যুর কাছে পরাজয় বরণ করলেন গৌড় বিজয়ী মুনিম। প্রতিশোধ নিল কি গৌড়? এই সুযোগে টাণ্ডায় এলেন দায়ুদ। সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন তিনি, সুযোগ এসেও গেল। তিনি প্রচুর সৈন্য সংগ্রহ করে রাজমহলে ঘাঁটি গাড়লেন।

মুনিম খাঁর পর দিল্লি থেকে এসেছেন খান-ই-জাহান হোসেন কুলী। নতুন করে আফগানদের শক্তির দম্ভ গুঁড়িয়ে দিতে তিনি মোঘল-বাহিনী নিয়ে অবতীর্ণ হলেন যুধে। এবার বন্দী হলেন দায়ুদ। না, আর ক্ষমা নয়, আক্ষেপও নয়; তাঁর মাথা কেটে উপহার হিসেবে পাঠিয়ে দেওয়া হলো আকবরের কাছে।

এক বিচিত্র ইতিহাসের লিখন; যে দায়ুদ কোনো উপঢৌকনেই সন্তুষ্ট কবতে চাননি দিল্লিশ্বরকে—এবার নিজের মাথাটিই উপহার স্বরূপ তাঁকে পাঠাতে হলো। গল্পে আছে, তাঁর অবশিষ্ট দেহ নাকি টাণ্ডার জনসমক্ষে প্রদর্শিত হয়। এভাবেই শেষ হয়ে গেল গৌড়ের স্বাধীন সুলতানদের আমল। শুরু হলো মোঘল সাম্রাজ্য।

টাণ্ডার ইতিহাসও আবর্তিত হতে লাগল মোঘল শাসনের পরিচালনাধীনে। এলেন মানসিংহ।

কিন্তু টাণ্ডা তাঁর পছন্দ হলো না। স্থানটি অর্বাচীন। গৌড় তখন শুধু সুখের স্মৃতি, দুঃখের স্মৃতি, ঐশ্বর্যের স্মৃতি, মহামারীতে ধ্বংস হয়ে যাবারও স্মৃতি।

অতএব আবার রাজধানী পরিবর্তন। এবার রাজমহল। এরপর যথারীতি এক একজন শাসকের আবির্ভাব। কিছুদিন পরপর রাজধানীরও পরিবর্তন। রাজমহল থেকে ঢাকা, ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদ, মুর্শিদাবাদ থেকে মুঙ্গের হয়ে কলকাতা। টাণ্ডা হারিয়ে যায়। তবে শেষবারের মতো ইতিহাসের ঘনঘটার পাতা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেবার আগে সে আর

একবার জেগে ওঠে ১৬৬০ সালে যখন সাহশুজা মীর জুমলার তাড়া খেয়ে চলে আসেন টাণ্ডায়। সেই শেষবার। তারপর বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যায় টাণ্ডা। আর বোধহয় তাই তার লুপ্ত গৌরবের বেদনাকে মুছে দিতে ভাগীরথীর খাত পরিবর্তন করে তাকে টেনে নিয়েছে নিজের জলের গভীর কোলে। মুছে যায় টাণ্ডা, শুধু কারো কারো স্মৃতিতে বেঁচে থাকে ছিন্ন অংশ নিয়ে। কিছু কিছু পরিচয়সূত্র লেখা থাকে ইতিহাসের নথিপত্রে।

র‍্যালফ ফিচ্ নামের এই ইউরোপীয় পর্যটক ১৫৮৫ খ্রিস্টাব্দে লিখেছেন :

'তাণ্ডা গৌড়ে অবস্থিত। একসময় এটি রাজধানী ছিল। কিন্তু এখন জালালুদ্দীন আকবরের অধীন। এখানে প্রচুর তুলোর চাষ ও ব্যাবসা হয়। কিন্তু অধিবাসীরা প্রায় নগ্ন, সামান্য বস্ত্রখণ্ডে শরীর ঢাকা।.... এখানে অনেক বাঘ, বন্য জন্তু, বনমোরগ আছে... তাণ্ডা গঙ্গার এক লীগ দূরে অবস্থিত, কারণ বন্যার সময় প্লাবনে বহু ঘরবাড়ি ভেসে যায়।'

ফিচের এই বর্ণনার সমর্থন মেলে রেনেলের মানচিত্রেও। সেখানে 'টাঁড়া' নামের স্থানকে ভাগীরথীর অপর পাড়ে গৌড়ের দক্ষিণ-পশ্চিমে মহদীপুর গ্রামের এক মাইল উত্তর-পশ্চিমে বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

বুকানন হ্যামিলটন তাঁর 'পূর্ণিয়া' গ্রন্থে 'টাংরা' সম্বন্ধে লিখেছেন : 'কালিয়াচক অঞ্চলে একমাত্র ধ্বংসাবশেষ 'ট্যাংরা', যদিও তেমন নিদর্শন কিছু নেই।... গৌড় থেকে দূরত্ব বেশি নয় এবং রাজধানী পরিবর্তন হয়েছিল বলা যায় না, তবে প্রাসাদ ও প্রাদেশিক আবাস তৈরি হয়েছিল। গৌড়বাসীরা সবাই তাণ্ডায় যায়নি। নিদর্শন দেখে মনে হয় না। সুলতানরা এখানে কোনো বড়ো কীর্তি স্থাপন করেছিলেন।'

কে জানে হ্যামিলটনের এ উক্তির সত্যতা কখনো প্রমাণ করা যাবে কিনা ! কেননা, মূল টাণ্ডা তখনও গৌড়ের গভীর গোপনে নিমগ্ন।

এক সময় টাণ্ডাকে খাওয়াসপুর বলে চিহ্নিত করা হতো, তৎকালীন যুক্তপ্রদেশের ফৌজবাদ জেলায় 'টাংরা তহ্শিল'-এর থেকে পৃথকীকরণের জন্য। এখনো খাওয়াসপুর বলে এক গ্রাম আছে, যার অবস্থান ভাগীরথীর পূর্ব পাড়ে, রামকেলির এক মাইল পশ্চিমে। আজকের টাণ্ডা, এই জালুয়াবাথান গ্রাম, ঐ খাওয়াসপুর থেকে প্রায় এক মাইল দক্ষিণে।

টাণ্ডায় সঠিক অবস্থান, তার সমগ্র ইতিহাস নিয়ে কোনোদিন কোনো ঐতিহাসিকের অনুসন্ধান তৎপর হয়ে উঠবে কিনা জানি না।

টাণ্ডার স্মৃতি বিজড়িত ভূখণ্ডে দাঁড়িয়ে বাঙালী জাতির আত্মবিস্মৃতির এই বাস্তব উদাহরণ প্রত্যক্ষ করে বেদনায় মন ভরে ওঠে।

কেউ মনে রাখেনি, কেউ মনে রাখে না টাণ্ডার কথা। শুধু এই গ্রামে ঢোকার মুখে মীর মালতি নামে যে ফকিরের সমাধি দেখেছি, কিংবদন্তী বলে, ইনি সেই ফকির যিনি একাধারে অলৌকিক সাধনায় মানুষের জীবনের উন্নতির পথ দেখিয়েছেন। অপরদিকে লৌকিক জীবনযাপনকেও রসমধুর করে তোলার জন্য আবিষ্কার করেছিলেন এক মিষ্টান্ন, যার নাম খাজা—টাঁড় খাড়া নামে আজও যা প্রচলিত।

টাঁড় অর্থ মালদহ অঞ্চলে চরজমি। এ জেলার অনেক গ্রামের শেষেই টাঁড় শব্দটি যুক্ত। ভাগীরথীর তীরে এই স্থানের নাম তাই তাণ্ডা বা টাণ্ডা হওয়াই স্বাভাবিক। অনেক

ঐতিহাসিকের অনুমান, এই জেলারই চাঁচলের কাছে কান্দারণ বলে স্থানটিও হয়তো তাণ্ডার স্মৃতি বহন করছে। আমি জানি, বন্ধুবর ঐতিহাসিক শ্রীগৌরীশংকর দে ঐ স্থান থেকে প্রচুর পুরাতাত্ত্বিক সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু সুনিশ্চিত কোনো প্রমাণ মেলেনি যে ঐ স্থান টাণ্ডা।

ফিরে আসছি টাণ্ডার অজস্র প্রত্নস্মৃতি ভরা গ্রাম থেকে।

দূরে কোথায় একটানা বিলাপের মতো ঘুঘুর ডাক কানে আসছে। এখান থেকে খুব কাছেই দীর্ঘ কয়েক যুগের ইতিহাস বুকে করে স্তব্ধ হয়ে আছে গৌড়।

ঘন আমবাগানের ভেতরে হঠাৎ ছটফট করে উঠছে হাওয়া, যেন দুঃসহ কোনো অবলুপ্তির বেদনা। সমস্ত গৌরব হারিয়ে শীর্ণ হয়ে গেছে ভাগীরথী এবং নতুন করে গড়ে উঠেছে এক নতুন জীবন।

আর সেই জীবনের কাছে অস্ফুট কলধ্বনির সুরে হারানো দিনের কথা নিয়ে যেন অবিরাম বয়ে চলেছে ঐ নদী।
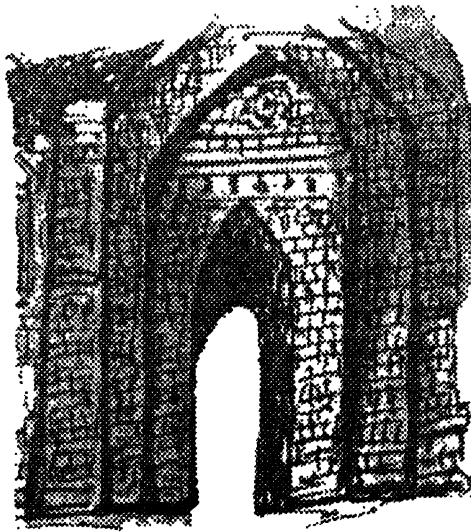
বটপর্বতিকা/কজঙ্গল/আগমহল/রাজমহল/আকবরনগর

ছিলে যবে হে জননী সারা দেশ ভরি'
তখন করেছি পূজা গৃহদেবী রূপে;
আজ তুমি গৃহে নাই তাই চুপে চুপে
সমগ্র দেশের রূপে মূর্তিখানি গড়ি।
—মোহিতলাল মজুমদার

আমি এখন গঙ্গার বুকে স্টীমারে। আমার সম্মুখে রাজমহল। তেরোশো বছর আগে একদিন ঐ রাজমহল থেকেই গঙ্গার স্রোতরাশি ছেড়ে করতোয়া তীরে পুণ্ড্রবর্ধনের দিকে গিয়েছিলেন পর্যটক হিউ-এন-সাঙ। তখন রাজমহল 'কজঙ্গল' নামে চিহ্নিত ছিল। বহুদূর অতিক্রম করেছিলেন তিনি। নালন্দা থেকে মুঙ্গের—সেখান থেকে ভাগলপুর—তারপর প্রায় নব্বই মাইল নদীপথে রাজমহলের কজঙ্গল শহরে। এরপর কজঙ্গল থেকে পুণ্ড্রবর্ধন হয়ে কর্ণ-সুবর্ণে।

অষ্টম শতকে এসেছিলেন হিউ-এন-সাঙ আর বিংশ শতকে আমি পুণ্ড্রবর্ধনের কর্ণ-সুবর্ণ গৌড় অতিক্রম করে চলেছি কজঙ্গলের দিকে। যুগ যুগ ধরে প্রবাহিত গঙ্গার ধারার সঙ্গে মিশিয়ে দিতে চাইছি পর্যটনের ভ্রমণ ইচ্ছার ধারাবাহিকতা।

না, এখন পুণ্ড্রবর্ধন, কজঙ্গল, কর্ণ-সুবর্ণ, গৌড় বলে আর কেউ ডাকে না ঐ স্থানগুলোকে। পুণ্ড্রবর্ধন এখন বাংলাদেশের বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়; কর্ণ-সুবর্ণ ও গৌড় মুর্শিদাবাদ আর মালদা জেলার দুটি ঐতিহাসিক ছোটো জনপদ মাত্র। আর কজঙ্গল— এই রাজমহল।

তবে শুধু রাজমহলই নয় আরো অনেক নাম ছিল এই ভূখণ্ডের। নবম-দশম শতাব্দীর পাল সম্রাটদের লিপিগুলিতে যে জয়স্কন্ধাবার বা রাজধানীগুলির উল্লেখ আছে সেই বিলাসপুর, হরধাম, রামাবতী, হংসকোস্তি, পাটলিপুত্র এবং বটপর্বতিকার মধ্যে অনেক ঐতিহাসিকের অনুমান, বর্তমান রাজমহলের নিকটবর্তী কোনো স্থানই এই বটপর্বতিকা।

বহু যুগের বহু ইতিহাসের ঘটনাকে বুকে ধরে রেখেছে ঐ রাজমহল।

পাল সম্রাটদের পর দীর্ঘকাল ইতিহাসের পাতায় আত্মগোপন করে আবার মধ্যযুগে পাঠান সুলতানদের আমলের শেষ ভাগে মাথা তুলে দাঁড়ায় রাজমহল। মোঘল আমলে বাংলার শাসনকেন্দ্র পুনরায় শক্তিশালী হয়ে উঠে। তারপর অষ্টাদশ শতকে মীরকাশিমের সময়ে ইংরেজদের সঙ্গে এক শোণিতাক্ত যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে শেষবারের মতো ইতিহাসের

বুকে স্মরণীয় হয়ে ওঠে। বাংলার সঙ্গে দীর্ঘকালের সম্বন্ধ ছিন্ন করে প্রতিবেশী রাজ্য বিহারের এক ছোটো ভূখণ্ডে পরিণত হয় রাজমহল। শুরু হয়, বাজ-রাজরা নয়, অগণিত মানুষের জীবনযুদ্ধের ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে নতুনকালের ইতিহাসের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলার এক নতুন অধ্যায়।

আমি নতুন-পুরনো সেই সম্মিলিত ইতিহাসের রাজমহলের অন্দরমহলে প্রবেশের জন্য যাত্রা শুরু করেছি। বাংলার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন করে স্টীমার মাঝ গঙ্গা পেরিয়ে এগিয়ে চলেছে রাজমহল ঘাটের দিকে, পেছনে বাংলার সীমারেখা মাণিকচক ঘাট ক্রমশ সরে যাচ্ছে।

মালদা থেকে আসার এটাই একমাত্র পথ। তিরিশ বছর আগে যখন ফরাক্কা সেতু হয় নি, তখন কলকাতায় যাবার এটাই ছিল প্রধান পথ। বাসে মাণিকচক ঘাট এসে স্টিমারে গঙ্গা পার হয়ে রাজমহলে পৌঁছে ট্রেন ধরে তিন-পাহাড়। সেখানে থেকে ট্রেন পালটে কলকাতা। কলকাতা-উত্তরবঙ্গ বাস সার্ভিস চালু হবার পর অবশ্য এ দূরত্ব কমে যায়। তবু মালদার এই পশ্চিম প্রান্তের মথুরাপুর, রতুয়া, শোভানগরের মানুষ আজও মাঝে মাঝে কলকাতার জন্য এ পথ ব্যবহার করেন।

কলকাতা থেকে রাজমহলে আসতে হলে ঐ তিন-পাহাড় থেকেই ট্রেন বদলে রাজমহলে আসতে হয়।

একবার শোভানগর বেসিক ট্রেনিং কলেজে সরকারি কাজে এসে চোখে পড়ল দূরে রাজমহল পাহাড়ের নীলরেখা। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো বিলুপ্ত রাজধানী পরিক্রমায় এই গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক স্থানে না গেলেই নয়। কৈশোরে এই পথে বহুবার কলকাতায় গিয়েছি কিন্তু যথারীতি তেমনভাবে দেখা হয়নি। অতএব—

সঙ্গী হলেন মালদার এক তরুণ অপূর্ব গোস্বামী আর শোভানগরের এক তরুণ চন্দন ঝা।

মালদা থেকে এসে মাণিকচক ঘাট। সেখানে সামরিক পোশাক পরা কয়েকটি কিশোরের মুখোমুখি। ওরা যাচ্ছে রাজমহলে এন. সি. সি. ক্যাম্প করতে। সঙ্গে ওদের মথুরাপুর স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং সহকারীরা। আমার উদ্দেশ্য শুনে ওঁরা সহৃদয়তা এবং রাজমহল বিষয়ক বহু অগণিত তথ্য নিয়ে এগিয়ে এলেন। স্টিমারের অর্ধেকটা কেটে গেল প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের কাছে থেকে ইতিহাস শুনে। স্টিমার থেকেই দুই মাইল প্রায় দূরে একটি স্থান নির্দেশ করে বললেন, মঙ্গলহাটের দিকে যাবার ঐ রাস্তায় গঙ্গার উপরে এক চরে ছিল পুরনো রাজমহল। এখন যাবার উপায় ডিঙি নৌকো, গঙ্গার প্রবাহ আগে বইত অন্য খাতে। বর্তমানে মাণিকচক থানার পাশ দিয়ে এনায়েতপুর ও অমৃতির ধার ঘেঁষে কালিন্দী নদীর কাছাকাছি কোনো স্থান দিয়ে প্রবাহিত হতো গঙ্গা। মালদহ থেকে রাজমহলের দিকে এলে বল্লাল সেনের রানির জন্য নির্মিত উদ্যান বাড়িতে যা এখন বাগবাড়ি নামে পরিচিত এবং কাছাকাছি গ্রাম কর্মীপুরের নিচে পুরনো গঙ্গার খাত এখনও দেখা যায়।

রাজমহলকে রাজধানী হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছিল সুচতুর রাজনৈতিক দক্ষতায়। কেননা ঐ রাজমহল থেকে ঠিক কোণাকুণি ভাবে গৌড়-এর দূরত্ব কুড়ি মাইল আর পুকুরিয়া ঘাট হয়ে আদিনা-পাণ্ডুয়াও কুড়ি মাইল। গৌড়ের ফিরোজ মিনারের মতো রাজমহল

ও পাণ্ডুয়াতেও দুটি মিনার ছিল আলোক সঙ্কেতের জন্যে। বর্তমানে গৌড়ের মিনারটি আছে, বাকী দুটো ধ্বংসপ্রায় এবং তাদের সঠিক অবস্থান খুঁজে পাওয়াও কঠিন। প্রধান শিক্ষক মহাশয় অনুমান করেন কালা পাহাড়ের হাত রাজমহলেও আঘাত হেনেছিল।

কে জানে সত্য কিনা! কেননা, এখনো আমি চোখে দেখিনি সবকিছু।

সহযাত্রী সেকেন্দার লোদী নামে এক রেলকর্মী যিনি দীর্ঘকাল রাজমহল-সাহেবগঞ্জ অঞ্চলে আছেন। শোনালেন চমকপ্রদ এক কিংবদন্তী।

অনেককাল আগে রাজমহল থেকে ছয় কিলোমিটার দূরে বর্তমান জুম্মা মসজিদের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে এক সমৃদ্ধ অঞ্চল ছিল। সেখানে একটি মুদির দোকানে এক ভিখিরি একদিন ভিক্ষে চাইতে আসে। দোকানি বিরক্ত হয়ে বলে কিছু নেই, দোকানে পাথর আছে নিয়ে যা। তা সেই ভিখিরিও তখন অভিসম্পাত দেয় যে, তোর সব খাদ্যবস্তু পাথর হয়ে যাবে! সত্যি সত্যিই নাকি তাই ঘটে। আগে কাঠগুদাম নামে চিহ্নিত সেই পুরনো মাটি খুঁড়লে চাল-ডাল-গমের হুবহু আকৃতি ও রঙের পাথর পাওয়া যায়। একেবারে অবিকল পাথরের চাল-ডাল। স্থানটি একটি উঁচু জমি। কিছুটা দূরে লোকালয়ে চৈতন্যদেবের পায়ের ছাপও আছে। পাশেই পীরের দরগা। আজ আমি বাংলার হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সংহতির প্রতিভূ এক জনপদে এসেছি।

স্টীমার রাজমহল ঘাটে এসে লাগে। আর আমি পা রাখি ইতিহাস গর্ভ রাজমহলের মাটিতে। সম্মুখের পথ চলে গেছে স্টেশনের দিকে। ডানদিকে মঙ্গলহাটের পথ। ঐ পথের দুধারে রয়েছে ইতিহাসের ছিন্নচিহ্ন। আর সামনে ঐ রেল কোয়ার্টারগুলোও প্রাচীন এবং বর্তমান ইতিহাসকে এক প্রাণস্পন্দনে চঞ্চল রেখেছে। ও-গুলোর কোনোটি ছিল নাচমহল, কোনোটি বা ঘোড়ার আস্তাবল—জানালেন সেকেন্দার লোদী। এখনো কোনো কোনো কোয়ার্টারের ভেতর ঘোড়ার খাদ্য রাখার জন্য সিমেন্টের বাঁধানো চৌবাচ্চা রয়েছে। ডানহাতি থানার পেছনে গঙ্গার ধার ঘেঁষে ঐ যে উঁচু বাড়ি ওটা নাকি প্রাচীনযুগের স্মৃতিবাহী।

গল্পের মতোই স্মৃতির ঢেউ আছড়ে পড়ছে রাজমহলের তটে এবং আমার মনে। তিরিশ বছর আগেও এ পথ দিয়ে যখন যেতাম তখন যেমন ছিল রাজমহল স্টেশন আজও তেমনই আছে।

কিন্তু তিন-পাহাড়ের সেই বিখ্যাত চা আজও আছে কিনা জানা হলো না। অসংখ্য ঘোড়ার ক্ষুরের অস্থির দাপটে আজ ধুলো উড়ছে রাজমহলের বাতাসে।

চলুন বাবু, জুম্মা মসজিদে, আকবরী মসজিদ, সিংহী দালান, টমটম-ওয়ালাদের সমবেত হাঁক-ডাকে বেশি বিচলিত না হয়ে হাতের কাছে যাকে পাওয়া গেল তার টমটমে উঠেই মনে হলো যেন প্রাচীন কোনো পরিবেশের মধ্য দিয়ে আমি চলেছি। এমনই নির্জন, এমনই অতীতময়তা পথের দুধারে—আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে সেখানে খুবই কম পরিমাণে।

এ পথ গেছে মঙ্গলাহাটের দিকে। প্রথমেই ডান দিকে সিংহীদালান। চোখ তুললে আকাশ আড়াল করে দাঁড়িয়ে আকবরী মসজিদ।

এই সিংহীদালান মানসিংহের রাজমহলের অন্দরে প্রবেশের প্রধান তোরণ। কষ্টিপাথরে খোদিত খিলান, ডানপাশে ভগ্নস্তূপ আর পেছনে গঙ্গা—প্রবল হাওয়ার হাহাকারে আছড়ে

পড়ছে দালানের অভ্যন্তর। আমি তোরণ পেরিয়ে দালানের কিনারায় দাঁড়াই। প্রায় দুশো ফুট নিচে গঙ্গা। অনেকে অনুমান করেন রাজপ্রাসাদের অনেকাংশ-ই গঙ্গাগর্ভে। বাকীটুকু বড়ো বড়ো পাথর দিয়ে গঙ্গার গ্রাস থেকে বাঁচানো হয়েছে।

হয়ত একথা সত্য, হয়ত নয়। আমি কান পাতি গঙ্গার বুক থেকে ভেসে আসা বাতাসে। বহু যুগের ওপার থেকে ভেসে আসা ইতিহাসের ভাষা অনুভবের চেষ্টা করি।

১৫৭২ সাল। গৌড়ের সিংহাসনে তখন শেষ আফগান সুলতান দায়ুদ খাঁ। রাজধানী গৌড় সন্নিকটস্থ টাণ্ডায়। পরাক্রমী স্বাধীনচেতা গৌড়ের গৌরব রক্ষায় অক্লান্ত যোদ্ধা ছিলেন দায়ুদ। দিল্লিশ্বর আকবরের অধীনতা স্বীকার করতে চান না তিনি। যোদ্ধা ছিলেন সন্দেহ নেই কিন্তু সুরা, নারী আর সন্দিগ্ধচিত্ততায় বোধ করি কিছু পরিমাণে অদূরদর্শিতা ছিল। পরে পিতৃব্য পুত্র পরম হিতৈষী ইউসুফ লুদি খাঁকে হত্যা করে তিনি মোঘল-বাহিনীর কিছুটা সুবিধাই করে দেন।

বুঝতে ভুল হয়নি দায়ুদের, আকবর নিজে সসৈন্যে আসবেন বিহারে তাঁকেই পরাস্ত করতে। পাটনা দুর্গে সামরিকভাবে আশ্রয় নেবার পর সেনাপতি গুজুর খাঁকে দিয়ে সমস্ত সৈন্য টাণ্ডা অভিমুখে পাঠিয়ে দিয়ে নিজেও রওনা হলেন ঐ রাজধানীর দিকে।

আকবর পশ্চাধাবন করলেন। কিন্তু অচিরেই বুঝলেন দায়ুদকে পরাস্ত করতে খান-ই-খানান মুনিম খাঁ-ই সক্ষম। অতএব ১৫৭৪-এর ১১ই আগষ্ট মুনিম খাঁ এলেন পূর্বাঞ্চলে দায়ুদকে পরাস্ত করতে। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে মুনিম এলেন তেলিয়াগড়ি গিরিপথের কাছে গুনা নামের এক স্থানে। সেখানে সসৈন্যে প্রস্তুত দায়ুদ। মুনিম খাঁ তখন রাজমহলে পাহাড়ের গড়হি গিরিপথের ভেতর দিয়ে ঢুকলেন তাণ্ডায়। প্রায় বিনা বাধায় মোঘল সাম্রাজ্যের অধিকার কায়েম হলো গৌড়বঙ্গে। দায়ুদ সংবাদ পেয়ে সপ্তগ্রামের পথ ধরে উড়িষ্যার দিকে চলে গেলেন। মুনিম খাঁ তাণ্ডা থেকে রাজধানী সরিয়ে আনলেন গৌড়ে। কিন্তু তাঁর সমস্ত স্বপ্ন এবং আশাকে ব্যর্থ করে প্লেগ মহামারী গৌড় এবং স্বয়ং মুনিম খাঁর মৃত্যুদিন ত্বরান্বিত করল।

১৫৭৫-এর ২৩শে অক্টোবর মুনিম খাঁ প্লেগে মারা গেলেন। অপেক্ষা করেছিলেন দায়ুদ খাঁ। সুযোগ আসামাত্র তাণ্ডা পুনরুধারে ব্যস্ত হলেন। ইতিমধ্যে আকবর খান-ই-খানান হোসেন কুলী বেগকে বাংলার ফৌজদার ও টোডরমলকে তার সহকারী নিযুক্ত করে পাঠিয়েছেন। এবার তেলিয়াগড়ি নয়, দায়ুদ রাজমহলে ব্যূহ বিন্যাস করলেন। ১৫৭৬-এর ১২ জুলাই শুরু হলো প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। রাজমহল পাহাড়ের শিলায় শিলায় প্রতিধ্বনিত হলো রণহুঙ্কার। দায়ুদ পরাজিত হলেন, বন্দী হলেন। তাঁর ছিন্ন শির আকবরের কাছে পাঠিয়ে দিলেন খান-ই-খানান। এরপর বাংলার সিংহাসনে নাটকীয় পরিবর্তন—পরিবর্তন রাজধানীরও। হোসেন কুলীর পর খান-ই-আজম, শাহবাজ খান এবং তারপর সম্রাট জাহাঙ্গীরের শ্যালক মানসিংহ বাংলার শাসক হয়ে এলেন। তাণ্ডা থেকে রাজধানী সরে এল রাজমহলে। শুরু হলো রাজমহলের নতুন অধ্যায়। মানসিংহ রাজমহল নগরী রচনায় উদ্যমী হলেন। স্থাপিত হল মন্দির-মসজিদ-প্রাসাদ।

এই সেই প্রাসাদের ভগ্নাংশ, সিংহীদালান। যার গর্ভে পুঞ্জীভূত ইতিহাসবাহী হাওয়া বয়ে চলেছে, আমি কান পেতে শুনছি তার ভাষা।

বড়ো আশা করে এসেছিলেন মানসিংহ রাজধানী স্থাপন করবেন গৌড়ে। সুপ্রাচীনকাল থেকেই গৌড় নামটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাংলা ও রাজধানীর সহস্র স্মৃতি। হিন্দু, তুর্কী, পাঠান, আফগান শাসনকর্তারা ঐ স্থানটিকে নানাভাবে জগৎসভায় পরিচিত করিয়েছেন—একটি জাতির অসংখ্য মানুষের শিল্প-সংস্কৃতিচর্চার একটি বিশেষ ভঙ্গী গৌড় নামটিকে ঘিরে উঠেছে। না, তাণ্ডা নয়—দায়ুদ খাঁ যদিও গৌড় থেকে রাজধানী সরিয়ে এনেছিলেন তাণ্ডায়, সে নগরীর কোনো ঐতিহ্য নেই, শ্রী নেই, প্রবল পরাক্রমী মোঘল সম্রাটের প্রাদেশিক শাসনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠার যোগ্যতাও নেই। গৌড়ও আজ শ্রীহীন, জঙ্গলাকীর্ণ পরিত্যক্ত নগরী মাত্র। নতুন করে সেখানে রাজধানী স্থাপন করা ব্যয়বহুল। তাছাড়া সেই ভয়াবহ প্লেগ মহামারীর স্মৃতি জনমানসে তখনো বিভীষিকাময়। কেউ বসবাস করতে চান না গৌড়ে।

অতএব অনেক দেখার শেষে গঙ্গার তীরে রাজমহল স্থানটি পছন্দ করলেন মানসিংহ। পূর্বতম রাজধানী গৌড়-তাণ্ডা-পাণ্ডুয়া থেকে কোণাকুণি প্রায় সমদূরত্বে। যোগাযোগ ব্যবস্থায় শাসনকার্য পরিচালনার অনুকূল। সম্মতি জানালেন সম্রাট আকবরও। অবশেষে ১৫৯৪ খ্রিস্টাব্দের ৭ই নভেম্বর বাংলার রাজধানী স্থাপিত হলো রাজমহলে। জয়পুর-আগ্রা থেকে এল স্থপতিরা। পথ, ঘাট, প্রাসাদ উদ্যান নির্মাণ করার জন্য মানসিংহ সামরিক বিভাগ ও শাসনকার্যের ব্যয় ভারের জন্য সবটুকু অর্থ নিয়োগ করলেন। দুর্গ নির্মিত হলো। নগরীর নাম রাখা হলো সম্রাটের নামে আকবরনগর। কিন্তু না, জনসাধারণ তাঁরই নামের স্মৃতিতে ডাকতে লাগলেন রাজমহল নামে।

আজও সেই নামের অবলুপ্তি ঘটেনি। কিন্তু লুপ্ত হয়েছে সেই সুদৃশ্য উদ্যান, বিপণী বিথিকা, দুর্গ আর প্রাসাদ।

এই সেই প্রাসাদ! মানসিংহের প্রাসাদ। এখন সিংহীদালান নামে যা পরিচিত।

আমি বিষণ্ণ পায়ে নেমে আসি। কিছুটা দূরে আকাশে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে যে মসজিদ ওরই নাম আকবরী মসজিদ।

কল্পনার গল্পে আছে, মানসিংহ নাকি এইখানে একটি মন্দির তৈরি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সংবাদটি দিল্লিতে সম্রাট আকবরের কানে যাওয়াতে তিনি স্বচক্ষে দেখতে আসবেন মনস্থ করেন। তখন রাতারাতি এটি মসজিদে রূপান্তরিত করা হয়। নাম রাখা হয় সম্রাটের নামে।

প্রায় একই গল্প জুম্মা মসজিদ সম্বন্ধেও জনমনে প্রচলিত। কোথায় সে মসজিদ! বাতাসে শিস টানে। ঘোড়ার পা টছফট করে টমটমওয়ালার চাবুকে। জ্যৈষ্ঠের নিষ্করুণ সূর্যগলিত আগুন ঢালে অবিরাম। ইতিহাসের নেশায় আচ্ছন্নের মতো এগোতে থাকি। দুপাশে বিংশ শতাব্দীর মানুষের ঘরবাড়ি। সম্পদের প্রাচুর্য নয়, প্রাণের প্রাচুর্যে ভরপুর। দুপুরের দাবদাহ উপেক্ষা করে সবাই শতকর্মে রত। আমি শুধু ছিন্ন বাধা পলাতক বালকের মতো সেই প্রাণের সবল প্রকাশ চোখে ছুঁয়ে এগিয়ে চলেছি একটানা। হঠাৎ থামে টমটম। গাড়োয়ান মুখ ফিরিয়ে বললে—ঐ দেখুন বাবু, মীরণের কবর।

মীরণের কবর!

আমি স্তম্ভিত চোখে বাঁদিকে একটি নাতি-উচ্চ কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা জমির উপর চোখ রাখি। না কোনো ফলক নেই। কোনো সিমেন্ট বাঁধানো কবরের পরিচয়জ্ঞাপক স্মৃতিচিহ্নের ভগ্নাবশেষও পর্যন্ত নেই। শুধু নিরাভরণ রিক্ত-নিঃস্ব অসহায় বাতাসের হাত মমতার প্রলেপ

বুলিয়ে যাচ্ছে, মাঝে মাঝে একদা দোর্দণ্ড প্রতাপ মীরজাফর পুত্র মীরণের শেষ শয্যার ওপর দিয়ে। যেন ঘুম না ভাঙে তার। ইতিহাসের এক অন্ধকারাচ্ছন্ন বেইমানির অধ্যায়ে এই মীরণেরই আদেশে মহম্মদী বেগের তীক্ষ্ণ ছুরিকা আমুল বিদ্ধ করেছিল বাংলার নবাব সিরাজদৌল্লার স্বাধীনতাকামী হৃদয়ে। কথিত আছে, ঐ রাজমহলেরই অদূরে গঙ্গার ওপারে মালদার রতুয়ার দেবীপুর থেকে দুই মাইলের মধ্যে যে সুবামারা বা শুয়োরমারী ঘাট আছে সেখানেই ধরা পড়েছিলেন পলাতক নবাব সিরাজদৌল্লা। জনশ্রুতি, ঐ সুবেদারমারা বা সুবামারা নামটিও নাকি সেই কারণে। ঐ জায়গারই নিকটবর্তী বাহারালে দানশা ফকির নাকি ধরিয়ে দিয়েছিলেন সিরাজকে। কিন্তু ইদানীং এই সিদ্ধান্ত খণ্ডন করে যুক্তিসহ অনেকে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন যে, দানশা ফকির নাকি তখন জীবিতই ছিলেন না। এই নিয়ে স্থানীয় এক গবেষকের একটি বইও আমার চোখে পড়েছে। বইটির নাম 'দানশা কি বিশ্বাসঘাতক'। লিখেছেন মহম্মদ ইউনিস।

সে যাই হোক, ধৃত সিরাজকে তাঁরই স্বপ্নের হীরাঝিল প্রাসাদে বন্দী করে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছিলেন মীরজাফর পুত্র মীরণ। শুধু তাই নয়, নবাবকুলের প্রবল কামনাশক্তির উত্তরাধিকারও বর্তেছিল তাঁর ওপর। আর তার ফলে একটি চরম অপমানের বাক্যও অনিবার্য আঘাতের মতো আছড়ে পড়েছিল তাঁর মুখের ওপর, যখন কামনা-মদির হাত তিনি বাড়িয়েছিলেন সিরাজের বেগম লুৎফার দিকে। তখন লুৎফা বলেছিলেন, যে সওয়ারী হাতীতে সওয়ার হয়েছে সে কি কোনোদিন গর্দভের পিঠে সওয়ার হয়? কিন্তু জানতেন না মীরণ, ক্ষমতার গর্বে মত্ত হয়ে বোধ হয় বুঝতেও চাননি তিনি, মানুষের কত ধিক্কার আর অভিসম্পাত বজ্রের মতো নেমে আসবে তাঁর মাথার ওপর। কেউ কেউ বলেন বজ্রাঘাতেই মারা যান তিনি, কেউ বলেন তাঁকে নির্জন মাঠে খুন করা হয়েছিল। হায়! সেই বিতর্ক আর বিরোধ, নিষ্ঠুরতা আর অপমান, প্রতিহিংসা আর বেইমানী, দম্ভ আর ক্ষমতার উগ্রতা ঐখানে, ঐ নাতি-উচ্চ ঢিবির গভীরে এখন ধূলায় হয়েছে ধূলি। সীমাহীন অত্যাচারী মানুষের অনিবার্য পরিণতির এক প্রতীক চিহ্নের পাশে দাঁড়িয়ে আমি বিহ্বলতা বোধ করি। সরকারি-বেসরকারি কোনো তত্ত্বাবধানই আর মীরণের স্মৃতিকে মানুষের মনে জাগরুক রাখার প্রয়াসে সচেষ্ট নয়। সন্ধ্যার অন্ধকারে নিভৃতে একটি কৃতজ্ঞতার দীপও বুঝি আজ ওই কৃতঘ্নের সমাধিতে জ্বলে না। ঘোড়ার ক্ষুরে ক্ষুরে রাজমহলের ঐতিহাসিক পথের ধুলো শুধু ওড়ে।

গাড়োয়ান বলেন, ঐ দেখুন মজজিদ, ঐ দেখুন টাঁকশাল।' রাস্তার পাশে ঘন আমবনের মধ্যে সমাহিতের মতো দাঁড়িয়ে আছে ভগ্ন প্রায় দুটো দালান। যেখান থেকে একসময় সারা দেশের অর্থ নির্মিত হতো। অর্থহীন এক অস্তিত্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার কঙ্কাল।

—ঐ হলো বাতিজ্বালা মসজিদ।

আমার চকিতে মনে পড়ল, এই হয়তো সেই ফিরোজ মিনারের মতো মিনার, যদিও বাইরের আকৃতিগত কোনো সাদৃশ্য নেই।

—আর ঐ হলো জুম্মা মসজিদ।

টমটম থামল। সারা রাজমহল জুড়ে এখন চীনা মাটির খনি আর কারখানা। জুম্মা মসজিদের চারপাশ ঘিরে শ্রমিকদের সবল বাহু নতুন যুগের ইতিহাস রচনায় তৎপর।

বিশাল মসজিদটি তার পরিপ্রেক্ষিতে যেন হারানো দিনের এক রাজকীয় সৌকর্য্য তুলে ধরবার জন্য জীর্ণ অস্তিত্ব নিয়ে প্রাণপণে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। দেখা গেল, এ যুগের মানুষ একেবারে অস্বীকার করেনি এই স্থাপত্য কীর্তির বৈভবকে। তাই ভগ্নাংশগুলো নতুন করে সারানোর চিহ্ন চোখে পড়ল সহজেই। আকৃতিতে সুবৃহৎ এই মসজিদের ভেতরে বাঁধানো জলাধার আছে। বাইরে একটি সুড়ঙ্গ পথ। কে জানে এই সুড়ঙ্গ পথ কি উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতো। স্থানীয় এক চীনে মাটির কারখানার প্রধান কর্মী শ্রীহীরালাল রায় জানালেন, মসজিদকে ঘিরে সেই কিংবদন্তীর গল্পটি। তিনি একটি শ্বেতপাথরের বাতিদানও আমাদের উপহার দিলেন। রাজমহলের মাটির গভীর থেকে পাওয়া ঐতিহাসিক স্মারকচিহ্ন হিসেবে। এ ধরণের অনেক প্রত্নসামগ্রী পাওয়া গেছে আগেও। বিহারের বিভিন্ন মিউজিয়ামে তা সংরক্ষিত করা হচ্ছে। তবে দুঃখ করলেন এই বলে যে, রাজমহল নিয়ে কোনো গ্রন্থ বা গাইড বুক আজও লেখা হয়নি।

এই জুম্মা মসজিদের সেই কাঠগুদাম—যেখানে এক কিংবদন্তীর কালের স্মৃতি বিভিন্ন পাথুরে খাদ্যবস্তুর নিদর্শন হয়ে মাটির বুকে লুকিয়ে আছে।

দ্রুতহাতে স্কেচ করি ঐতিহাসিক স্মৃতি-সাক্ষীগুলোর অবয়ব। ফিরে আসতে থাকি রাজমহল ঘাটের দিকে। মনে পড়ে মানসিংহের পর কুতুবদ্দিন, জাহাঙ্গীর কুলি খাঁ এবং ইসলাম খাঁ পরপর বাংলার শাসনকর্তা হয়ে আসেন। ইতিমধ্যে দ্রুত ঘটে যায় কিছু বিদেশি শক্তির পদসঞ্চার। ১৬০২ সালে চট্টগ্রামের পর্তুগীজরা আরাকানী মগধের আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে সন্দীপের চরে একটি দুর্গ নির্মাণ করে। মানসিংহ তার প্রবল প্রতিরোধ করেন। কিন্তু গঞ্জালেসের নেতৃত্বে গঙ্গার ব-দ্বীপগুলি ঘিরে পর্তুগীজদের অত্যাচারে সাধারণ মানুষ নির্যাতিত হতে থাকে। আরাকানী ও পর্তুগীজরা যৌথভাবে অত্যাচার চালাতে থাকে। তখন বাংলার শাসনকর্তা ইসলাম খাঁ রাজমহল থেকে রাজধানী সরিয়ে নেন ঢাকায়। সেটা ছিল ১৬১২ সাল। কিন্তু রাজমহলের ইতিহাস সেখানেই শেষ হয় না। ইসলাম খাঁ গঞ্জালেসকে প্রতিহত করলেও ১৬১৩ সালে মারা যাবার পর মগেরা বাংলার দক্ষিণ-পূর্বদিকে অত্যাচার প্রবল ভাবে বাড়াতে থাকে। তখন কাশিম খাঁ শাসনকর্তা। কিন্তু তাঁর অপদার্থতার সুযোগ নিয়ে নূরজাহানের ভাই ইব্রাহিম খাঁ-ই প্রকৃতপক্ষে বাংলার শাসনভার চালাতে থাকেন। ইতিহাস জানায়, এসময় ঢাকার মসলিন, মালদহের রেশম প্রভৃত সমাদর লাভ করতে থাকে দেশে-বিদেশে। ইংরেজরা পাটনায় কারখানা খোলে। রাজমহলে শাজাহানের সঙ্গে এক প্রচণ্ড যুদ্ধে ইব্রাহিম খাঁ নিহত হন।

এরপর সাতজন শাসনকর্তা বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। সর্বশেষে শাজহানের পুত্র মহম্মদ সুজা ১৬৩৯ খ্রিস্টাব্দে শাসনকর্তা হয়ে ঢাকা থেকে আবার রাজধানী সরিয়ে আনেন রাজমহলে। কিন্তু বেশিদিনের জন্য নয়। ইতিমধ্যে সুচতুর ইংরেজ বণিক বাণিজ্যের ছলে লোভের হাত বাড়িয়েছে সিংহাসনের দিকে। ডঃ ব্রাউটন নামে এক চিকিৎসক শাজাহানের কন্যার চিকিৎসা করে ইংরেজদের অবাধ বাণিজ্য এবং হুগলী বালেশ্বরে কুঠি স্থাপনের অনুমতি আদায় করে নেন। এলাহাবাদের কাছে শাজাহানের আর এক পুত্র ঔরঙ্গজেবের কাছে পরাজিত হলেন। সুজা আত্মগোপন করলেন পূর্বতন রাজধানী তাণ্ডায়। ঔরঙ্গজেবের সেনাপতি মীরজুমলা তাণ্ডা আক্রমণ করেন। সুজা আশ্রয় নিলেন আরাকান

রাজের কাছে। কিন্তু ভুল করেছিলেন সুজা। নিষ্ঠুর আরাকান রাজ তাঁকে নদীতে নিক্ষেপ করলেন। আত্মহত্যা করলেন তাঁর দুই কন্যা, আর একজন নিগৃহীতার জীবনযাপন করতে লাগলেন আরাকন রাজের বেগম মহলে। এরপর মীরজুমলা ১৬৫৯-এ আবার রাজমহল থেকে রাজধানী সরিয়ে নিলেন ঢাকায় এবং শেষ বারের মতো রাজধানী সরে গেলো রাজমহল থেকে। কিন্তু বাংলার ইতিহাসে মাঝে মাঝে রাজমহল অধিকার করে নিল এক একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, স্থান হিসেবে। মীরজুমলার পর শায়েস্তা খাঁ, পরে ইব্রাহিম খাঁ এবং সবশেষে মুর্শিদকুলি খাঁ।

১৭০৪-এ মুর্শিদকুলি খাঁর আমলে রাজধানী স্থানান্তরিত হল ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে। বাংলার ইতিহাসে এই মুর্শিদাবাদ পর্ব সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই মুর্শিদাবাদেই বাংলা তথা ভারতের স্বাধীনতা সূর্য দীর্ঘ দুশো বছরের জন্য অস্তমিত হয়েছিল। নবাব সিরাজদৌল্লা আর মীরকাশিমের শত প্রতিরোধ সত্ত্বেও মীরজাফর, জগৎশেঠ, রাজবল্লভ, গুরগন খাঁর বিশ্বাসঘাতকতা অন্ধকারকে ডেকে আনে। মীরজাফরের পর মীরকাশিম বাংলার নবাব হয়ে রাজধানী সাময়িক ভাবে সরিয়ে নিয়েছিলেন মুঙ্গেরে। কিন্তু লোভী প্রতারক অবিশ্বাসীদের ছলনার হাত তখন বিদেশী শোষক বেনিয়া ইংরেজদের হাতের সঙ্গে একসূত্রে গ্রথিত। একটার পর একটা যুদ্ধে মীরকাশিমের পরাজয়। কিন্তু মীরকাশিম মুঙ্গের দুর্গ থেকে জগৎশেঠ, রাজবল্লভকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করলেন। উধুয়ানালার যুদ্ধেও পরাজয় স্বীকার করলেন মীরকাশিম। সবশেষে বক্সারের যুদ্ধে পরাজয়ের গ্লানিতে এক পান্থশালায় অনাহারে অনিদ্রায় মারা গেলেন মীরকাশিম এবং এর সঙ্গে সঙ্গেই বাংলার ইতিহাসে স্বাধীনতার আলো নিভে গেল।

এই সেই পথ, যে পথ গিয়েছে উধুয়ানালার দিকে। ফিরতি স্টীমারে আলাপ হলো উধুয়ানালার এক শিক্ষকের সঙ্গে। জানালেন, এখান থেকে ছয় মাইল যেতে হবে টমটমে, বারহারোয়া-রাজমহল রোড ধরে। ওখানে আছে উধো মুনির আশ্রম। সম্ভবত তার থেকেই নাম উধুয়ানালা। চারপাশে পাহাড়, সেই পাহাড়ের জল গঙ্গায় পড়ত। উঁচু ঢিবি আছে অনেক। জনশ্রুতি, ওখানে সৈন্যেরা থাকত। যুদ্ধক্ষেত্র এখন বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র। এখানে কামানের গোলা পাওয়া যায় মাঝে মাঝে। ইংরেজ-সৈন্যবাহিনীর ফুডকীপাররা সেখানে থাকত। সম্ভবত, প্রাকৃত ভাষায় সেই স্থানেরই নাম হয়েছে ফুদকিপাড়া।

ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছে রাজমহলের সীমারেখা। এখানেই একদিন এসেছিলেন হিউ-এন-সাঙ। ১৬৮৩ সালে এসেছিলেন ফরাসি রত্নবণিক তাভারনিয়ার। তাঁর বিবরণে আছে রাজমহলের তৎকালীন ছবি। তিনি জলপথে এসেছিলেন। বাঁধানো রাস্তা দেখেছিলেন তিনি শহরের ভেতরে, শুনেছিলেন আগে সুবেদাররা শিকারের জায়গা হিসেবে এই শহরকে বেছেছিলেন। বাণিজ্যের রমরমা ছিল। ১৬৬৯ সালে এসেছিলেন নিকোস দ্য গ্রাফ, পেশায় ছিলেন চিকিৎসক। তিনি মকসুদাবাদ হয়ে এসেছিলেন তৎকালীন অন্যতম বড়ো শহর রাজমহলে। তখন যিনি মুসলমান শাসনকর্তা ছিলেন এখানে, তাঁর অনুমতি নিয়ে তিনি শহর পরিক্রমা করেন। তাঁর বিস্তৃত বিবরণে উল্লেখ আছে, এই শহর গঙ্গার ধারে। শহরে সুন্দর হর্ম্যরাজি শোভিত। মন্দির-মসজিদ-বাজার-প্রাসাদ আছে। প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ আছে পাহাড়ের দিকে। শহরে আর আছে টাঁকশাল, ওলন্দাজ নিবাস, পির বোহার মন্দির। আছে

সাহশুজার প্রাসাদ আর বাগান। প্রাসাদে আছে পাথর, কাঠ ও তামার স্তম্ভ। প্রাসাদটি দ্বিতল। বাগানে আছে ফোয়ারা। নানা পশুর আদলে নির্মিত। আর এক পর্যটক বুকানন এসেছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে। আর মুনশী শ্যামপ্রসাদ এসেছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীতে। তিনি ফরাসি ভাষায় যে বিবরণ দেন, তা জানায়— শাহসুজার দৌলতখান, সৎ-ই দালান, মচ্ছিভবন, আনন্দ সরোবর, দেওয়ানি-ই আম, দেওয়ানি-ই খাস আছে এ শহরে। প্রাসাদের অন্তর্গত সরাইখানার পূর্ব দরজা দিয়ে গেলে আটকোণা জলাধার বিশিষ্ট একটি বড়ো অঙ্গন দেখা যায়। যার তিন দিকে ইটের দোতলা বাড়ি। এই বাড়ি থেকে নদী পর্যন্ত আর একটি বাড়ি ছিল যা অধুনা লুপ্তপ্রায়। গঙ্গা সংলগ্ন বড়ো উঠোনটির অনেকাংশই গঙ্গাগর্ভে। বাড়ির পূর্বদিকে একটি বড়ো কুয়ো যেখান থেকে প্রাসাদে জল সরবরাহ হতো। জনরব বলে, এখানে সাহশুজার জেনানামহল ছিল। সুলতান পরাজিত হলে বাড়ির মেয়েরা গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে প্রাণত্যাগ করেন। সামনের উঠোনে একসময় উৎসব হতো, জনশ্রুতি একথাও জানায়।

আটকোণা ফোয়ারার বাঁ দিকের দরজা দিয়ে ঢুকলে আর একটা ছোটো উঠোন দেখা যায় এবং কিছু বাড়ির ভগ্নাংশ। আছে সুলতানের শাসনকাজ পরিচালনার জন্য উঁচু চত্বর। এর পাশে আছে দেওয়ান-ই-খাস। রক্ষীদের থাকার ঘর। হারেম ও যুবরাজের হারেমে যাবার পথ।...

রাজমহলের চার মাইল দূরে আছে ১৫৯২ সালে তৈরি জামা মসজিদ।

অষ্টাদশ শতকে এসেছিলেন আর একজন পর্যটক জোসেফ স্টিফেম থালাব। তিনি রাজমহলকে প্রাদেশিক শাসনকর্তার কেন্দ্র হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন শহরটি দেড়মাইল লম্বা ও আধমাইল চওড়া। নদীর উত্তরপূর্ব দিকে আকবরের তৈরি প্রাসাদ। বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে শহরটির পরিচিতি আছে।

হ্যাঁ, এই আধুনিক কালেও রাজমহলের সে পরিচিতি অন্তত হারিয়ে যায়নি। এখন সে আর রাজধানী নয়। বাংলার সঙ্গেও সম্পর্কহীন। শুধু ইতিহাস অনুসন্ধানীরা জানেন। ইতিহাসে খুব স্বল্পকালীন হলেও রাজমহল ছিল বাংলার-ই রাজধানী।

অপরাহ্নের আলো গঙ্গার বুক থেকে ঠিকরে উঠে শেষবারের মতো সিংহীদালান আর আকবরী মসজিদের শীর্ষদেশে এক মোহময় ছবি এঁকে দিয়েছে। অস্তগামী পূর্ব গরিমার মায়াময় ছবি।

আমি চোখ ফিরিয়ে নেবার আগেই দেখতে পাই রাজমহল পাহাড়ের ধূসর নীলরেখা স্তব্ধ হয়ে অতীত আর বর্তমানের রাজমহলের প্রাণস্পন্দন ধ্যানস্থ হয়ে যেন অনুভব করছে। অপরাহ্নের আলো গঙ্গার বুক থেকে ঠিকরে উঠে শেষবারের মতো সিংহীদালান আর আকবরী মসজিদের শীর্ষদেশ, এক মোহময় পরিমণ্ডল রচনায় চঞ্চল হয়ে উঠেছে। আমি চোখ ফিরিয়ে নেবার আগে দেখতে পাই রাজমহলেব ধূসর নীলরেখা স্তব্ধ হয়ে দেখছে বর্তমান অতীত গৌরবকে। আমি চোখ ফিরিয়ে নিই।

বিলুপ্ত রাজধানী ১৫
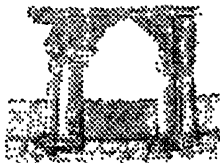
ঢাকা/বিক্রমপুর

আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি তুমি কোন অপরূপ রূপে
—বাহির হলে জননী
—রবীন্দ্রনাথ

শ্রীবিক্রমপুর বঙ্গের বহুত্তম প্রাচীন নগর। চন্দ্র, বর্মণ, সেন এবং দেববংশীয় রাজাদের রাজধানী। এখান থেকে বিজয় সেন, বল্লাল সেন, লক্ষ্মণ সেনের শাসনলিপি প্রচারিত হয়েছে। এখানেই বিজয় সেন মহিষী মহাদানযজ্ঞ করেছিলেন। পরবর্তীকালে এরই নিকটবর্তী বজ্রযোগিনী গ্রামে জন্ম নিয়েছিলেন অতীশ দীপঙ্কর। এই গ্রামের কাছেই রামপাল নামেব এক জায়গায় প্রায় পনেরো বর্গ মাইল জুড়ে ছড়ানো রয়েছে বিশাল এক ধ্বংসাবশেষ, ইতিহাসের একটি বিস্তৃত অধ্যায়ের মূক সাক্ষী হিসেবে। একাদশ শতকের প্রথমার্ধে চন্দ্রবংশীয় রাজাদের আমলে প্রথম রাজধানী বা জয়স্কন্ধাবার হিসেবে বিক্রমপুর পরিচিত হয়, পরে তা বৈভবে, ঐতিহ্যে আরো প্রাণবান-খ্যাতিমান হয়ে ওঠে। ১২৮৩ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে অরিরাজ দনুজ মাধব দশরথদেব বিক্রমপুর থেকে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে যান সুবর্ণগ্রাম বা সোনারগাঁয়ে।

রাজধানী হিসেবে বিক্রমপুরের অবলুপ্তি ঘটলেও অতীত গৌরবের খ্যাতিতে, বাংলার বহু বিখ্যাত ব্যক্তির জন্মভূমি হিসেবে আজও তার সুযশ অম্লান। আবার ইতিহাসের এক বিচিত্র প্রবণতায় ওই অঞ্চলেই পরবর্তী যুগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বাংলার রাজধানী। না, বিক্রমপুরে নয়, ঢাকায় ১৬১২ খ্রিস্টাব্দে। তখন বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন ইসলাম খাঁ। তিনি মগ ও আরাকানীদের অত্যাচার দমন এবং শাসনকার্যের সুবিধের জন্য রাজমহল থেকে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন ঢাকায়।

এই ঢাকা থেকে আবার রাজধানী সরে গিয়েছিল মুর্শিদাবাদে, বাংলার তৎকালীন দেওয়ান করতলব খাঁ'র আমলে। ঢাকার অধিকর্তা তখন ঔরঙ্গজেবের পুত্র আজিমুশ্বান। রাজস্ব আদায় নিয়ে বিরোধ বাঁধল তাঁদের মধ্যে। করতলব খাঁ, আজিমুশ্বানের অনুমতির অপেক্ষা না করেই আমলা, কানুনগো সহ চলে এলেন শাসনকার্যের সুবিধের জন্য নির্যাতিত চুণাখালি পরগনার মুখসুদাবাদে—যে জায়গার নাম হয়েছিল তাঁরই নামে রাখা। তিনিও 'মুর্শিদকুলি খাঁ' নামে উপাধি নিয়েছিলেন।

ঢাকা নামটি এসেছে ঢাক গাছ থেকে অথবা দেবী দুর্গা এখানে ঢাকা ছিলেন তাই। কেউ বলেন, ইসলাম খান ঢাক বাজিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন এজন্য এর নাম ঢাকা—এরূপ বিবিধ মত আছে। সুবাদার ইসলাম খাঁ অবশ্য এর নাম দেন জাহাঙ্গির নগর। কিন্তু ঢাকা নামটিই

প্রসিদ্ধি লাভ করে। এক সময় ঢাকা ছিল বুড়িগঙ্গার উত্তর পারে। জনবসতি ছিল বহুদিন আগে থেকেই। সপ্তম শতাব্দীর গুপ্ত যুগের মুদ্রা বা পরবর্তী সময়ের পাথুরে প্রমাণ মিলেছে এখান থেকে। আবুল ফজলের লেখাতেও ঢাকার উল্লেখ আছে।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে সুবা বাংলার রাজধানী হয় ঢাকা। বাহারিস্তান-এর লেখক মির্জা নাথান বলেন, ১৬০৮-০৯ ঢাকায় রাজধানী স্থাপিত হয়, স্থাপন করেন ইসলাম খান। মোঘল আমলে শাহশুজা সুবাদার হয়ে ১৬৪০ সালে রাজধানী আর একবার রাজমহলে সরিয়ে নেন । পরে মিরজুমলা আবার তা ফিরিয়ে আনেন ঢাকায়। দুর্গ তৈরি হয়, তৈরি হয় দেওয়ান বাজার, বক্সি বাজার, মোগলতলি, পিলখানা ইত্যাদি।

বাহারিস্তান-এর লেখক মির্জা নাথানের বর্ণনা অনুযায়ী সুবাদার ইসলাম খানের যাবার পথে একটি সীমানা নির্দেশক পাকুড় গাছ ছিল। জায়গার নাম ছিল পাকুড়তলি, এখন যার নাম বাবুবাজার। পুরনো ঢাকা সদরঘাট পর্যন্ত ছিল। বর্তমান জেল এলাকায় ছিল ইসলাম খানের দুর্গ। ঢাকার পশ্চিম সীমানা ছিল চকবাজার পর্যন্ত। ইসলাম খান দলুই নদী ও বুড়িগঙ্গার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করেন খাল কেটে তাঁতিবাজার-মালিতলা এলাকায়। এটাই সেই পাকুড়তলা সীমানার কাছে বলে নতুন ও পুরনো ঢাকাকে সমভাবে ভাগ করেছিল।

ইসলাম খান মারা যাবার পর তাঁর ভাই কাসেম খাঁ সুবাদার হন। তিনি সুশাসক ছিলেন না। আরাকানী ও পর্তুগিজ জলদস্যুদের অত্যাচার বাড়ে সে সময়। এরপর নূরজাহানের ভাই ইব্রাহিম খান এসে সুশাসন ফেরানোর চেষ্টা করেন। ব্যাবসা-বাণিজ্য বাড়ে। কথিত আছে, তিনি ঢাকাই মসলিন পাঠাতেন বোন নূরজাহানের কাছে। ইতিমধ্যে দিল্লিতে বিদ্রোহী শাহজাহান বাংলার তেলিয়াগড়িতে এলে ইব্রাহিম খান প্রতিরোধ করেন কিন্তু যুদ্ধে মারা যান। শাহজাহান ঢাকায় প্রবেশ করেন। শাহজাহান প্রচুর ধনরত্ন নিয়ে চলে যান, শাসনকর্তা হিসেবে রেখে যান দরাব খাঁনকে। এরপর ধারাবাহিকভাবে শাসনকর্তা পরিবর্তন হতে থাকে। শাহসুজা, মিরজুমলা প্রমুখেরা ঢাকার শাসনকর্তা হন।

১৯৪০-এ পাদরি মানরিক ঢাকাকে বাংলার প্রধান শহর বলে উল্লেখ করেন। শহরটি পশ্চিমদিকে বহুদূর অবধি প্রসারিত। উত্তরদিকে এখনকার রেল স্টেশন পর্যন্ত বিস্তৃত। ব্যাবসা-বাণিজ্যের জন্য প্রচুর সংখ্যক বিদেশির আনাগোনা ছিল এ শহরে। ফলে অর্থপ্রাচুর্যে পূর্ণ হয়েছে শহর। লোকসংখ্যা দু'লক্ষেরও বেশি।

পর্যটক তাভারনিয়ার-এর বর্ণনায় (১৬৬৭) ঢাকা বাংলার রাজধানী। প্রায় একই সময় আসেন তাভারনিয়ার। তিনি পূর্ববর্তী রাজধানী রাজমহল হয়ে আসেন। তিনি লক্ষ করেছিলেন শহরের অধিকাংশ বাড়ি নদীর ধারে ধারে। শহরটি দু'ক্রোশ লম্বা। শাসনকর্তার বাড়ি পাঁচিল ঘেরা বটে কিন্তু বাড়িটি কাঠের তৈরি। শাসনকর্তা থাকেন তাঁবুতে। বণিকদের বাড়িগুলো পাকা, বোধহয় পণ্য সুরক্ষার জন্য। ১৬৬৯-এ টমাস বাউরির লেখা জানায় শহরটি বড়ো এবং নদীর নিকটবর্তী। সেখানে ছ'শো টনের জাহাজও চলে এই নদীতে। প্রাসাদের সুরক্ষায় আছে সৈন্যদল, হাতি। বড়োলোকেরাও হাতি পোষে। শহর টঙ্গি পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। এই উন্নতির কারণ শায়েস্তা খানের সুশাসন। তাঁর আমলে চালের দাম খুবই কম ছিল বলে কথিত আছে।

ইংরেজরা ১৬৬৬ নাগাদ ঢাকায় কুঠি স্থাপন করতে থাকে। তারা তেজগাঁওতে প্রথমে কুঠি স্থাপন করে। ১৬৯০-তে ইংরেজ-মোঘল সংঘাতের সময় কুঠি বন্ধ করে দেওয়া হলে ১৭২৩-এ মুর্শিদকুলি খানের সময় থেকে তা ফের চালু হয়। এরপর কুঠি বানায় ওলন্দাজরা। যেটি পরে মিটফোর্ড হাসপাতালে পরিণত হয়। ফরাসিদের কুঠি পরিবর্তিত হয় আহসান মঞ্জিল-এ। দুপ্লে এসে বাণিজ্য বাড়ায়। কিন্তু পলাশির যুদ্ধের পর সে কুঠিও বন্ধ হয়ে যায়। ঔরঙ্গজেবের সময় মিরজুমলা শহরের উত্তরদিকে একটি তোরণ নির্মাণ করেন। রমনা দরওজা নামে কথিত তোরণটি বর্তমান হাইকোর্টের পশ্চিম দিকে রয়েছে।

ঢাকার শাসনকর্তাদের মধ্যে শায়েস্তা খাঁ-ই প্রবাদপুরুষে পরিণত হয়েছেন। শহর ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধিতে চূড়া স্পর্শ করে। অসংখ্য বাড়ি তৈরি হয়। তৈরি হয় সাতগম্বুজ মসজিদ, লালবাগ দুর্গ যা ঢাকেশ্বরী মন্দিরের কাছে। এটি তৈরি হয় ১৬৭৮-এ যুবরাজ আজমের দ্বারা। এর ভগ্নাংশ আজও আছে। কাছাকাছি অঞ্চলে মুর্শিদকুলি খানও মসজিদ নির্মাণ করেন।

এই মুর্শিদকুলি খানই রাজধানী ঢাকা থেকে সরিয়ে নিয়ে যায় মুখসুদাবাদে। ঢাকা শাসনের ভার থাকে নায়েব নাজিমদের হাতে যার মধ্যে রাজবল্লভ অন্যতম। ঢাকার গৌরব অস্তমিত হতে থাকে। পলাশির যুদ্ধের পর ইংরেজরা লালবাগ দুর্গে থাকতে শুরু করেন। সিরাজের পরিবারবর্গকে ঢাকায় পাঠানো হয়। মিরজাফরের ছেলে মিরণ তাদেরকে বুড়িগঙ্গার জলে ডুবিয়ে মেরে ফেলে। ১৮৪৩ সনে ঢাকার শাসনভার নিয়ে নেয় ইংরেজরা।

রাজধানী হিসেবে ঢাকার ইতিহাস কিন্তু এখানেই শেষ হয় না। ইংরেজ আমলে মুর্শিদাবাদের পর কলকাতায় এল বাংলার রাজধানী। অবশ্য কিছুদিনের জন্য মীরকাশিম রাজধানী মুঙ্গেরে স্থানান্তরিত করেন। পরে মুর্শিদাবাদ হয়ে কলকাতায়। তারপর স্বাধীনতা সংগ্রাম, স্বাধীনতা লাভ। ভারত বিভাগ হয়, হল বঙ্গ বিভাগ। ভারত এবং পাকিস্তান—পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতা—পূর্ববঙ্গের ঢাকা। অবশেষে আবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গের সংগ্রাম। নতুন রাষ্ট্রের পত্তন—বাংলাদেশ। রাজধানী এবারও সেই ঢাকা। অখণ্ড বাংলার রাজধানী হিসেবে বিলুপ্ত হলেও নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশের রাজধানী হিসেবে ঢাকা তার ঐতিহ্য অক্ষুণ্ন রেখেছে।
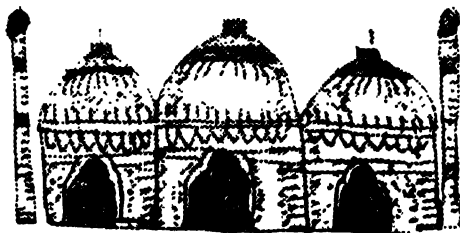
মুখসুখাবাদ/মুখসুদাবাদ/মুর্শিদাবাদ

বঙ্গের সন্তান হিন্দু-মুসলমান
বাঙ্গালার সাধহ কল্যাণ,
শত্রুজ্ঞানে ফিরিঙ্গিরে কর পরিহার
বিদেশি ফিরিঙ্গি কভু নহে আপনার।
—গিরিশচন্দ্র ঘোষ

এখন আমি মুর্শিদাবাদে।

ইতিহাস বলে—জনৈক মুখসুখ খাঁ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মুখসুখাবাদ নামে এক জনপদ। কে জানে, কে ছিলেন এই মুখসুখ খাঁ!

'রিয়াজ-উস-সালাতীন' বলে—মুখসুখ খাঁ ছিলেন একজন প্রসিধ্ব ব্যবসায়ী। 'আকবর-নামা' গ্রন্থ বলে—সায়দ খাঁ-র ভাই মুখসুখ খাঁ বঙ্গ-বিহারের নানা জায়গায় রাজকার্যে লিপ্ত থাকার সময় প্রতিষ্ঠা করেন এই মুখসুখাবাদ।

কল্পনার গল্প বলে—জনৈক বৈষ্ণব মুখসুদন দাসই সেই মুকুন্দদাস, যিনি গৌড়ের বাদশা হোসেন শাহ-র এক জটিল রোগ নিরাময় করেছিলেন এবং পারিতোষিক হিসেবে পেয়েছিলেন একটি বিরাট পরগণা, আর তার নামেই নাম রেখেছিলেন মুখসুখাবাদ! কে জানে! কিন্তু এই কিংবদন্তীর মুখসুখাবাদ বা মুখসুদাবাদকে যিনি ঐতিহাসিক মুর্শিদাবাদে পরিণত করেছিলেন, তিনি মুর্শিদকুলি খাঁ—ইতিহাসের পাঠকমাত্রই সে নামের সঙ্গে পরিচিত।

দাক্ষিণাত্যের এক ব্রাহ্মণের সন্তান ছিলেন মুর্শিদকুলি খাঁ। দরিদ্র এই ব্রাহ্মণ সন্তানকে দাস হিসেবে বিক্রি করে দেন তাঁর পিতা। ইস্পাহান নগরে হাজী শফী নামের এক বণিক তাকে কিনে নেন। নাম রাখেন মহম্মদ হাদী। ক্রীতদাস হাদী বুধিমান ছিলেন এবং ক্রেতা শফী পরিচিত হলেন সেই বুধিমত্তার সঙ্গে। বৃধ বণিক তাই তাকে দাসকর্মে নিযুক্ত না করে অন্যান্য কাজে নিয়োগ করেন। বৃধ বণিক মারা গেলে হাদী স্বদেশে ফিরে এসে দেওয়ান হাজী আবদুল্লা খোরাসানীর অধীনে রাজস্ব বিভাগে একটি সামান্য কাজে নিযুক্ত হন এবং নিজ বুধিবলে সম্রাট ঔরঙ্গজেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন স্বল্পকালের মধ্যেই। সম্রাট তাকে এবারে করতলব খাঁ উপাধি দিয়ে ১৭০৯ সালে হায়দ্রাবাদের দেওয়ান পদে নিযুক্ত করলেন। এরপর হলেন বঙ্গের দেওয়ান।

বাংলার রাজধানী তখন ঢাকা। সুজলা-সুফলা বাংলার শস্যসম্পদ তখন কিংবদন্তীর সোনার বাংলাকে মূর্ত করে তুলেছে। কিন্তু করতলব খাঁ দেখলেন রাজস্ব বিভাগের নানাবিধ

বিশৃঙ্খলার ফলে সম্পদ রাজ কোষাগারে জমা হচ্ছে না। তিনি নিজে রাজস্ব সংগ্রহের ভার নিলেন। বিরোধ বাঁধল ঔরঙ্গজেবের পৌত্র যুবরাজ আজিমুশ্বানের সঙ্গে। তিনি তখন ঢাকার অধিকর্তা। করতলব খাঁ-র ঔদ্ধত্য তিনি সহ্য করতে পারলেন না। উভয়ে প্রস্তুত হলেন সম্মুখ সমরের জন্য। একদিন সশস্ত্রে করতলব খাঁ প্রবেশ করলেন আজিমুশ্বানের দরবারে। একজন মুসলমান ঐতিহাসিকের বর্ণনায়—বাঘ যেমন নির্ভীক হৃদয়ে ছাগলের পালে ঢোকে ঠিক তেমনভাবে শাণিতকৃপাণ হাতে তিনি প্রবেশ করেন। আজিমুশ্বানকে অভিবাদন না করে তাঁর পাশে বসে বলেন—'যদি আপনি আমার প্রাণবধে কৃতনিশ্চয় হয়ে থাকেন তবে আমারও প্রতিজ্ঞা আপনার জীবন তার মূল্যস্বরূপ গৃহীত হবে।'

দেওয়ানের ব্যবহারে চমকে উঠলেন আজিমুশ্বান। সন্ধি করলেন তিনি। ফিরে গেলেন করতলব খাঁ কিন্তু নিশ্চিত মনে নয়। জানতেন, আজিমুশ্বান এর প্রতিশোধ নেবেন। ঢাকা তার পক্ষে আর নিরাপদ নয়। তাঁর কর্মচারিদের নির্দেশ দিলেন এমন কোনো স্থান নির্বাচন করতে যেখান থেকে রাজস্ব আদায়ের কাজ সহজ হবে। বঙ্গের কেন্দ্রস্থলে হওয়া চাই সেই স্থান। অনেক অনুসন্ধানের পর চুণাখালি পরগণার মুখসুখাবাদ নির্বাচিত হল সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান হিসেবে। আজিমুশ্বানের অনুমতির অপেক্ষা না করেই তিনি আমলা, কানুনগো ইত্যাদি সব কর্মচারিকে নিয়ে চলে এলেন মুখসুখাবাদে।

কুলুডিয়া নামে এক পতিত জায়গায় নির্মাণ করেলেন তাঁর মহলসরা বা প্রাসাদ। তৎপরতার সঙ্গে সংগ্রহ করলেন প্রচুর রাজস্ব। এক বছর পর গেলেন সম্রাট ঔরঙ্গজেবের দরবারে। প্রভূত ধনসম্পদ পেয়ে সম্রাট সন্তুষ্ট হলেন। তাঁকে দিলেন উৎকৃষ্ট খেলাৎ, বাদশাহী ঝাণ্ডা, নখ্ড়া এবং মনসবী অর্থাৎ সেনানায়কত্ব। আর নতুন উপাধি দিলেন মুর্শিদকুলি খাঁ।

ফিরে এলেন মুর্শিদকুলি খাঁ মুখসুখাবাদে। এবার সেই জনপদের নাম পরিবর্তন করে রাখলেন মুর্শিদাবাদ। স্থাপিত হল ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের জন্মভূমি।

এই সেই মুর্শিদাবাদ, পলাশী যুদ্ধের বিজয়ী সেনাপতি রবার্ট ক্লাইভ যে শহর দেখে বলেছিলেন—এই নগরী লন্ডনের মতোই জনবহুল এবং সমৃদ্ধশালী। এত ধনী ব্যক্তি লন্ডনেও বাস করে না।

—না, আজ আর সে সমৃদ্ধি তার নেই। নবাবী ঐশ্বর্য আজ আধুনিক সভ্যতার স্পর্শে নতুন রূপ গ্রহণ করেছে। তবু আকর্ষণ তার কমেনি আজও। দেশি-বিদেশি পর্যটকের পদচিহ্ন প্রতিদিন মুর্শিদাবাদের জনপথ অলঙ্কৃত করে।

সেই কবে মহারাজাধিরাজ শশাঙ্ক তাঁর গৌড়তন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন কর্ণসুবর্ণ নগরে, সেও আজ মুর্শিদাবাদেরই এক প্রায় অখ্যাত গ্রাম রাঙামাটি-কানসোনা হয়ে আত্মগোপন করে আছে। সেখানে এসেছিলেন বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হিউ-এন-সাঙ। আজ আর সেখানে কেউ যান না। সখের ইতিহাস-দর্শনার্থীদের এখন আকর্ষণ করে হাজারদুয়ারী বা মতিঝিল—যেগুলো ওই কর্ণসুবর্ণের তুলনায় নিতান্তই অর্বাচীন। বড়ো বিস্ময় লাগে এই কথা ভাবলে যে, আমাদের ইতিহাস অনুসন্ধানের বা ঐতিহাসিক স্থান দর্শনের আগ্রহ কত অগভীর। আজ যাঁরা আসেন মুর্শিদাবাদ দেখতে, তাঁরা ক'জন প্রায় দেড় হাজার বছর আগের সেই সুবিখ্যাত কর্ণসুবর্ণের খবর রাখেন তা অঙ্গুলিমেয়।

কলকাতা থেকে কর্ণসুবর্ণ যাওয়া কিছু দুরূহ নয়। হাওড়া-বারহারোয়া লাইনের চিরুটি স্টেশনে নামলে সেখানে পৌঁছুতে সময় লাগে আট ঘণ্টারও কম। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ, তাঁরা চিরুটি স্টেশনের নাম পাল্টে এখন কর্ণসুবর্ণ রেখেছেন।

কিন্তু সে পথে নয়, আজ মুর্শিদাবাদে আসি আমরা শিয়ালদহ থেকে লালগোলা এক্সপ্রেসে বা এস্‌প্লানেড থেকে উত্তরবঙ্গগামী যে কোনো বাসে। রিক্সাওয়ালারা সর্বদাই প্রস্তুত। নির্ভুল লক্ষে দর্শনার্থীদের নিয়ে যাবেন হাজারদুয়ারীতে।

কিন্তু আমি সেদিকে যাই না, যেতে মন চায় না। কেননা, অর্বাচীন হাজারদুয়ারী তো সেই সেদিনের। নবাবী আমলের মুর্শিদাবাদের প্রাচীনতম নিদর্শন আজও স্মৃতিভূত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কাটরা মসজিদে।

আমি পায়ে পায়ে এসে দাঁড়াই মসজিদের সামনে। এই মসজিদ ১৩৭২ সালে নির্মাণ করিয়েছিলেন মুর্শিদকুলি খাঁ। মক্কার প্রধান মসজিদের অনুকরণে এটি নির্মিত। ওই সেই পূর্বদিকের প্রবেশদ্বার যার নীচে চিরদিনের জন্য ঘুমিয়ে আছেন মুর্শিদকুলি খাঁ। মৃত্যুর কিছু আগেই নাকি তিনি অনন্ত বিশ্রামলাভের জন্য সেখানে প্রবেশ করেছিলেন।

কঠোর শাসক ছিলেন তিনি, ছিলেন পবিত্র হৃদয়েরও মানুষ। তার পরিচয় যেন এই বিনীত শয্যা। মসজিদের দ্বারে উৎকীর্ণ এক পার্শি কবিতা বলে—'স্বর্গ ও মর্ত্য উভয় লোকের গৌরব আরবের মহম্মদের জয়। যে ব্যক্তি তাঁহার দ্বারের ধূলি নহে তাঁহার মস্তকে ধূলারাশি বর্ষিত হউক।'

সন্দেহ নেই, পরম ধার্মিক মুর্শিদকুলির উপযুক্ত এই সমাধিলিপি। অজস্র স্মৃতির আর কল্পগল্পের আকর এই কাটরা মসজিদ। এক কাহিনি বলে—মুর্শিদকুলি তাঁর মৃত্যুকাল নিকটবর্তী জেনে এই সমাধি মসজিদ এবং এর কাছেই এক কাঠরা বা বাজার নির্মাণের আদেশ দেন। ইসমাইল ফরাসের পুত্র মুরাদ সমস্ত দেবালয় চার-পাঁচদিনের মধ্যে ধ্বংস করে এই মসজিদ নির্মাণ করেন। রিয়াজ-উদ-সালাতীনেও এই ঘটনার উল্লেখ আছে। কিন্তু ঐতিহাসিক বেভারিজ একে নেহাতই বিকৃত-সত্যের এক ঘটনা বলে মন্তব্য করেছেন। রিয়াজ প্রণেতা গোলাম হোসেন বলেন—মুর্শিদকুলির আমলে মাসে এক টাকা আয় হলে একজন দু'বেলা কালিয়া পোলাও খেতে পারত। টাকায় পাঁচ-ছয় মণ চাল পাওয়া যেত। অনুমান করা চলে, এমন সুশাসক নিশ্চয় নিজের সমাধি নির্মাণে এমন কঠোর নির্মম আদেশ কখনোই দেবেন না যাতে প্রজারা উৎপীড়িত হবে। তবে ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার কিছু ভিন্ন মন্তব্যও করেছেন তাঁর মূল্যায়নে। লিখেছেন—'ব্যক্তিগত জীবনে একজন ভোগ-বিলাসিতা হীন কঠোর সংযতেন্দ্রিয় পুরুষ, তাঁর ধারণা মতো তিনি প্রজাদের প্রতি কর্তব্য পালনে একান্ত মনোযোগী, আনুষ্ঠানিক, গাম্ভীর্যপূর্ণ, ঔরঙ্গজেবের প্রিয় শিষ্যের মতোই ধর্মীয় গোঁড়ামিপূর্ণ।... কিন্তু তাঁর হৃদয় ছিল শীতল, সকল মানুষের প্রতি তাঁর সমান সহানুভূতি ছিল না। তাঁর হিসেব করে প্রতিশোধ স্পৃহা সকল মানুষের সমান কল্যাণ সাধনের মনোবৃত্তির চূড়ান্ত অভাব, তাঁর মতো একজন বিচক্ষণ প্রশাসককে একজন উপযুক্ত রাষ্ট্রনীতিবিদের মর্যাদা দেয়নি এবং তাঁকে ধর্মীয় দিক দিয়ে মহাত্মাও বলা যায় না।'

আমি স্মৃতি দিয়ে ঘেরা মসজিদ-প্রাঙ্গণ ছেড়ে বাইরে আসি। কিছুদূর নীরবে, তারপর যেন অতি সঙ্গোপনে ঈথারে বজ্রনির্ঘোষ অতীতদিনের ঘটনার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আমাকে

স্তব্ধ করে দিল জাহানকোষা কামান। এই সেই জাহানকোষা বা জগৎজয়ী কামান! এখানেই একদিন তোপখানা নির্মাণ করেছিলেন মুর্শিদকুলি খাঁ। জাহাঙ্গীর নগর ঢাকা থেকে দারোগা শের মহম্মদ ও হরবল্লভ দাসের তত্ত্বাবধানে নির্মিত এই কামান তিনি এনেছিলেন ১৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে। দৈর্ঘ্যে ১২ হাত ও সাড়ে তিন হাত বেড় বিশিষ্ট এই কামানে নয়টি পিতলের ফলক ছিল। দুশো মণ ওজনের এই কামানে আটাশ সের বারুদ লাগত অগ্নিবর্ষণের জন্য। শোনা যায়, এর নির্মাতা হলেন সেই জনার্দন কর্মকার, যিনি বিষ্ণুপুরের দলমাদল কামানটিও তৈরি করেছিলেন। এখন আমি সেই জাহানকোষার কামানের মুখোমুখি। আমি জানি, কোনো জ্বলন্ত গোলার আঘাতে আমি ছিন্নভিন্ন হয়ে লুটিয়ে পড়ব না ধুলোয়, শুধু বারংবার স্মৃতির বিস্ফোরণে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকব। বাংলার কি বিপুল ঐশ্বর্য, কি বিস্ময়কর কারুকৃতি, কি প্রবল শক্তি একদা সমস্ত ভারতবর্ষে তাঁকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল —এই ভাবনা মনকে ক্ষণিকের জন্য আচ্ছন্ন করে!

আমি অভিভূত পায়ে এগিয়ে যাই বহরমপুর লালগোলা রোড ধরে। মাইল পাঁচেক দূরে ওই চুনাখালি গ্রামে আছে আর এক সুপ্রাচীন মসজিদ। পঞ্চদশ শতাব্দীতে সম্ভবত গৌড়েশ্বর হুসেন শাহর সময় নির্মিত হয়েছে এখানে ফকির মসনদ আউলিয়ার সমাধি মসজিদ। বয়সে হয়তো কাটরা মসজিদের চেয়েও প্রাচীন। এই মসজিদটি বিলুপ্ত নবাবী বাংলার আর এক নীরব সাক্ষী। হ্যাঁ, সবই নীরব, সবাই নীরব। আর এই নীরবতার দুঃসহভার বহন করতে না পেরে কোনো কোনো প্রত্নচিহ্ন মাটির বুকে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। সে তো কম বেদনার ঘটনা নয়! কত শৌর্য, কত ষড়যন্ত্র, কত বিশ্বাসঘাতকতার কুটিল চক্রান্তে আকীর্ণ এই মুর্শিদাবাদের ইতিহাস। ওই তো সেই পথ, যে পথের ধূলিকণা একদিন বাংলার স্বাধীন নবাব সিরাজদৌল্লার ফোঁটা ফোঁটা রক্তে ম্লান হয়ে গিয়েছিল। এই তো সেই পথ, যে পথ পঞ্জর-দর্পিত ক্লাইভের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভাড়াটে সৈন্যদের পদভারে বিদীর্ণ হয়েছিল।

হায় সিরাজ! আমার আবাল্য বাঙালি অনুভূতির মর্ম থেকে উঠে আসে বিষণ্ণ দীর্ঘশ্বাস, আমি জানি বাঙালিমাত্রই এমন বিষণ্ণতার শিকার।

সে তো আজকে নয়—সেই কবে মুর্শিদকুলি খাঁ গড়ে তুলেছিলেন এই মুর্শিদাবাদ। নিপুণ শাসনে গড়ে তুলেছিলেন নবাবী বাংলার এই রাজধানী। তাঁর মৃত্যুর পর উড়িষ্যার শাসনকর্তা জামাতা সুজাউদ্দিন বাংলার মসনদে বসে নারীদেহ আর অমিতবিলাসে মুর্শিদাবাদের প্রাসাদকে করে তুলেছিল স্বর্গপুরী—সেসব আজ কল্প কাহিনির মতো মনে হয়। অথচ এসব কোনোটাই কাল্পনিক নয়। কামকাতর সুজাউদ্দিনকে প্রায় ত্যাগই করেছিলেন মুর্শিদকুলির কন্যা জিন্নৎউন্নিসা। মুর্শিদাবাদেই তিনি থাকতেন পুত্র সরফরাজকে নিয়ে। কিন্তু সুজাউদ্দিন উড়িষ্যার শাসনকর্তা হলেও বাংলার মসনদ তাঁর কাম্য ছিল। তাই তুর্কি যুদ্ধ-ব্যবসায়ী মির্জা হাজী ও মির্জা আলির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন তিনি। তাঁর সঙ্গে তখন হাত মিলিয়েছেন মুর্শিদাবাদের ধনকুবের জগৎশেঠ। বাংলার ভাগ্যাকাশে দুর্যোগের যে ঘনঘটা শুরু হয়েছিল, এই জগৎশেঠই ছিলেন তার অন্যতম নায়ক।

সরফরাজ খবর পেলেন পিতা সুজাউদ্দিন মুর্শিদাবাদ দখল করতে আসছেন। সৈন্যবাহিনীও প্রস্তুত। কিন্তু সরফরাজকে সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত করে মুর্শিদকুলির বেগম নৌসেরীবানু বললেন—অকারণে পিতাপুত্রে দ্বন্দ্ব করে কি লাভ! সুজাউদ্দিন মারা গেলে তো সরফরাজ মসনদ পাবেই। যুক্তি মেনে নিলেন সরফরাজ। বাংলার মসনদে এলেন কামুক সুজাউদ্দিন, মুর্শিদাবাদ হয়ে উঠল মহফিলখানা। শাসনকাজের কিছুই দেখতেন না সুজাউদ্দিন। দেখতেন শুধু সুন্দরীদের অনাবৃত দেহ আর সেই সুযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করেছিলেন সেই মির্জা হাজী এবং মির্জা আলি। মির্জা আলির নাম পরিবর্তিত হয়ে আলিবর্দি খাঁ হন এবং তাঁকে বিহারের শাসনকর্তা হিসেবে নিয়োগ করা হল।

সুখেই ছিলেন সুজাউদ্দিন, বেহেস্তের স্বপ্ন দেখছিলেন মসনদে বসে। কিন্তু ধূমায়িত অশান্তি যে নিঃশব্দ ছায়ার মতো এগিয়ে আসছিল গ্রাস করতে তা তিনি অনুমানও করতে পারেননি। একদিন সুখী সুজাউদ্দিন হঠাৎ শুনলেন তাঁর স্ত্রী নাকি প্রতিদিন এক একজন যুবকের স্পর্শে নিজের যৌবনকে ধন্য করছেন এবং পরদিন সেই যুবকের মৃতদেহ নিক্ষিপ্ত হচ্ছে হারেম থেকে বাইরে।

তাঁর স্ত্রী জিন্নৎউন্নিসা 'কলিজাখাকী বেগম' নামেই পরিচিত হয়েছেন মুর্শিদাবাদে। সংবাদটি শোনেন সুজাউদ্দিন আর কপালে করাঘাত করেন এবং শেষ পর্যন্ত সহ্য করতে না পেরে জীবন্ত সমাধি দেন তাঁর পত্নীকে। অনুমান করেন সুজাউদ্দিন, তাঁর আয়ুষ্কাল শেষ হয়ে এসেছে। পুত্র সরফরাজকে ডেকে মসনদ তুলে দেন তাঁর হাতে। অনুরোধ করেন—জগৎশেঠ, মির্জা হাজী এবং রায় রায়ানকে মন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করতে।

বাংলার মসনদে কাঁটার আসনে বসলেন সরফরাজ খাঁ। চতুর্দিকে চক্রান্তের জাল। নবাব আলিবর্দি বিহারের মসনদে সন্তুষ্ট নন। জগৎশেঠ, উমিচাঁদ বিদেশি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে মুনাফার চুক্তিতে তৎপর। দিল্লিশ্বর পরাজিত হয়েছেন পারস্য সম্রাট নাদির শাহর কূটশক্তির কাছে।

পরামর্শ দিলেন জগৎশেঠ, বাংলার নবাবের পক্ষ থেকে উপঢৌকন দেওয়া হোক নাদির শাহকে। তাঁরই টাঁকশালে তৈরি হল নাদির শাহের নামাঙ্কিত মুদ্রা। কিন্তু বড়োই দুর্ভাগ্য সরফরাজের। ময়ূর সিংহাসন সহ পারস্যে প্রত্যাবর্তন করেছেন নাদির শাহ। প্রচুর অর্থব্যয় হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। পরামর্শ করতে ডাকলেন জগৎশেঠকে। তিন কোটি টাকার মতো যে সম্পদ মুর্শিদকুলি খাঁ গচ্ছিত রেখেছিলেন তার কাছে, তা ফেরত দিতে।

জগৎশেঠ প্রমাদ গুণলেন। রায় রায়ান, জগৎশেঠ আর মির্জা হাজী গোপন দূত পাঠালেন বিহারে আলিবর্দি খাঁ-র কাছে। সৈন্যবাহিনীতে বিশ্বাসঘাতকতার অশুভ পদসঞ্চার শুরু হল। কামানের গোলায় বারুদের বদলে মাটির ঢেলা ভরা হল।

তারপর গিরিয়ার সেই যুদ্ধ। আলিবর্দির কামানের শেলের প্রত্যুত্তরে সরফরাজের সৈন্য ওড়ালো শুধু ধুলোর ঝড়। স্তম্ভিত সরফরাজ দমলেন না। দমল না সেনাপতি ঘৌস খাঁ। চার সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যসহ সরফরাজ যুদ্ধযাত্রা করলেন। আলিবর্দি ছিলেন চতুর। লিখে পাঠালেন—'আপনার পিতার অনুগ্রহে আমি উচ্চপদ ও সম্মানপ্রাপ্ত হইয়াছি, এটাই আমার গৌরব। কখনো আপনার প্রতি অন্যায় আচরণ করি নাই, করিব না। ঘৌস খাঁকে দরবার হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিন, চক্ষুলজ্জায় স্বয়ং এতদূর না করিতে পারিলে অনুমতি দান করুন

আমি তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ করি। আমি কোরাণ শপথ করিলাম, এই কোরাণ ভগবৎসকাশে প্রেরিত হইতছে।'

রিয়াজ-উস-সালাতীন সন্দেহ করে—কোরাণের পরিবর্তে নাকি একখণ্ড বস্ত্রমণ্ডিত ইট পাঠানো হয়েছিল।

সরফরাজ কিন্তু এবার প্রতারিত হলেন না। তোপখানার দারোগা সাহরিয়াকে পদচ্যুত করলেন। ফিরিঙ্গি এন্টনির ছেলে পাঁচুকে বসানো হল সেই পদে। প্রত্যুষে শুরু হল গিরিয়ার যুদ্ধ। আলিবর্দির কামানের গোলা আছড়ে পড়ল সরফরাজের তাঁবুতে। হস্তীপৃষ্ঠে নবাব স্বয়ং অগ্রসর হলেন যুদ্ধক্ষেত্রে। প্রভুভক্ত মাহুতের নিষেধ অগ্রাহ্য করলেন। কিন্তু ব্যর্থ তাঁর অভিযান। প্রচণ্ড এক গোলার আঘাতে লুটিয়ে পড়লেন ধুলোয়। বাংলার ইতিহাসে স্বয়ং নবাব এই প্রথম যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দিলেন। আহত হলেন বিশ্বাসঘাতক রায় রায়ান। ঘৌস খাঁ আলিবর্দির সেনাপতি নন্দলালকে পরাভূত করে নবাবের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন, কিন্তু নবাবের নিহত হবার সংবাদে নিরাশ হলেন। কিন্তু পালিয়ে না গিয়ে যুদ্ধ করতে করতে প্রাণত্যাগ করলেন। দ্বিতীয় সেনাপতি হতাশ মনে বীরভূমের দিকে হওনা হলেন।

আর বিজয়ী আলিবর্দি খাঁ এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের শোভায় চমকে উঠলেন। সরফরাজের জমাদার বিজয় সিংহ প্রবল বিক্রমে লড়াই করে নিহত হয়েছেন আর তাঁর নয় বছরের বালক জালিম সিংহ পিতার মৃতদেহ রক্ষার জন্য নিষ্কোষিত তলোয়ার হাতে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে উদ্যত-অসি আলিবর্দির ওই সৈন্যদল। এমন অসমসাহসী এক দৃশ্যের মুখোমুখি হয়ে মুগ্ধ হলেন আলিবর্দি। আশ্বাস দিলেন জালিম সিংহকে। হিন্দুমতে সৎকার করা হল বিজয় সিংহের দেহ। আর সেই বিস্ময়কর দৃশ্যের নীরব ইতিহাস হয়ে রইল সেই রণক্ষেত্র 'জালিম সিংহের মাঠ' নামে।

বিজয়ী আলিবর্দি দূত হিসেবে হাজীকে পাঠালেন মুর্শিদাবাদ। নিজে গেলেন দু'দিন পর। বিনীত বিনম্রচরণে সরফরাজ-জননীর কাছে কৃতকর্মের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন। কোনো উত্তর দিলেন না জিন্নাৎউন্নিসা। তখন দরবার কক্ষে প্রবেশ করে সকলের সামনে মসনদে বসলেন। বাংলার নবাব হলেন আলিবর্দি খাঁ। শুরু হল মুর্শিদাবাদের নতুন ইতিহাস। এসব তো বহুকাল আগের ঘটনা! কিন্তু মুর্শিদাবাদের মাটিতে দাঁড়িয়ে ছায়াছবির মতো মনে জেগে ওঠে ঘটনাবহুল দৃশ্যাবলী। সামান্য তুর্কি যুদ্ধ-ব্যবসায়ী মির্জা আলি রূপান্তরিত হলেন নবাব আলিবর্দি খাঁ-এ। এ এক রোমাঞ্চকর ইতিহাসের কাহিনি।

কিন্তু এ তো সুখের সিংহাসন নয়। মহাপ্রতাপশালী শিবাজীর স্বপ্ন তখন ছিন্নভিন্ন। তাঁর আদর্শ বিস্মৃত হয়ে তাঁর অনুচরেরা 'চৌথ' আদায়ের নামে নিরীহ মানুষের সর্বস্ব লুণ্ঠনের শোণিতাক্ত খেলায় মেতে উঠেছেন। বর্গী এলো দেশে। লুব্ধ ভাস্কর পণ্ডিত এগিয়ে এলেন বাংলার দিকে। তাঁর সঙ্গে হাত মেলালেন আলিবর্দিরই এক ফৌজদার মীর হাবিব। তাঁর পরামর্শে মারাঠারা দক্ষিণ হুগলি অধিকার করে দাঁইহাটের ঘাটে নৌকোর পুল বেঁধে পার হয়ে মুর্শিদাবাদের কাছে এলেন। ভীত নাগরিকদের অনেকেই পালিয়ে গেলেন মালদহে-রামপুরে-বোয়ালিয়ায়। নবাবের পরিবারবর্গের অনেকে পদ্মানদী পার হয়ে গোদাগাড়িতে চলে গেলেন। কৃষি-বাণিজ্য স্তব্ধ হল। 'বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেবে কিসে'! ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কলকাতায় মারাঠা খাল খনন করলেন। অনেকে তাঁদের আশ্রয়ে চলে

গেলেন। সেই মারাঠা খাল ভরাট করেই এখন সার্কুলার রোড। সে অন্য ইতিহাস। বিলুপ্ত রাজধানী নয়, বর্তমান রাজধানী কলকাতার প্রসঙ্গ।

আলিবর্দি অগ্রসর হলেন কাটোয়ার দিকে। দাঁইহাটে দুর্গোৎসবের আয়োজন করেছেন ভাস্কর পণ্ডিত। গভীর রাত্রে নৌ-সেতু পার হলেন নবাব সৈন্য। দু-একখানা নৌকো প্রবল চাপে ভেঙেও গেল। কিন্তু নবাব সৈন্য অকস্মাৎ আক্রমণ করলেন বর্গীদের। ভাস্কর পণ্ডিত অষ্টমী পুজোর দিন পালিয়ে গেলেন।

মহারাষ্ট্র পুরাণ আর মুতাক্ষরীণ এবং গোলাম হোসেন মারাঠাদের এই কালনিদ্রার উল্লেখ করেছেন। উধারণপুরের মাঠের সেই যুদ্ধে সেদিন নবাবের সঙ্গে ছিলেন তাঁর বেগম এবং আদরের নাতি সিরাজদৌল্লা। বাংলার ভবিষ্যৎ নবাব সিরাজদৌল্লার সেই প্রথম রণক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা। বিজয়ী নবাব ফিরলেন মুর্শিদাবাদে। কিন্তু দুঃসংবাদ তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল। নবাবী সৈন্যও লুণ্ঠকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং আফগানরা দখল করেছে বিহার। নিহত করেছে সিরাজদৌল্লার পিতা বিহারের শাসনকর্তা ফৈজুদ্দীনকে। অনেকেই লোক ঠকানো প্রশ্ন করে থাকেন—সিরাজের পিতার নাম কি? আমাদের বিদ্যালয় পাঠ্য ইতিহাস নীরব। সেখানে আলিবর্দিরই প্রাধান্য। এই সুযোগে সিরাজের পিতা ফৈজুদ্দীনের নাম বলা গেল।

বিভ্রান্ত আলিবর্দি এবার সন্ধি করতে এগিয়ে এলেন। উড়িষ্যার অধিকার দিলেন বর্গীদের। পাটনায় পরাস্ত করলেন আফগানদের। বিহার অধিকৃত হল। আর এই যুদ্ধের নেতৃত্ব দিলেন তরুণ সিরাজদৌল্লা। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিলেন সিরাজদৌল্লা। আমার বিস্ময় বাধা মানে না, যখন এই নবাবের নাম মনে পড়ে। এমন বিচিত্র পরস্পর বিরোধী গুণ ও দোষের সমাবেশ অন্য কোনো নবাবের ছিল কিনা সন্দেহ! এমন ভাগ্যহীনও আর কেউ ছিলেন কিনা, তা ইতিহাস জানে! সাহসী ছিলেন, বেপরোয়া শত্রুনিধনে সুকঠোর আবার চারিত্রিক স্খলনও কত! আলিবর্দীর বিপদ কমে না। বণিকের ছদ্মবেশে যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি একদা বিনীত পদক্ষেপে এসেছিল এদেশে—তারা ক্রমে দস্যুদের হাত থেকে রক্ষা পাবার অধিকার, দুর্গ নির্মাণ, গড় খনন করতে শুরু করেছে কলকাতায় এবং অন্যত্র। আব শুরু হয়েছে মুর্শিদাবাদের প্রাসাদে এক ভয়ঙ্কর বিকৃত নাটকের অভিনয়। সে নাটকেব মঞ্চও মতিঝিল প্রাসাদ।

এই সেই মতিঝিল প্রাসাদ! যার সামনে আমি এখন দাঁড়িয়ে। এখানেই একদিন নাচতে এসেছিল বাবর আর মুন্না নামে দুই নর্তকী। যারা পরবর্তীকালে মণি বেগম আর ঘসেটি বেগম নামে খ্যাত হয়েছিলেন। এই সেই প্রাসাদ, যেখানে থাকতেন আলিবর্দির জামাতা ওয়াজিস মহম্মদ। আলিবর্দির তিন মেয়ের মধ্যে দু'জন থাকতেন এই প্রাসাদে, একজন পূর্ণিয়ায়। এই প্রাসাদেই থাকতেন আমিনা বেগম—সিরাজের মা। আর এখানে তাঁকে আর ঘসেটিকে ঘিরেই জমে উঠেছিল এক ভয়ঙ্কর নাটক। অফুরন্ত রূপের শরীর ছিল ঘসেটির। আর তা তিনি অকাতরে দান করেছিলেন হোসেন কুলি নামে এক রূপবান যুবককে! আব আরব কন্যা আমিনা বেগমও হোসেন কুলির শরীরে রেখেছিলেন তাঁর শরীর। হোসেন কুলি ছিলেন ঢাকার দেওয়ান। ভীরু ওয়াজিসের প্রিয়পাত্র রাজা রাজবল্লভ ছিলেন তাঁরই পেশকার; সম্পূর্ণ সুযোগ নিয়েছিলেন তিনি। গোপন খেলায় ভরে গেল মতিঝিল প্রাসাদ। সিরাজের

কানে গেল তাঁর মায়ের এই রুচিহীনতার সংবাদ। প্রতিজ্ঞা করলেন সিরাজ—হোসেন কুলিকে হত্যা করতে হবে।

সমস্ত মুর্শিদাবাদ তখন সিরাজের নামে কম্পিত। কথিত আছে, কেউ তাঁর সম্মুখে পড়লে 'ভগবান রক্ষা করো' এমন সভয় উক্তি করত।

সিরাজ আলিবর্দি বেগমের অনুমোদন নিয়ে মাতামহ আলিবর্দির অনুমতি প্রার্থনা করলেন। স্নেহান্ধ ছিলেন নবাব। তিনি ওয়াজিসের শরণাপন্ন হলেন। সামান্য কারণে ঘসেটি বেগম তখন হোসেন কুলির প্রতি বিরক্ত। তিনি ওয়াজিসেরই বেগম। সম্মতি পেলেন সিরাজ।

তারপর একদিন বিকেলে মতিঝিল থেকে বেরিয়ে আসছেন সিরাজ, কিছুদূর যেতেই পথপ্রান্তে দেখা গেল হোসেন কুলির বাড়ির একাংশ। দ্রুতপায়ে তিনি সেই বাড়িতে ঢুকে আদেশ দিলেন হোসেন কুলি ও তাঁর ভাইকে ডেকে দিতে। ভীত হোসেন তখন লুকিয়ে ছিলেন পাশের বাড়ির হাজা মেহেদীর কাছে। তাঁকে টেনে আনা হল। তাঁকে সকলের সামনে খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেললেন সিরাজদৌল্লা। তাঁর ভাগ্যের নিয়ামক কি কোনো নিষ্ঠুর ইঙ্গিত করলেন এই ঘটনায়?

সিরাজ ফিরে এলেন নবনির্মিত হীরাঝিল প্রাসাদে। না, আমার কোনো কল্পনাই আর স্পর্শ করতে পারে না হীরাঝিল প্রাসাদের কোনো অবয়বকে। নেই সেই প্রাসাদ। কবে গঙ্গাগর্ভে গভীর অপমানে আর লজ্জায় নিমগ্ন হয়ে গেছে তা কেউ জানে না। অথচ পূর্বদেশে এমন চমৎকার এক শোভার প্রাসাদ নাকি আর ছিল না। মুতাক্ষরীণ অনুবাদক মুস্তাফা বলেন—'তিনজন ইউরোপীয় রাজা সুখে-স্বাচ্ছন্দে পৃথকভাবে বাস করতে পারতেন এই প্রাসাদে।'

তখন গৌড় বিলুপ্ত রাজধানী। তার শোভাকীর্ণ প্রাসাদ ভেঙে বহুমূল্য রত্ন আর প্রস্তরখণ্ড এনে এই প্রাসাদ গড়েছিলেন সিরাজদৌল্লা। ঠিক এই সংবাদ প্রসঙ্গে এলে শত অপরাধে অপরাধী সিরাজের সব দোষ ক্ষমা করেও এই ভণ্ডালিজমের জন্য ক্ষমা আমি কিছুতেই করতে পারি না। গৌড়কে শ্রীহীন করে এই শ্রীবৃদ্ধি সিরাজের ভয়ানক এক বিকৃতরুচি মনেরই পরিচায়ক। ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে ছিল এই প্রাসাদ। সম্মুখের সরোবরকে আরো বিস্তৃত করে খনন করে তৈরি করা হয়েছিল হীরাঝিল। মনোরম উদ্যান ছিল তার পাশে, জলকেলীর জন্য সুবিস্তৃত স্নানাগার। নাম হল মনসুরবাদী। প্রাসাদ ও প্রাসাধিকারীদের ব্যয় নির্বাহের জন্য মনসুর গঞ্জ বাজার নির্মাণ করা হল। এক অভূতপূর্ব নজরানার ব্যবস্থা হল। গল্প আছে—প্রাসাদ নির্মাণের পর দৌহিত্রের নিমন্ত্রণে নবাব আলিবর্দি পাত্র-মিত্র সহ প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে ঘোরার সময় সিরাজের কৌশলে বন্দী হলেন। সমবেত জমিদাররা সিরাজের চালাকি বুঝতে পেরে নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলে ৫,০১,৫৯৭ টাকা দিয়ে নবাবকে কারামুক্ত করলেন। শুরু হল 'নজরানা মনসুর গঞ্জ'। কিন্তু হোসেন কুলির অভিশপ্ত আত্মা মুর্শিদাবাদে শান্তি এনে দিল না। বৃদ্ধ হয়েছেন আলিবর্দি। রায় রায়ানকে দিয়েছিলেন বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার। কিন্তু সে ভার রায় রায়ান বহন করতে পারেননি। গৃহিনীর প্রবল ধিক্কারে হীরার আংটির বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন তিনি। ভগ্নিপতি মীরজাফরকে দিয়েছিলেন সেনাপতির পদ। তিনি বিশ্বস্তই আছেন, তবে কতদিন থাকবেন বলা শক্ত। কেননা, দৌহিত্র সিরাজ কাউকেই যথোচিত সম্মান জানাতে চান না। শুনতে পান আলিবর্দি,

বড়ো উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছেন সিরাজদৌল্লা। কিছুদিন আগে সিরাজ নবাবকে এক চিঠি লিখেছিলেন, 'আপনি পিতৃব্যগণকে রাজপদ দিয়া সম্মানিত করিয়াছেন, কেবল আমার সময়েই স্তোকবাক্যমাত্র ও কল্পিত আদর! নিজের ন্যায্য দাবি বলপূর্বক অধিকার করিব। যদি নিতান্ত বিবাদই উপস্থিত হয়, তবে হয় আপনার মস্তক আমার বক্ষদেহে বা আমার মস্তক আপনার পাদদেশে পতিত হইলে ইহার মীমাংসা হইবে।' মুতাক্ষরীণ-এ আছে এই উধৃত চিঠির বয়ান।

উত্তরে লিখেছিলেন স্নেহকাতর আলিবর্দি—'নির্বোধ! তুমি ভুল বুঝিয়াছ।' উৎকীর্ণ করেছিলেন একটি শ্লোক—'গাজীরা অর্থাৎ ধর্মের জন্য যুদ্ধ করিয়া যাঁহারা প্রাণত্যাগ করেন তাঁহারা জানেন না সংসার সংগ্রামে স্নেহের সহিত যাঁহারা প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করেন তাঁহারাই প্রকৃত শ্রেষ্ঠ বীর।'

কিন্তু এইসব পার্শি শ্লোকের মর্মার্থ বোঝার সময় ও ক্ষমতা সিরাজের নেই। চূড়ান্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ও অনাচার তাঁকে গ্রাস করেছে।

রিয়াজ-উস-সালাতীন বলে--'মহাত্মা আলিবর্দির শ্রীবৃদ্ধির দশায় তাঁহার পরিবারবর্গ যেরূপ লাম্পট্য ও অনাচার আরম্ভ করিয়াছিল তাহা ভদ্রভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। তাঁহার প্রিয়তম সিরাজদৌল্লা যেরূপ ঘৃণার্হ, দুষ্টাচার করিতেন তাহা যে কোনো লোকের পক্ষেই নিতান্ত অপযশস্কর। পদমর্যাদা, বয়স বা স্ত্রী-পুরুষ কিছুই গ্রাহ্য করত না। যৌবনসুলভ চাপল্যে যাহাকে ইচ্ছা তাহারই ওপর অনাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতা আবদ্ধ হইল।'

চিন্তিত আলিবর্দি বয়সের ভারে আরো জীর্ণ হতে লাগলেন। হীরাঝিলের প্রাসাদ মুখর হল বাঈজীর নৃত্য-গানে। ফরাসি ঐতিহাসিক ল' সাহেব সিরাজের কামাচারের বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে—'বর্ষাকালে খেয়ার নৌকা ডুবাইয়া আমোদ দেখা ও ঘাটে ঘাটে চর পাঠাইয়া গঙ্গাস্নানের জন্য সমাগতা সুন্দরী স্ত্রীলোক ধরিয়া আনা তাঁহার বিলাস ছিল।'

কে জানে এসব উক্তি সত্য কিনা! প্রবাদ এখনো আমাদের মাঝে মাঝে শুনিয়ে দেয় 'যেন নবাব সিরাজদৌল্লা'র কথা। গর্ভিণী নারীর গর্ভবিদারণের চমকপ্রদ বর্ণনা ইংরেজ ঐতিহাসিকের কলমে রূপলাভ করেছে। হয়তো সবটাই সত্য নয়। কিন্তু একথাও অর্ধসত্য যে, সিরাজ একজন পূতচরিত্র দেশভক্ত নবাব ছিলেন। শোকে, ক্ষোভে, দুঃখে মারা গেলেন আলিবর্দি খাঁ। খোসবাগে তাঁকে সমাধি দেওয়া হল।

আমি এবার ভাগীরথীর পশ্চিম পাড়ে খোসবাগে এসে পৌঁছই।

আমার স্মৃতি থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্তের মতো অশ্রু নামে মনের মাটিতে। শুনেছি—একদিন এখানে এসে নেতাজি সুভাষচন্দ্র দাঁড়িয়ে অশ্রুপাত করেছিলেন। আমি জানি, বাংলার ইতিহাসের এক করুণ অধ্যায় সমাহিত আছে এই খোসবাগের মাটিতে।

ওই তো সিরাজদৌল্লার সমাধিস্থান। চির অশান্ত এক নবাব পরম শান্তিতে যেন লুকিয়ে আছেন এই সমাধির নীচে। না, এখন কেউ আর তাঁর কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না। কোনো বিশ্বাসঘাতকের উন্মুক্ত তরবারি আঘাত করতে পারবে না তাঁর রাজকীয় শরীরে।

শরীর! শরীর! শুধু শরীরের নেশায় কিছুদিন ডুবেছিলেন নবাব সিরাজ। দিল্লি থেকে এসেছিল বাঈজী ফৈজী। 'ভারতীয় সৌন্দর্যের নির্ভুল প্রতীক সিরাজের প্রিয় ফৈজীর গায়ের

রঙ ছিল চাঁপার মতো, ওজন মাত্র বাইশ সের। এক লক্ষ টাকা সেলামি দিতে হয়েছিল তাঁকে আনতে।'

তেইশ বছরের তরুণ সিরাজ আলিবর্দির পর বাংলার নবাব। মসনদে বসে তিনি পরিবর্তন করলেন কিছু কিছু পদাধিকারীর। মীরমদনকে দিলেন গোলন্দাজ সৈন্য বিভাগের ভার এবং দেওয়ানী দিলেন মোহনলাল নামে এক হিন্দু যুবকের হাতে। সেনাপতি রইলেন মীরজাফর। কিন্তু অধিকার কিছু কমল জগৎশেঠ এবং মীরজাফরেরও। দুর্বিনীত, কঠোর, সাহসী ও খেয়ালি নবাব মসনদে বসেই টের পেলেন ইংরেজদের ঔদ্ধত্য। কলকাতা, কাশিমবাজার, শ্রীরামপুর, চট্টগ্রাম সব জায়গাতেই কুঠির ভেতর তাঁরা রেখেছেন সৈন্য আর অস্ত্র। জগৎশেঠ, উমিচাঁদ, রায়দুর্লভ এবং নন্দকুমার তাঁদের সহায়তা করছেন। বৈঠক বসছে কলকাতায় মীরজাফরের বাড়িতে। কাশিমবাজারের কুঠিতে। চক্রান্তজাল ছড়িয়ে পড়ছে কলকাতা থেকে লন্ডনে। সিরাজের পদচ্যুতিই এইসব চক্রান্তের লক্ষ্য।

ক্ষিপ্ত হন তরুণ নবাব। এদিকে বিশ্বাসঘাতকতা করে স্বয়ং এক লাখ টাকার বাঈজী, ফৈজী। সিরাজের ভগ্নিপতি সৈয়দ মহম্মদ খাঁর হাতে ধরা দেয় ফৈজী। সিরাজ স্তম্ভিত হন। তাঁর ঘৃণার প্রত্যুত্তরে ফৈজী স্মরণ করিয়ে দেয় আমিনা বেগমের সেই ব্যভিচারের কথা। স্তম্ভিত সিরাজ চমকে ওঠেন। তারপর এক নির্মম নিষ্ঠুর আদেশে হীরাঝিল প্রাসাদে জীবন্ত সমাধি দেওয়া হয় ফৈজীকে। লুৎফুন্নিসা সিরাজের বেগম এবার তাঁর নিজস্ব অধিকার ফিরে পান।

সিরাজ গুপ্তচর মারফত খবর পান, মাতামহ আলিবর্দির ছোটো মেয়ে সাহি বেগম, যিনি পূর্ণিয়ায় থাকতেন তাঁর ছেলে শওকত জঙ্গকে নবাবের পদে বসানোর ষড়যন্ত্র করছেন জগৎশেঠের দল।

আহত সিংহের মতো উন্মত্ত সিরাজ মীরজাফর আর মীরমদনকে পাঠালেন পূর্ণিয়ায় শওকত জঙ্গকে বন্দী করতে। জগৎশেঠও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। কিন্তু সিরাজ অন্য ধাতুতে গড়া, জগৎশেঠের উত্তেজনা একটি প্রবল চড়ে নিভিয়ে দিলেন। কারাগারে নিক্ষিপ্ত করলেন জগৎশেঠকে। পূর্ণিয়া জয় না করে মীরজাফর ফিরে এলেন বন্ধুর এই অবমাননা দেখে। সিরাজ আরো ক্রোধান্বিত হলেন। মোহনলাল তাঁকে উত্তেজনা থেকে রেহাই দিলেন। মীরজাফর ফিরে গেলেন পূর্ণিয়ায়। মদ আর নারীতে মত্ত শওকত জঙ্গ মদের পাত্রেই মুখ থুবড়ে পড়লেন নবাবী সৈন্যদের আঘাতে।

থামলেন না সিরাজ। জানতেন, শত্রুর শেষ রাখতে নেই। ইংরেজরা প্রচুর সৈন্য আমদানী করেছেন কলকাতায়। সিরাজ কলকাতা অভিযানের সিদ্ধান্ত নিলেন। এ খবর জানলেন শুধু দুইজন। বিশ্বস্ত সেনাধ্যক্ষ মোহনলাল ও মীরমদন। কিন্তু রাজকোষ শূন্য।

এবার একটি সুনিপুণ চতুরতার আশ্রয় নিলেন সিরাজ। মনে পড়ল মতিঝিল প্রাসাদে ঘসেটি বেগমের অজস্র ধনরত্নের কথা। মনে পড়ল জগৎশেঠের সঙ্গে ঘসেটির যোগাযোগের কথা। মনে পড়ল ঘসেটির নতুন প্রেমিক নাজির আলির কথা। একদিন ভোরে মতিঝিল প্রাসাদ ঘিরে ফেলল নবাবী সৈন্য। নাজির আলিকে কিন্তু হোসেন কুলির মতো অস্ত্রের আঘাত সইতে হল না। সিরাজের পাল্কি থেকে বেগম লুৎফুন্নিসা নেমে এসে ঘসেটিকে নিয়ে গেলেন হীরাঝিলের প্রাসাদে। আর তার সঙ্গে বন্দী ঘসেটির প্রভূত অর্থও প্রবেশ করল রাজকোষে। কাশিমবাজার কুঠিও তৎপরতার সঙ্গে দখল করলেন সিরাজ।

ইংরেজ সেনাপতি ইলিয়ট আত্মহত্যা করলেন।

এবার কলকাতা অভিযান।

বাংলার ইতিহাসের আর এক সন্ধিলগ্ন। অনেক ঐতিহাসিক বলেন—ওই অভিযান সিরাজ যদি না করতেন তবে হয়তো ভারতের ইতিহাস অন্যরকম হত। একজন মুসলমান ঐতিহাসিক বলেন—'ইংরেজ পক্ষের সহিত এই বিবাদ সামান্য কর্মচারিগণের দ্বারা দু-এক কথায় মীমাংসা হইতে পারিত।'

কিন্তু সিরাজ জানতেন তাঁর আসল শত্রু কে। কুখ্যাত সেই হলওয়েল, যিনি অন্ধকূপ হত্যার কাহিনি বর্ণনা করেছিলেন, তিনিও লিখেছিলেন এক চিঠিতে—নবাব আলিবর্দি খাঁ নাকি সিরাজকে অন্তিম উপদেশ দিয়েছিলেন এই বলে—'ইউরোপীয়গণের দিন দিন যেরূপ শক্তি বৃদ্ধি হইতেছে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। ইংরেজগণই অধিক ক্ষমতাপন্ন হইয়াছে। সর্বাগ্রে তাহাদিগকে দমন করিবে। বৎস, তাহাদের দুর্গাদি ও সৈন্য রাখিতে দিও না, যদি দাও তোমার দেশ থাকিবে না।'

প্রায় পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিয়ে সিরাজ যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন। এখন যেখানে শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেন সেখানে নবাবী কেল্লা ছিল। ইংরেজরা প্রথমে সে কেল্লা দখল করলেও নবাবসৈন্য পরে সেই দুর্গ থেকে ইংরেজদের তাড়িয়ে দিল। উমিচাঁদ কারারুদ্ধ হলেন ইংরেজদের দুর্গে। নবাবসৈন্য এবার বাগবাজারে উপনীত হল। তুমুল যুদ্ধ শুরু হল। সম্পূর্ণ এলাকাটি আগুনে ভস্মীভূত হল। ইংরেজদের দুর্গ তখন ডালহৌসি অঞ্চলে। সেই দুর্গ রক্ষা অসম্ভব হয়ে উঠল। অধ্যক্ষ ড্রেক পালিয়ে গেলেন। সেনাপতি মীরজাফরসহ সিরাজ প্রবেশ করলেন দুর্গে। উমিচাঁদ ও কৃষ্ণবল্লভকে সিরাজ সম্মান দেখালেন, আশ্বাস দিলেন হলওয়েলকে। কিন্তু সেই রাত্রেই রচিত হল এক বিস্ময়কর কাহিনি যার স্রষ্টা হলওয়েল। কিন্তু এ কাহিনির কোনো উল্লেখ নেই মুতাক্ষরীণ-এ। কে জানে কেন এ কাহিনি প্রচার করেছিলেন হলওয়েল! হয়তো সিরাজের চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই এই কাহিনির কল্পনা। অনেক যুগ পর সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে এই হলওয়েল মনুমেন্ট যা 'অন্ধকূপ হত্যা'র ক্ষতের মতো দাঁড়িয়েছিল কলকাতার বুকে—তা ধ্বংস করেন দেশপ্রেমিকেরা। শুনেছি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবরও ছিলেন সেই স্বেচ্ছাসেবকদেরই একজন।

কলকাতা যুদ্ধে বিজয়ী সিরাজ ফিরলেন মুর্শিদাবাদে। ইংরেজদের সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করলেন। শঙ্কিত হলেন ইংরেজরা। মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় এলেন রবার্ট ক্লাইভ। মীরজাফর, জগৎশেঠ, উমিচাঁদ, নদিয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র এবং রানী ভবানীর দূত বসলেন গোপন মন্ত্রণাসভায়।

রানী ভবানী প্রথমদিকে সিরাজের বিরুদ্ধপক্ষ ছিলেন না। গল্পে আছে—বরানগরের বাগান থেকে তিনি আম পাঠাতেন সিরাজকে উপঢৌকন হিসেবে। নবাবও এসেছেন রানীর প্রাসাদে সৌজন্যসহ। কিন্তু এবার ঘটনার গতি ভিন্নখাতে বইছে। এবার সম্মুখ সমর।

সে এক রোমাঞ্চকর, ঘৃণার্হ, বিশ্বাসঘাতকতা আর দেশপ্রেমের অদৃষ্টপূর্ব ঘটনার সমাহার।

সিরাজ মাতামহ আলিবর্দির কোনো নির্দেশই মানেননি, শুধু তাঁর অন্তিম উপদেশ ছাড়া। সেই উপদেশে স্পষ্ট উল্লেখ ছিল—ইংরেজরাই দেশের শত্রু। তাঁর চরিত্রের সমস্ত স্খলন এই দেশরক্ষার চূড়ান্ত প্রচেষ্টার শুদ্ধতায় ক্ষমার্হ হয়ে পড়ে।

রণক্ষেত্র নির্বাচিত হল পলাশীর প্রান্তর।

হায় পলাশী! কত কবি, কত নাট্যকার, কত লৌকিক গানের রচয়িতা এই পলাশীর প্রান্তরে ভারতের স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হবার বর্ণনাকে রঞ্জিত করে তুলেছেন!

—না, সে পলাশীর প্রান্তর আজ আর নেই। সে আজ মুর্শিদাবাদ জেলাতেও নয়। শুনেছি, সেই আম্রকাননের শেষ গাছটি আছে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে। ১৭৫৭-তে সেই প্রান্তর ছিল লক্ষাবাগ নামে পরিচিত। দৈর্ঘ্যে ১৬ শত ও প্রস্থে ৬ শত হাত ছিল এই প্রান্তরের বিস্তার। ছিল নবাবের এক মৃগয়া গৃহ। ২২ জুন ব্রিটিশ সৈন্য রাত একটায় পৌঁছল পলাশী প্রান্তরে রবার্ট ক্লাইভের নেতৃত্বে।

সিরাজ আম্রকাননের সম্মুখে শিবির স্থাপন করলেন। পরিখার মধ্যস্থলে মীরমদন ও মোহনলাল সৈন্য স্থাপন করেছিলেন। তার ডানদিকে ফরাসি সেনাপতি সিনফ্রে চারটি কামান ও সামান্য সংখ্যক গোলন্দাজ বাহিনী নিয়ে প্রস্তুত হলেন। পলাশী গ্রাম পর্যন্ত অর্ধচক্রাকারে দুর্লভরাম, ইয়ার-লুৎফ এবং মীরজাফর সৈন্যসজ্জা করলেন। নবাব ৩৫ হাজার পদাতিক, ১৫ হাজার অশ্বারোহী এবং ৪০টি কামান নিয়ে প্রতীক্ষা করছিলেন যুদ্ধক্ষণের। আমি মনশ্চক্ষে দেখি সেই দেশময় এক যুদ্ধ যুদ্ধ খেলার ছবি।

২৩ জুন সকালে ফরাসি সৈন্যদের কামান গর্জে উঠল প্রথমে। ইংরেজ সৈন্য বিপুল সংখ্যক নবাবসৈন্য দেখে হতাশ হলেন। ভরসা একমাত্র মীরজাফর। কিন্তু ক্রমাগত গোলার আঘাতে ক্লাইভের সৈন্যদল সে ভরসা লাভে সন্তুষ্ট থাকতে পারল না। ক্লাইভ চিন্তিত হলেন। তবে কি মীরজাফর সত্যিই জন্ম-বিশ্বাসঘাতক! আশ্বাস দিলেন আমির বেগ—ধৈর্য ধরুন, এরা সব মীরমদন, মোহনলালের দল। মীরজাফর শপথ রক্ষা করছেন। 'যুদ্ধে অস্ত্রধারণও করব না, ইংরেজ পক্ষেও যাব না'—এ শপথ তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করছেন। বেলা ১১টায় নিরাশ ক্লাইভ বুঝতে পারলেন পরাজয় নিশ্চিত। রাতে আক্রমণ ছাড়া উপায় নেই। অপরাহ্নে নামল প্রবল বৃষ্টি। সে তো বৃষ্টি নয় যেন ভারত ভাগ্যবিধাতার কান্না! নবাবপক্ষের বারুদ ভিজে গেল। ইংরেজরা কৌশলে নিজেদের বারুদ অগ্নিগর্ভেই রাখল।

ভুল করলেন মীরমদন। জানতেন না ইংরেজদের এই কৌশলের কথা। যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হলেন তিনি। স্তম্ভিত, হতবাক বিভ্রান্ত সিরাজ ডেকে পাঠালেন মীরজাফরকে। কথিত আছে, নিজের মুকুট তার পায়ের কাছে রেখে বলেছিলেন—'আমি এখন পূর্ব কৃতকার্যের জন্য অনুতাপ করছি। আমি আপনার কাছে আত্মসমর্পণ করলাম। আমার সম্মান ও জীবন রক্ষা করুন।'

মীরজাফর বধির। মীরজাফর বিশ্বাসঘাতকতায় অন্ধ। বললেন—'আজ দিন শেষ হয়ে এসেছে, কাল যুদ্ধ হবে।' ভীতচকিত সিরাজ বললেন—'যদি রাত্রে ওরা অক্রমণ করে?' মীরজাফর বললেন—'সে ব্যবস্থা আমি করব।'

—হ্যাঁ, ব্যবস্থা করলেন তিনি। তৎক্ষণাৎ শিবিরে ফিরে ক্লাইভকে লিখলেন নবাব শিবির আক্রমণের জন্য। মোহনলাল অসীম বিক্রমে যুদ্ধ করছিলেন। সিরাজের হঠাৎ যুদ্ধ বন্ধের নির্দেশে হতচকিত হলেন। কিন্তু নিরস্ত্র হলেন না। প্রাণপণ লড়াই চালিয়ে গেলেন এবং পলাশীর মাটিকে রঞ্জিত করলেন নিজের বুকের স্বদেশ প্রেমের রক্তে। নবাবসৈন্য

ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে এবার রবার্ট যুধজয় সহজ করে তুললেন। সিরাজ হাতির পিঠে চড়ে রওনা হয়ে সকালবেলা পৌছলেন মুর্শিদাবাদে। যুধের প্রহসন শেষ। ইংরেজ পক্ষের ২০ জন সৈন্য হত ও কয়েকজন আহত হলেন।

এর পরের ইতিহাস শুধু অশ্রুজলের কাহিনি। রাজধানীতে সে সম্মান নেই। সহযোগী একমাত্র বেগম লুৎফুন্নিসা। গভীর রাতে মনসুরগঞ্জের হীরাঝিল প্রাসাদ ত্যাগ করলেন। রাজমহলের দিকে অগ্রসর হবেন ভেবে ভগবানগোলায় গিয়ে নৌকোয় উঠলেন। মীরজাফর মুর্শিদাবাদে এসে দখল করলেন হীরাঝিলের প্রাসাদ, বাংলার মসনদ। এই সেই মসনদ এক সময় পূর্বতন রাজধানী ঢাকা থেকে এখানে এনেছিলেন মুর্শিদকুলি খাঁ। না, এ সিংহাসন মণি-মুক্তা-জহরত খচিত নয়। সম্পূর্ণ পাথরে তৈরি ছিল এই মসনদ। বড়ো কালো রঙের পাথর কেটে একটা গোল টেবিল (৬ ফুট ব্যাসের) এবং দেড় ফুট উঁচু চারটি পায়া একসঙ্গে করা হয় আশ্চর্য কৌশলে। টেবিলের ধারে বড়ো বড়ো ছিদ্র। দণ্ডের সাহায্যে মাথার ওপর চাঁদোয়া টাঙানোর জন্য। এই কালো পাথরের সিংহাসনে মূল্যবান সিল্ক বা মসলিনের আচ্ছাদন পেতে দেওয়া হত। তার ওপর থাকত সোনা-রুপোর কাজ করা ঝালর দেওয়া তাকিয়া। ১৬৩৯-এ শাহ সুজা যখন রাজধানী রাজমহলে তখনোই পারস্যের ভাস্কর খোজা নজরকে দিয়ে এটি তৈরি করান। মসনদের প্রান্তভাগে ফার্সি লিপিতে এই সিংহাসন তৈরির বিবরণ লেখা আছে। রাজমহল থেকে পরবর্তী রাজধানী ঢাকায় এটি নিয়ে যাওয়া হয়। এই তখত-ই-মুবারক ঢাকা থেকে আসে মুর্শিদাবাদে। মুর্শিদাবাদ পতনের পর এই সিংহাসনে একদিন বসেন পুতুল নবাব ও ইংরেজ প্রতিনিধি। জাত যায় মসনদের। ১৯০২-তে বসেন লর্ড কার্জন। পরে এটি স্থানান্তরিত হয় কলকাতায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে। লোকে বলে, অবহেলায় অপমানে স্বাধীনতা হারানোর শোকে এই সিংহাসন কাঁদে। বিশ্বাসের চোখ দেখে বিন্দু বিন্দু জল জমে যায় মসনদের গায়ে। হয়তো বা রাসায়নিক কোনো বিক্রিয়াতেই এটা ঘটে। কিন্তু কল্পনাপ্রবণ মন অন্য কথা ভেবে সান্ত্বনা পেতে চায় যেন। কে জানে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের নিভৃতে নীরবে আজও হয়তো অশ্রুপাত করে স্বাধীন নবাবদের গৌরববাহী এই মসনদ। এই মসনদে বসতে লজ্জাই পেয়েছিলেন মীরজাফর। লর্ড ক্লাইভ হাত ধরে তাঁকে এনে বসালেন মসনদে। সোনার মোহর দিলেন উপহার হিসেবে। সেই রবার্ট ক্লাইভ যুধের ছয় দিন পর যিনি মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করে বলেছিলেন—'মুর্শিদাবাদের রাজপথে সেদিন যে লোক সমবেত হয়েছিল তারা ইচ্ছে করলেই সেই সামান্য ইংরেজদেরকে লাঠি ও ঢিলের আঘাতেই সংহার করতে পারত।'

—না, তাঁরা তা করেননি। মীরজাফর নবাব হয়ে ঘোষণা করেছেন—সকলেই নিরাপদ, শুধু সিরাজদৌল্লাকে ধরিয়ে দিতে হবে।

ধরা পড়লেন সিরাজ। মালদহের কাছে বাহারালে দানশা ফকিরের কুটিরে এসেছিলেন ক্ষুধাকাতর বেগমের জন্য খিচুড়ীর ব্যবস্থা করতে। দানশা অনেককাল আগে সিরাজের কাছে অপমানিত হয়েছিলেন, তার প্রতিশোধ নিলেন। মীরকাশিম মীরজাফরের নির্দেশে সিরাজকে অনুসন্ধান করতে এসে অকস্মাৎ পেয়ে গেলেন তাঁদের। ধরা পড়ার পর বেগমের বহুমূল্য জহরতের বাক্স তিনি হস্তগত করলেন। যার মূল্য কয়েক লক্ষ টাকা। প্রাণভিক্ষায় কাতর সিরাজ। নবাব সিরাজদৌল্লা ধৃত নির্যাতিত দীনবেশে প্রবেশ করলেন মুর্শিদাবাদে।

হীরাঝিলে সুখের ঘুমে তখন মগ্ন ছিলেন মীরজাফর। কিন্তু তাঁর নিষ্ঠুর পুত্র মীরণ সিরাজকে বন্দী করলেন হীরাঝিলেরই প্রাসাদে। এগিয়ে এলেন মহম্মদী বেগ। সিরাজ শেষবারের মতো অনুনয় করলেন, দেশের নিভৃত কোণে তাঁকে থাকতে দেওয়া হোক। নির্মম আঘাত নেমে এল রাজমুকুটে। 'হোসেন কুলির প্রতিশোধ সম্পূর্ণ হল'—এই শেষ কথা বলে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে।

আমি শিউরে উঠি খোশবাগে দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্যের কল্পনায়। হাতির পিঠে চড়িয়ে সিরাজের খণ্ড খণ্ড দেহ মুর্শিদাবাদের পথে পথে ঘোরানো হল। মুতাক্ষরীণ বলে—দু'ফোঁটা রক্ত নাকি লুটিয়ে পড়েছিল সেখানে, যেখানে একদিন হোসেন কুলিকে হত্যা করেছিলেন সিরাজ। উন্মত্তের মতো ছুটে এলেন আমিনা বেগম। লুটিয়ে পড়লেন আকুল কান্নায়। সমস্ত মুর্শিদাবাদ সেদিন সিরাজের জন্য চোখের জল ফেলেছিল। অবশেষে সিরাজের খণ্ডিত দেহ সমাধিস্থ হল খোশবাগে।

এই সেই সমাধি! কারো চোখের জলের রেখা আর নেই। শুনেছি, লুৎফুন্নিসা যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন এখানে স্বামীর কবরে আলো দিতেন। এখনো এখানে আলো নামে, অন্ধকারকে প্রকট করত সে আলো বিষণ্ণতার চেয়েও আরো গভীর। ওই তো পাশেই লুৎফুন্নিসার সমাধি।

আমি বিষাদে পথ হাঁটি। লালবাগ-জিয়াগঞ্জ পথের ধারে মীরজাফরের সমাধিক্ষেত্রে একবার দাঁড়াই। একটি বিশ্বাসঘাতকতার কিংবদন্তীর মানুষকে দেখে মুখ ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছে করে! মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে কোনো গৌরবেব ভূমিকাই তো তাঁর নেই। ক্লাইভের দেওয়া 'গর্দভ' নামেই উপহাসিত হতেন তিনি। ব্যক্তিত্ব নেই, শাসনকার্য পরিচালনার কোনো যোগ্যতা নেই, আছে নবাবদের চিরাচরিত কামাসক্তি। সেই উত্তরাধিকার বর্তেছিল পুত্র মীরণের ওপর এবং তারই প্রবল প্রকাশ ঘটেছিল একদিন, যেদিন সিরাজের বেগম লুৎফুন্নিসার দিকে হাত বাড়িয়েছিল মীরণ। মীরণের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে জবাব দিয়েছিলেন লুৎফা—যে সওয়ারী হাতিতে সওয়ার হয়েছে, সেকি কোনোদিন গর্দভের পিঠে সওয়ার হয়?

স্বভাবতই ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন মীরণ। আর তাই ঢাকায় পৌঁছে দেবার ছলনায় ঘসেটি আর আমিনা বেগমকে পদ্মার জলে ডুবিয়ে মেরেছিলেন। কিন্তু ইতিহাসের গতি বড়ো বিচিত্র। মীরণ খুন হলেন। কেউ কেউ বলেন, বজ্রাঘাতে মারা গিয়েছিলেন তিনি। হয়তো পিতার নিষ্ক্রিয়তার ক্ষোভে ফরাসি ওলন্দাজদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ইংরেজ ও বিশ্বাসঘাতক পিতার অকর্মণ্যতার পাপস্খলন করতে চেয়েছিলেন মীরণ। একদিন তাই তাঁর মৃতদেহ পাওয়া গেল নির্জন মাঠে। হয়তো এও এক ষড়যন্ত্রেরই পরিণাম। সবই হয়তো...

কিন্তু বণিকের মানদণ্ড তখন রাজদণ্ড হয়ে দেখা দিয়েছে। মীরজাফর সব সঙ্কট ভুলে থাকতে চাইলেন সুরায় আর নারীতে। প্রশাসনের ব্যর্থতায় ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন দেওয়ান নন্দকুমার। কিন্তু আর কিছুই বোধহয় করার নেই। ইতিহাস অন্যপথ নিয়েছে। এতকাল ইংরেজরা ইংলন্ড থেকে এনেছে টাকা, এবার জাহাজ বোঝাই পণ্য নিয়ে যাচ্ছে তাদের দেশে। ক্ষোভে-দুঃখে-হতাশায় এবং মীরণের মৃত্যুতে ভেঙে পড়লেন মীরজাফর। শোনা যায়, কুষ্ঠব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি। প্রাসাদের এক কোণে থাকতেন, আনমনে নিজের সঙ্গেই কথা বলতেন। একি কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা?

কে জানে? শুধু জানি, এরপর মীরকাশিম এসেছিলেন কর্ণধার হয়ে। সাময়িকভাবে রাজধানী সরিয়ে নিয়েছিলেন মুর্শিদাবাদ থেকে মুঙ্গেরে। ইংরেজদের ব্যবসায়ে ছল নষ্ট করার জন্য ফরমান জারি করলেন। আবার বিশ্বাসঘাতক হাত বাড়িয়ে দিলেন জগৎশেঠ ইংরেজদের দিকে। ইংরেজ পাটনা কুঠির অধ্যক্ষ মিঃ এলিসের নেতৃত্বে পাটনা দখল করল। মীরকাশিম সেনাপতি তকি খাঁকে নিয়ে বন্দী করলেন তাদের। কোম্পানি নবাবের বিরুধে যুধ ঘোষণা করলেন। জগৎশেঠদের দুই ভাই সহ রাজা রাজবল্লভকে মীরকাশিম নিয়ে এলেন মুঙ্গেরে। দুর্গবন্দী করলেন। ইংরেজ কলকাতা আর বর্ধমান থেকে সৈন্য আনল। কাটোয়ার রণক্ষেত্রে তকি খাঁ প্রাণ দিলেন। যথারীতি গোলন্দাজ সেনাপতি গুরগণ খাঁর বিশ্বাসঘাতকতায় পরাস্ত হলেন মীরকাশিম। গিরিয়ায় আবার যুধক্ষেত্র রচিত হল। এখানেও পরাজিত হলেন মীরকাশিম। মীরজফর অপদার্থ, ভীরু, দুর্বলহৃদয়। মীরজাফরকে আবার পুতুলের মতো সিংহাসনে বসালো ইংরেজ। মীরকাশিম আবার উধুয়ানালায় যুধ ঘোষণা করলেন। আবার পরাজয়। এবার বিশ্বাসঘাতক ছিলেন জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয়। ক্ষিপ্ত মীরকাশিম হাত-পা বেঁধে তাঁদের এবং রাজা রাজবল্লভকে মুঙ্গের দুর্গপ্রাকার থেকে নীচে ফেলে দিলেন। বিশ্বাসঘাতকদের পরিণাম রমণীয় নয়। কিন্তু মীরকাশিমও ভাগ্যাহত। অযোধ্যার নবাব আর দিল্লির বাদশা শাহ আলমের সহায়তায় আবার বক্সারে ইংরেজদের সঙ্গে যুধে পরাস্ত হলেন। অবশেষে একদিন রণক্লান্ত মীরকাশিম দিল্লির এক পান্থশালায় অনাহারে, অনিদ্রায় মারা গেলেন। স্বাধীনতার স্বপ্ন মিলিয়ে গেল দু'শো বছরের মতো।

এদিকে মীরজাফরও পরলোকে। নবাব এখন মণিবেগমের পুত্র নাজমুদ্দৌল্লা। মমতাহীন ইংরেজদের হাতের পুতুল। নাবালক নাজমুদ্দৌল্লা সুরায় ডুবে মারা গেলেন এক বছর পরেই। এবার তাঁর ভাই সাইফুদ্দৌল্লা। চার বছরের মেয়াদ। আর তাঁরই সময়ে ইংরেজ ২৮ লক্ষ টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী পেল দিল্লির বাদশার কাছ থেকে। রাজধানী সরে গেল চিরতরের মতো মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায়।

বিলুপ্ত হলো বাংলার আর এক রাজধানী মুর্শিদাবাদ। নবাব তখন মোবারকদ্দৌল্লা। নামমাত্র নবাব। তারপর বাবর আলি। এরপর আলিজা এবং শেষে ওয়ালাজা। একের পর এক নবাব এলেন আর গেলেন। আমীর ওমরাহরা মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করলেন। ইংরেজদের সহায়ক কান্তমুদী কাশিমবাজারে স্থাপন করলেন রাজবাড়ি। নশীপুরের রাজা হলেন দেবীসিংহ। রাজা পদবী পেলেন নবকিষণ, নবকৃষ্ণদেব প্রমুখ অনেকেই। নবাব হলেন হুমায়ুনজা।

তখন পতিতোধারিণী গঙ্গা গ্রাস করেছে হীরাঝিল, জগৎশেঠের কুঠি আর মীরজাফরের প্রাসাদ। এত অনাচার সে সইবে কেন? হুমায়ুনজা এবার তৈরি করলেন নতুন প্রাসাদ—হাজারদুয়ারী। ১৮২৪ থেকে ১৮৩৮ সালের মধ্যে।

এই সেই হাজারদুয়ারী, আমি এখন যার সামনে দাঁড়িয়ে। আধুনিক মুর্শিদাবাদের ঐতিহাসিক আকর্ষণ এই হাজারদুয়ারী এখন অসংখ্য মানুষের চোখকে বিস্ময়ে অভিভূত করে। কিন্তু কতজন জানেন এর ঐতিহাসিক মূল্য অন্তত প্রাচীনত্বের নিরিখে কিছুই নয়। তা হোক, তবুও এই সেই প্রাসাদ, যেখান থেকে একদিন শেষ হয়ে গেছে বাংলার নবাবী ঐতিহ্যের

ধারাবাহিকতা। হুমায়ুনজার পর এসেছিলেন ফেরাদুনজা। তিনি দশ লক্ষ টাকার বিনিময়ে ইংরেজকে বিক্রি করে দিয়েছিলেন নবাবী খেতাব

মুর্শিদাবাদ সত্যিই পরিণত হল বিলুপ্ত রাজধানীতে। সেইসঙ্গে কর্ণসুবর্ণ, বাণগড়, দেবীকোট, গৌড়, পাণ্ডুয়ার তালিকায় যুক্ত হল আর একটি নাম—মুর্শিদাবাদ।

কিন্তু হাজারদুয়ারীর সামনে দাঁড়ালে এখনো এর বিশালতা, বৈচিত্র্য আর নবাবী ঐশ্বর্যের আড়ম্বর দেখে মন অভিভূত হয়। এখানে আছে মার্শাল প্রমুখ শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের আসল কাজ—ছবি। আছে নবনির্মিত নবাবী সিংহাসন, আছে দুর্লভ ঐশ্বর্যে সাজানো ডাইনিং রুম আর বিলিয়র্ড রুম। কিন্তু যেন সবাই আজ অতীতের বেদনায় দীর্ণ, জীর্ণ। ওরা যেন জানে, সে গৌরবের দিন আর নেই। হাজারদুয়ারীর স্তরে স্তরে হাহাকারের মতো বাতাস ছটফট করে। আমি কান পেতে শুনতে পাই সিরাজের অন্তিম আর্তনাদ, শুনি মীরজাফরের শেষ অবস্থার চরমদৃশ্য, দেখি আলিবর্দির দূরদৃষ্টির গভীরতা আর সেই মুর্শিদকুলি খাঁর কঠোর শাসন আর বুদ্ধির ছায়া। কিন্তু এ শুধু অলস-মায়া!

প্রাসাদ সংলগ্ন ওই অস্ত্রাগারে এখন নীরব হয়ে আছে কামান। ওই সেই কামান যেটি পলাশীর প্রান্তরে ফেটে গিয়ে মৃত্যু ঘটিয়েছিল মীরমদনের। ওই তো সেই ভয়ঙ্কর অস্ত্র যার আঘাতে লুটিয়ে পড়েছিলেন সিরাজ। কে জানে এসব সত্য কিনা! কিন্তু সারি সারি স্তম্ভিত তীর, বর্শা, বন্দুক, কামান দেখে মন ফিরে যায় অতীতে—যখন এসব ভয়ানক অস্ত্রের ঝনঝনায় মুখর ছিল মুর্শিদাবাদ। সুপ্রাচীন গুপ্তযুগ থেকে যে মুর্শিদাবাদ বারংবার ইতিহাসের অধ্যায় রচনা করেছে, আমি জানি না আবার কোনোদিন সে হৃতগৌরব ফিরে পাবে কিনা! এই জেলায় ওই সাগরদিঘি থানায় বিভিন্ন স্থান থেকে পাওয়া গেছে গুপ্ত ও পালযুগের বহু নিদর্শন। নবগ্রামে রয়েছে কিরিটেশ্বরী দেবীর মন্দির। এ এক তীর্থক্ষেত্র। এখানে পড়েছিল দেবীর মুকুট। ওই সাগরদিঘির গায়শাবাদে আছে পাঠানযুগের নিদর্শন। সৈয়দাবাদে আছে আর্মেনিয়াদের গির্জা। বেলডাঙার নিভৃতে চিরশয্যায় শায়িত আছেন মীরমদন। জায়গাটি বাংলার ঢপ-কীর্তনের প্রবর্তক রূপঠাকুরের স্মৃতিভূমি।

সবই আছে, কিন্তু ঘুমিয়ে। যেন গভীর এক বেদনার আঘাতে মূক হয়ে আছে। আমি বিষণ্ণ পায়ে ফিরে আসি। কলকাতায় ফিরতে হবে আমাকে। সেই কলকাতায়, মুর্শিদাবাদ থেকে যেখানে স্থানান্তরিত হয়েছিল বাংলার রাজধানী। এরপর আমি ফিরব কর্মক্ষেত্র বাঁকুড়ায়। সেখানে আছে আর এক বিলুপ্ত রাজধানী বিষ্ণুপুর। মুসলমানযুগের বাংলায় একমাত্র হিন্দু অধ্যুষিত রাজ্য। কিন্তু সে অন্য ইতিহাস।

আমি মুর্শিদাবাদ ছেড়ে আসি।
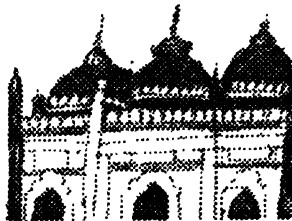
হে আমার মা আনন্দময়ী বাঙ্গালার সন্তানগণ, আজ
গঙ্গা-পদ্মা-করতোয়া-মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র-নদ বারি বিধৌত
সেই প্রাচীন গৌড়বঙ্গের অতীত সমৃদ্ধির স্বপ্নময়
পুরীতে মা আমাদের ডাকিয়াছেন, তাই আজ
আমরা মা'র কথা কহিবার জন্য এখানে মিলিত হইয়াছি।

—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

বহু যুগের ওপার থেকে ভেসে আসছে শুধু অস্পষ্ট স্মৃতির ইথার তরঙ্গ, আজ থেকে এক হাজার বছর পর বিলুপ্ত রাজধানী কলকাতার বুকে অতীত ইতিহাসের পরশমণি খুঁজে ফিরছেন এক পর্যটক। বিশাল ভূখণ্ড জুড়ে ছড়ানো রয়েছে অজস্র টুকরো ইট আর লোহার কঙ্কাল, শিরশ্ছেদের লজ্জা নিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে একদা উন্নতশীর্ষ মিনারের ভগ্নাবশেষ। স্তূপীকৃত পাথর আর সিমেন্ট চুনবালির গভীরে আত্মগোপন করে আছে বড়ো বড়ো প্রাসাদ আর স্মৃতিসৌধ। কোথাও কোথাও বিশাল গহ্বরের অন্ধকারে শরীর এলিয়ে নিশ্চল হয়ে পড়ে আছে বিশালাকায় সরীসৃপের মতো ভূগর্ভস্থ রেলপথ। ঘন অরণ্যে ঢেকে গেছে একদা প্রাণচঞ্চল জনপদের পথ-প্রান্তর। দূষিত বিষাক্ত আবহাওয়ায় আকীর্ণ হয়ে আছে সভ্যতায় সমৃদ্ধ অন্যতম মহানগরীর আকাশ-বাতাস। পলি জমে জমে শুকিয়ে গেছে পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গার নির্মল জলধারা, খাত পরিবর্তন করেছে সেই নদী।

বাংলার ইতিহাসে বার বার নদীমাতৃক এ দেশের রাজধানী যেভাবে সরে গেছে স্থান থেকে স্থানান্তরে—এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি—রাজধানী সরে গেছে দূরে হয়ত হলদিয়ায় হয়ত রাজারহাটে নয়ত অন্যত্র কোথাও। সব অতীত গৌরবচিহ্ন ধূলায় ধূলায় ধূসর হয়ে মুখ লুকিয়েছে মাটির গভীরে ধ্বংসস্তূপে। পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ মহানগরী কলকাতার গৌরবদীপ্ত কোনো ঐতিহাসিক প্রত্নচিহ্নই আর তেমন করে খুঁজে পাচ্ছেন না পর্যটক!

না, এ শুধু অলস মায়া—নিছকই দূর প্রসারী এক অবৈজ্ঞানিক কল্পনার অতিরঞ্জন। যে ঘটনা অবিরত ঘটেছে আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের আগে, আজ আর তার পুনরাবৃত্তি সহজে ঘটবে না, যদি না ওই বিজ্ঞানের অভিশাপে কোনো পারমাণবিক যুদ্ধে ধ্বংস হয়ে যায় সভ্যতা! নিছক গতিপথ পরিবর্তনে আজ আর অবলুপ্তির সমস্যা বিচলিত করবে না কোনো মহানগরীর অস্তিত্বকে; প্রয়োজনীয় মুহূর্তে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির সাহায্যে আসন্ন অপমৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানো যাবে নদী এবং নগরীকে। আর যদিও বা তা না ঘটে তবু টেপ রেকর্ডার, চলচ্চিত্র,

অসংখ্য গ্রন্থ এবং উপগ্রহ থেকে পাঠানো ছবিতেই উদ্ধৃত থাকবে লুপ্ত নগরীর হুবহু ইতিহাস—পর্যটককে ক্ষ্যাপার মতো খুঁজে ফিরতে হবে না ইতিহাসের পরশপাথর।

অথচ ঠিক এই কারণেই যথোচিত গুরুত্ব সহকারে ইতিহাসকে পুঁথিপত্রের স্মৃতিচারণে ধরে না রাখার ফলে এবং বিজ্ঞানসম্মত ভাবে সংরক্ষণের অভাবে হারিয়ে গেছে বাংলার সমৃদ্ধ রাজধানী আর জনপদগুলোর অস্তিত্ব। বড়ো বিস্ময় লাগে একথা ভাবতে যে, ঠিক এইভাবেই হারিয়ে গেছে বাংলার প্রাচীনতম সমৃদ্ধ নগরী—তাম্রলিপ্ত, পুণ্ড্রবর্ধন, পুষ্করণা, গৌড়, প্রিয়ঙ্গু, সমতট, হরিকেল, মহীপাল, চম্পা, মদনাবতী, হরিনারায়ণপুর, কর্ণসুবর্ণ, বাণগড়, নুদীয়া, বিজয়পুর, দেবীকোট, পাণ্ডুয়া, রাজমহল, দণ্ডভুক্তি, গঙ্গে, রামাবতী, টাণ্ডা, সপ্তগ্রাম, সমতট, ঢাকা, বিক্রমপুর, মুঙ্গের, সোনারগাঁ, সিংহপুর, বর্ধমান। কোনো কোনোটির অস্তিত্ব একেবারেই লুপ্ত, কোনো কোনোটি আজ ছোটো একটি গ্রাম হয়ে কোনোমতে নিজের অস্তিত্ব বাজিয়ে রেখেছে, আবার কোনোটি বা কেবলমাত্র নামটি বুকে নিয়ে অন্যত্র সরে গিয়েছে স্বতন্ত্র চেহারায়, স্বতন্ত্র রূপে। কোনো কোনোটি একসময় প্রসিদ্ধ ছিল বিকল্প রাজধানী হিসেবে, ঘটনার ঘনঘটায় আজ সেগুলি জেলা শহরমাত্র।

এই শতাব্দীর পর্যটক আমি, পথ হাঁটি আর বড়ো বেদনার মতো বাজে এই ঐতিহাসিক সত্যের নির্মমতা আর মন ব্যথিত হয়, শঙ্কিত হয় এই ভেবে যে, আত্মবিস্মৃত এই জাতি যদি এখনো নিজের দেশের ইতিহাসকে যথোচিত গুরুত্ব দিয়ে সংরক্ষণ না করে তবে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কোন্ ঐতিহ্য থেকে সংগ্রহ করবে আগামী দিনের পাথেয়?

পুষ্করণা/পোখন্না/পাখন্না

দাঁড়াও পথিকবর
জন্ম যদি তব বঙ্গে
তিষ্ঠ ক্ষণকাল...
—মাইকেল মধুসূদন

বাঁকুড়ার উত্তর-পশ্চিমে শহর থেকে পাঁচ মাইল দূরে সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো উঁচু নীচু প্রান্তরের ভেতর হঠাৎ ভেসে ওঠা একটি শুশুকের পিঠের মতো যে পাহাড়টি চোখে পড়ে তারই নাম শুশুনিয়া। কেন এর নাম শুশুনিয়া কে জানে! কেউ বলেন, 'শুষনি' নামের এক ধরনের জলজ উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যসূচক এই নাম শুষনিয়া। আবার কেউ বলেন ঐ শুশুকের রূপেরই এক প্রতিচ্ছায়ার নাম শুশুনিয়া। তা সে যাই হোক, পর্যটকের দৃষ্টির বিস্ময় এইখানে এসে থমকে দাঁড়াবেই। মনে হবে কোনো জলজ উদ্ভিদ বা শুশুক নয়, বয়সের ভারে স্থবির এক বিশাল ঐরাবত যেন হাঁটু মুড়ে বসে আছে। ক্লান্ত, অবসন্ন। কিন্তু এইসব কাব্যের মায়া সরিয়ে ফেললে পর্যটকের সেই থমকে দাঁড়ানো দৃষ্টি এবার বিস্ময়ে চমকে উঠবে যে সত্যই ১৪,৪১২ ফুট উঁচু ও পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় ২ মাইল বিস্তৃত এ পাহাড়ের প্রাচীনত্বের কোনো সঠিক হিসেব নেই। অনেক বয়স হলো শুশুনিয়ার। সেই বয়সের গাছ নেই, পাথর আছে। প্রাগৈতিহাসিক পাথুরে হাতিযার, সিংহের চোয়ালের জীবাশ্ম, অস্ত্র নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছে এই পাহাড়টির প্রবীণতা, আর সেই সচকিত দৃষ্টির বিস্ময়। এরপর আর একটি দৃশ্যের অভিঘাতে মুগ্ধতায় মগ্ন হবে যখন চোখে পড়বে ঐ পাহাড়েরই কোণে এক গুহায় লেখা আছে দুটি শিলালিপি। এ জাতীয় শিলালিপি আর একটি আছে বাংলাদেশের মহাস্থানগড়ে।

ভাষা বাংলা নয়। সংস্কৃত এবং গুপ্তলিপির পূর্বাঞ্চলীয় হরফে। প্রথম লিপিটিতে আছে :

'চক্রাস্বামিনং দাসাগ্রেনাতিসৃষ্ট। পুষ্করণাধিপতে মহারাজ শ্রীসিংহবর্মনস্য পুত্র মহারাজ শ্রীচন্দ্রবর্মণ দৃতি।' আর দ্বিতীয় লিপিটিতে 'চক্রাস্বামিনো ধেসোগ্রামোত্রিসৃষ্ট।'

এ সবের অর্থ আজ আর অস্পষ্ট নয়। প্রথম লিপির বাংলা ভাষায় রূপান্তর হলো এই রকম—চক্রাধারী দেবতার প্রধান সেবক, পুষ্করণার অধিপতি শ্রীসিংহবর্মনের পুত্র শ্রীচন্দ্রবর্মণ বিশেষ কোনো কীর্তি উৎসর্গ করলেন। আর দ্বিতীয় লিপির অর্থ হলো—ধোসোগ্রাম নামক পল্লী চক্রাস্বামীকে উৎসর্গ করা হলো।

পর্যটকের ভাবনা এবার আলোড়িত হবে, কে এই পুষ্করণাধিপতি শ্রীচন্দ্রবর্মণ? কোথায় সেই পুষ্করণা? কতদিন আগে সেখানে ছিল সমৃদ্ধ জনপদ? শ্রীচন্দ্রবর্মনের সেই বিশেষ

কীর্তির কথা কেনই বা লেখা হয়েছিল প্রাগৈতিহাসিক শুশুনিয়ার গুহাগাত্রে। প্রাগৈতিহাসিক শুশুনিয়া নিথর স্তব্ধতা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। শুধু মাঝে মাঝে দু'এক টুকরো কৌতুকের কণার মতো আধুনিক মানুষের হাতে তুলে দেয় আদি প্রস্তর, নব্যপ্রস্তর ও শেষ প্রত্নাশ্মরকালের বিভিন্ন আয়ুধ, সিংহের চোয়াল। বিস্ময় বাড়ে। চতুর্থ শতকের ব্রাহ্মীলিপিতে লেখা গুহালেখার ইঙ্গিত মনে রেখে এরপর নেমে আসতে হয় উৎসুক পায়ে আর পুষ্করণার সন্ধানে কৌতূহলী মন গিয়ে দাঁড়ায় দামোদর নদের তীরবর্তী বড়জোড়া অঞ্চলের প্রাচীন বর্ধিষ্ণু গ্রাম পাখন্নায়।

পাখন্না, পোখন্না না পোখরণা? কোন্‌টি সঠিক নাম, সে নিয়ে গবেষণা অনাবশ্যক। শুধু একথা নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করা চলে গ্রামের পশ্চিম অংশে যে বড়ো দিঘি, পোখর বা পুষ্কর আছে তার থেকেই এই গ্রামের নাম পুরষ্করণা যা আজ লোকমুখে পাখন্না, পোখন্না বা পোখরণায় রূপান্তরিত হয়েছে।

বাঁকুড়া-দুর্গাপুর সড়কে বড়জোড়ার মাইল দুই দক্ষিণে হাট আসুরিয়ার মোড় থেকে উত্তর-পূর্বে ছয় মাইল গেলে পোখন্না গ্রাম।

আমি এ রাস্তা দিয়ে আসিনি। বিলুপ্ত রাজধানী পরিক্রমার পথ যেখানে এসে সাময়িকভাবে থেমেছিল, সেই বিষ্ণুপুর থেকেই এবার আমি রওনা হয়েছিলাম বাসে পোখন্নার দিকে। পৌঁছেছি ভর দুপুরে। রাঢ়ের গলানো রোদের বানে ডুবে গেছে গ্রামের ঘরবাড়ি। ছায়াচ্ছন্ন দ্বীপের মতো গাছতলায় দু'একটি চায়ের দোকান অভ্যাসবশত খোলা আছে, দোকানি নিজেও ঘর্মাক্ত শরীরে তন্দ্রাচ্ছন্ন।

আমার উপস্থিতির শব্দ কানে যেতেই নিত্যন্ত অনিচ্ছায় উঠে বসে বললেন, কি চাই?

তৎক্ষণাৎ বললাম—চা।

একটা হাই তুলে বললেন—বসুন।

কিন্তু বসে চা খেতে তো আসিনি। অতএব প্রশ্নের টুকরো ছুঁড়ে সময় ভরাতে হবে। বললাম—

—এটা খুব প্রাচীন গ্রাম না? দোকানি সন্দিগ্ধ চোখে ঘাড় ফিরিয়ে বললে :

—হ্যাঁ।

—এখানে কোন্ রাজার রাজধানী ছিল?

দোকানি গম্ভীর গলায় বললে : চন্দ্রবর্মার।

আমি বিস্ময়ে নড়ে উঠলাম। বাস্তবিক, এই আর একবার স্থানীয় মানুষের ইতিহাস প্রীতির পরিচয় পেয়ে আমি যেন দোকানির প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে উঠলাম।

ভাবতে ভালো লাগছে চতুর্থ শতকের রাজা চন্দ্রবর্মণ এই শতাব্দীর এক সাধারণ মানুষের মনে এখনো যে তার স্মৃতির আধিপত্য বিস্তার করে রয়েছেন, সে শুধু তাঁর রাজকীয় বৈভবের প্রভাবে নয়, নিতান্তই স্থানীয় এক গৌরবের স্রষ্টা হিসেবে।

কত বয়স হবে এই গ্রামের? রৌদ্রাপ্লুত পোখন্নার স্তব্ধতার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে পড়ে ১৯২৭ সালে আর্কিয়োলজিক্যাল সার্ভের বার্ষিক রিপোর্টে শ্রী কে এন. দীক্ষিত লিখেছিলেন—

'শুশুনিয়ার উত্তর পূর্বে ২৫ মাইলেরও কম দূরে, দামোদর নদের দক্ষিণ তীরে পোখরণ নামে এক প্রাচীন গ্রাম আছে। এখনো এটি রীতিমত বড়ো গ্রাম। গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে 'রাজগড়' নামে খুব বড়ো এক ঢিবি আছে, তার সর্বত্র ভাঙা ইট, মাটির বাসনকোসনের টুকরো ও অন্যান্য পুরাবস্তু ছড়ানো।... মনে হয় শুশুনিয়া লিপিতে উল্লেখিত সিংহবর্মনের পুত্র চন্দ্রবর্মনের রাজধানী পুষ্করণা আর এ স্থান অভিন্ন, যার ইতিহাস সম্ভবত গুপ্তযুগের সূচনা অবধি প্রসারিত। দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গে প্রাচীন রাঢ় অঞ্চলের সবটা জুড়েই এ রাজাদের রাজত্ব বিস্তৃত ছিল।'

আধুনিক পুষ্করণার নির্জনতা গাঢ়তর করে দূরে কোথায় ঘুঘুর ক্লান্ত বিষণ্ণ ডাক ভেসে ওঠে, অলস মন্থর শব্দ ওঠে চায়ের গেলাসে চামচ নাড়ার। আমার মনে পড়ে, শুধু দক্ষিণ-পশ্চিম নয়, শোনা যায় পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল চন্দ্রবর্মনের রাজ্যের সীমা। আর আশুতোষ মিউজিয়াম ও বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে যে খননকার্য হয় তার ফলে যে প্রত্নবস্তু পাওয়া গেছে, সেই ছাপমারা মুদ্রা, ছাঁচে ফেলা তামার মুদ্রা, পোড়ামাটির তৈজসপত্র, টেরাকোটা মূর্তি—নিশ্চিত ঘোষণা করেছে পোখন্নার আদিবসতি মৌর্যযুগ কিংবা তার চেয়েও প্রাচীন।

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এ জায়গা থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন পোড়ামাটির যক্ষিণীমূর্তি যা মৌর্য বা শুঙ্গ যুগের প্রমাণ বহন করছে!

—চা নিন।

অতীত থেকে এক মুহূর্তে আমাকে টেনে তুলতে চায়ের গেলাসসহ হাত বাড়িয়ে দেন দোকানি। এক পলকের মতোই আমার দৃষ্টি-বিভ্রম ঘটে। মনে হয় বহুযুগের ওপার থেকে কেউ একজন আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন সেই কালের দিকে পা বাড়ানোর জন্য। মুহূর্ত পরই আমি সচেতন হয়ে উঠি।

দ্রুত চা খেয়ে এবার পা বাড়াই পোখন্নার অতীতের স্মৃতি-চিহ্নের সন্ধানে।

দেড় হাজার বছর আগের রাজধানী এই সেই পুষ্করণার রাজপথ যা আধুনিক সভ্যতার নিচে ঢাকা পড়ে আছে, ইতিহাস পথের পাশে ধূলায় ধূসর হয়ে আছে।

মনে পড়ছে, এই পোখন্নারই পার্শ্ববর্তী গ্রামের নাম হাট-আসুড়িয়া, বন আসুড়িয়া, অসুর গেড়্যা। বোধহয় আর্যগণের ভারত আগমনের পূর্বে ভারতের পূর্বখণ্ডে যে অসুর সভ্যতা বিদ্যমান ছিল তার প্রভাব এখানেও ছিল, যা চন্দ্রবর্মার সভ্যতার চেয়েও প্রাচীন।

কিন্তু সুপ্রাচীন সেই অসুর সভ্যতার বয়স কত? সেও কি প্রাগৈতিহাসিক শুশুনিয়ার মতো এখনো বুকে ধরে রেখেছে কোন প্রত্নস্মৃতির স্মারক চিহ্ন? নাকি পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীনতম শিলালিপির মতো (অবিভক্ত বাংলার প্রাচীনতম লিপি আছে বগুড়া জেলার পাহাড়পুর মহাস্থানগড়ে) এক ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের স্মৃতিকেই অক্ষয় করে রেখেছে—যে ব্যক্তিত্বের নাম চন্দ্রবর্মণ।

ইতিহাস এক বিচিত্র রহস্যময় ঘটনার কথা বিক্ষিপ্তভাবে বলে চন্দ্রবর্মণ সম্বন্ধে। দিল্লির কুতুব-মিনারের কাছে মেহেরৌলি লৌহস্তম্ভের লিপিতে উৎকীর্ণ রয়েছে, বঙ্গ জনপদসমূহে চন্দ্র নামে যে এক রাজা ছিলেন। বেদেষু বাহব-বর্ত্তিনো-ভিলিখিতা-খড়্গো—কীর্ত্তিভূজো। ইনিই কি সিংহবর্মার পুত্র পুষ্করণাধিপতি চন্দ্রবর্মা? নাকি ইনি এলাহাবাদ লিপি কথিত

এবং গুপ্ত সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের দ্বারা পরাজিত রাজা চন্দ্রবর্মা! কে জানে চন্দ্রবর্মার আসল পরিচয় কোন্‌টি।

পোখন্নার বাতাস শুধু কতকগুলো স্মৃতির ভগ্নাংশ কৌতূহলী পর্যটকের চোখের সামনে মেলে ধরে নীরব হয়ে আছে। ঐ তো রক্ষাকালীতলার নিমগাছের নিচে যে মূর্তিগুলো গাছের নিচে একালের মানুষের নিত্যপূজা পেয়ে আসছে তা প্রমাণ করছে এগুলো পাল যুগের শিল্প-রীতির পরিচয়জ্ঞাপক এক একটি নিদর্শন। স্থানীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে এমন সব কত মূর্তি।

ওই সেই দামোদর নদ, বন্যার জলে প্রতি বছর যা পোখন্নার কিছু অংশ আচ্ছন্ন করে ফেলে, আবার জল সরে গেলে মানুষের কৌতূহলের মাত্রা বাড়িয়ে দেবার জন্য রেখে দিয়ে যায় পোড়োমাটির অসংখ্য ফলক। বড়ো বড়ো কুয়োর চিহ্ন, বৃহদাকার বাণিজ্য-তরীর ভগ্নাংশ, সন্দেহ থাকে না কোনো, এই দামোদর বেয়েই একদা দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের পুষ্করণার বাণিজ্য হতো সুদুর পূর্ববঙ্গ পর্যন্ত। আর এক নরপতি নাগদত্ত-র রাজধানী উজানি মঙ্গলকোট অঞ্চলের একটি ছড়ার কথা মনে পড়ে পোখন্নার প্রান্তবর্তী দামোদরের তীরে দাঁড়িয়ে।

'চার মাস বর্ষা, পোখরণা যায়
পোখরণা গিয়ে দেখি দুয়ারে মরাই
ছোট মরাই এ পা দিয়ে
বড় মরাই এ পা দিয়ে
রাই হেটে এসো ঝলমলিয়ে ॥'

কে জানে কারা ওই ছড়ার রচয়িতা! তবে অনুমান করা চলে, এ হ'ল বণিকদের বাণিজ্যযাত্রার শেষে পরবাসীর ঘরে ফিরে আসারই আকাঙ্ক্ষার বাণীরূপ। কিন্তু সেই দূরগামী দামোদরের সমৃদ্ধিও আজ নেই। ফিরে আসি পায়ে পায়ে। রাজা চন্দ্রবর্মণকে বলা হয়েছে লিপির ভাষায় চক্রস্বামী। তবে কি তিনি বিষ্ণুর উপাসক? কিন্তু শুশুনিয়া সেই লিপির উপরে আঁকা চক্রের চাবিদিকে চৌদ্দটি অগ্নিশিখা এবং কেন্দ্রে একটি বিশাল অগ্নিশিখার নক্‌শা প্রমাণ করে না যে এটি বিষ্ণুচক্র। অনেকে বলেন, এটি বৌধ্ব বা জৈনধর্মের প্রতীক। তাহলে কি বৌধ্বধর্মেরই প্রভাব ছিল এ অঞ্চলে? আবার কেউ কেউ বলেন, বাঁকুড়ায় টুসু প্রদীপের নক্‌শার উৎসও এই চক্রটি যা বর্ষ গণনার একটি প্রতীক রূপও। সঠিক উত্তর মেলে না। স্বয়ং চন্দ্রবর্মণকে নিয়েই তো ঐতিহাসিকদের মধ্যে সিধান্তের নিশ্চয়তা নেই। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে মান্দাসোরের এক লিপিতে (মালাব্দ ৪৬১) উল্লিখিত সিংহবর্মার পুত্রই চন্দ্রবর্মা। এই অভিমত আরো বলে যে, শুশুনিয়ার খোদিত পুষ্করণা নাম এবং রাজপুতানার অন্তর্গত যোধপুর রাজ্যের পোখরণ জনপদ একই স্থান।

রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর এক মন্তব্যে বলেন যে, দামোদরের তীরের পোখন্নাই প্রাচীন পুষ্করণা। তাঁর মতে মহারাজাধিরাজ সমাচার দেবের ঘাগরাহাটি তাম্রপট্টে ফরিদপুরের কোটালিপাড়া দুর্গকে চন্দ্রকোট দুর্গ বলা হয়। মহারাজ চন্দ্রবর্মণই এর নির্মাতা।

আবার কেউ কেউ অনুমান করেন, চন্দ্রবর্মার মূল রাজধানী ছিল রাজপুতনার যোধপুর রাজ্যের পোখরণ। বঙ্গের সম্মিলিত দলকে পরাজিত করে (মেহেরৌলি লিপি অনুযায়ী)

শুশুনিয়া পাহাড়ের গায়ে সেই কীর্তির কথা খোদিত করেন এবং দামোদরের তীরে দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করেন।

যে প্রাচীন পথ বাঁকুড়া মুঙ্গেরগামী প্রাচীন পথের সঙ্গে উত্তর রাঢ় থেকে কলিঙ্গগামী কাঁকসা-সোনামুখী-বিষ্ণুপুর রাজপথকে যুক্ত করেছে—পোখন্না তারই ওপর অবস্থিত, এই পথটি ছান্দার পরিমণ্ডলের উত্তরে।

এখন একান্ত কৌতূহলী পুঁথিকেন্দ্রিক ঐতিহাসিক বা সরকারী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কর্মীগণ ছাড়া নিছক ঐতিহ্য বিলাসী পর্যটক কেউ আর আসে না পোখন্নায়। গ্রামের মানুষ আজও দর্শনার্থীকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন, সযত্নে অক্লেশে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেবেন তাঁদের গ্রামের প্রাচীন ইতিহাসের স্মারক চিহ্নগুলো। গ্রামের হেদুয়া পুকুর থেকে উধার করা শিলনোড়া, মুদ্রা, নদীতীর থেকে পাওয়া অসংখ্য প্রত্নবস্তু তাঁরা দেখাবেন। সম্প্রতি ঐ গ্রামেরই এক অনুসন্ধানী গ্রাম-পরিচয় মূলক বই লিখেছেন যা নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক কারণে মূল্যবান। পোখন্নার বুকে দাঁড়িয়ে মনে হবে, আমি শুধু আজকের মানুষ নই, আমার ধমনীতে প্রবাহিত বহু বহু যুগের সংস্কৃতি সভ্যতার এক ধারা—যা ভুলে যাওয়া আত্মবিস্মৃতিরই নামান্তর। মনে পড়বে, একদা শিশুনাগবংশীয় সম্রাটদের রাজধানী ছিল বলে হয়ত দূরের ঐ পাহাড়ের নাম হয়েছিল 'শিশুনাগিয়া' যার থেকে শুশুনিয়া বা শুষনি শাকের নাম থেকে, যে শাক তন্দ্রাকর্ষণ করে মহাতন্দ্রায় আছে বলে যার নাম শুশুনিয়া—এমন অনেক কথাই। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে বেশ কয়েকবার উৎখনন হয়েছে পোখন্নায়। সংগৃহীত হয়েছে অনেক প্রত্নবস্তু। কিন্তু সেসবই প্রায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহে রয়ে গেছে। মাটির গভীর থেকে উঠে এসেছে বহু যুগ আগের জনবসতির স্মারক চিহ্ন। কিন্তু এই পোখন্নাই যে চন্দ্রবর্মার পুষ্করণা এমন কোনো নিশ্চিত প্রমাণ আজও পাওয়া যায়নি।

পোখন্না থেকে হেঁটে আসুড়িয়া হয়ে ফিরে আবার বাসে উঠি। দূরে অস্পষ্ট নীল ছায়ার মতো চোখে পড়ে স্তব্ধ বিষণ্ন শুশুনিয়ার শীর্ষ দেশ। মনে হয়, বহু যুগের থেকে যেন আজও চেয়ে আছে সে প্রাচীন পুষ্করণার দিকে।
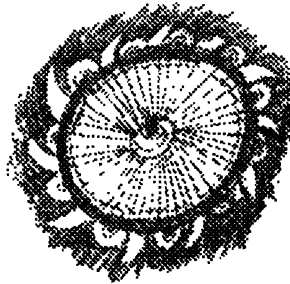
বনবিষ্ণুপুর/মল্লভূম/বিষ্ণুপুর

ছবির মতোন গ্রাম
স্বপনের মতো শহর
যত পারো গড়ো
আমাদের সীমা হল
দক্ষিণে সুন্দরবন উত্তরে টেরাই।
—প্রেমেন্দ্র মিত্র

আমি বিষ্ণুপুরের মাটিকে স্পর্শ করলাম।

এই সেই জনস্থান, যেখানে হারানো অতীত আর ঘটমান বর্তমান একই সঙ্গে হাত ধরাধরি করে চলেছে।

ওই তো গড় দরজা যা তৈরি হয়েছিল সপ্তদশ শতাব্দীতে। আর এই সেই গড় প্রাচীর যা প্রহরীর মতো রক্ষা করত বিষ্ণুপরের দুর্গকে। আর ওই তো সেই রাজপ্রাসাদের ভগ্নাংশ যার ভেতর থেকে এক কঠোর নির্দেশের ইঙ্গিত পেয়ে এই গড় দরজা পেরিয়ে ছুটে গিয়েছিল অশ্বারোহী সৈনিকেরা, লুণ্ঠন করে এনেছিল এক অমূল্য রত্ন, যে রত্নের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল বিষ্ণুপুরের ইতিহাস। কিন্তু সে তো অনেক পরে!

গড় দরজার সম্মুখে দাঁড়িয়ে মনে হয় বহুযুগ আগের এক বিচিত্র ইতিকথার সম্ভার নিয়ে গড় প্রাচীর পেরিয়ে ছুটোছুটি করছে হাওয়া, ওই লালজীর মন্দির, ওই জোড়বাংলা যেন তারই স্পর্শ পাবার জন্য স্তব্ধ হয়ে আছে! দূর প্রান্তর থেকে ভেসে আসে আত্মমগ্ন ঘুঘুর ডাক, বিষণ্ণ মূর্ছনা ছড়ায় প্রাসাদের ভগ্নাবশেষের চারধারে, অতীতের বিষ্ণুপুর আমার কল্পনার চোখে ছায়া ফেলে।

আমি সম্মুখের পথ ধরে চলে যাই সুদূর অতীতে। চমৎকার দুটো গল্পের কথা আমার মনে পড়ে।

প্রথমটি হল—বহুদিন আগে বৃন্দাবনের কাছে জয়নগরের এক রাজা তাঁর সন্তান-সম্ভবা রানিকে নিয়ে পুরী যাচ্ছিলেন এই বনপথ দিয়ে। পথে রানি সন্তান প্রসব করেন। রাজা তাঁদের সেখানেই রেখে চলে যান। কিছুদিন পর এক আদিবাসী অরণ্যের মধ্যে শিশুটিকে পায়। তাকে মানুষ করতে থাকে। নাম দেয় রঘুনাথ। একবার স্থানীয় আদিবাসী রাজার মৃত্যুর পর ছেলেটিকে নিয়ে শ্রাদ্ধবাসরে গেলে রাজার হাতি তাকে শুঁড় দিয়ে তুলে সিংহাসনে বসিয়ে দেয়। সকলেই তখন তাকেই রাজা হিসেবে মেনে নেয়।

অনেকে বলেন—এই রাজা বাগদি ও মাল জাতীয়দের বলে 'মাল' থেকে 'মল্ল' কথাটি এসেছে। মল্ল রাজবংশের কুল পরিচিতি নিয়ে নানা মত আছে। রমেশচন্দ্র দত্তের মতে, রাজারা 'সিংহ' উপাধি গ্রহণের আগে নিজেদের আর্যেতর মল্ল বলতেন। ক্ষত্রিয় গুণাবলীর জন্য সিংহ উপাধি পান। কলকাতার গভর্নর হলওয়েল বলেন, গোপাল সিংহ রাজপুত ব্রাহ্মণ ছিলেন। ১৬২২-এ দ্বিতীয় রঘুনাথ মল্ল 'সিংহ' উপাধি নেন। হান্টার জানান, গোপাল সিংহ মল্ল রাজবংশের একটি ইতিহাস লেখেন। তাতে পঞ্চান্ন জন রাজার নাম ছিল, যাঁদের মধ্যে আদিমল্ল, জয়মল্ল, কিনুমল্ল, খড়্গামল্ল, শূরমল্ল, জগৎমল্ল, রামমল্ল, ধাড়ীমল্ল, বীর হাম্বির, প্রথম রঘুনাথ সিংহ, বীরসিংহ, দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহ, দুর্জন সিংহ, গোপাল সিংহের নাম উল্লেখযোগ্য। পাল সম্রাট কৈবর্তনায়ক ভীমের হাত থেকে রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য বিভিন্ন রাজার সাহায্য চান। সহযোগিতা করেন বিষ্ণুপুররাজও।

এ গল্পটি আছে হান্টার সাহেবের 'অ্যানালস অব্ রুরাল বেঙ্গল'-এ। আর দ্বিতীয় গল্পটি আছে রাজপরিবারে রাখা এক পুঁথির পাতায়।

সে গল্পে আছে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের শেষভাগে উত্তর ভারতের কোনো এক ক্ষত্রিয় রাজা সস্ত্রীক পুরী যাবার পথে কোতলপুরের কাছে লাউগ্রামে তাঁর আসন্ন প্রসবা স্ত্রীকে পঞ্চানন নামে এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে রেখে যান। সেখানে রানির ছেলে হয়। সেই ছেলে রাখাল বালকের কাজ করতে থাকে বড়ো হয়ে। একদিন পঞ্চানন অবাক হয়ে দেখেন একটি বিষধর সাপ ঘুমিয়ে পড়া সেই রাখাল ছেলের মাথার ওপর যেন রাজছত্র মেলে ধরেছে। তিনি বুঝলেন এর রাজলক্ষ্মণ আছে। তাকে মল্লযুদ্ধ শেখালেন এবং মাত্র পনেরো বছর বয়সে স্থানীয় পদুমপুরের আদিবাসী রাজা তাকে আদিমল্ল উপাধি দিলেন। শুরু হল মল্লবংশ। এরপর লাউগ্রামের রাজা আদিমল্লর হাতে তুলে দিলেন রাজ্যপাট। প্রায় তেত্রিশ বছর লাউগ্রামে রাজত্ব করেন আদিমল্ল। এরপর এলেন জয়মল্ল বা জগৎমল্ল।

আর সেই সময়েই পটপরিবর্তন হল বিষ্ণুপুরের ইতিহাসে। রাজধানী সরে এল লাউগ্রাম থেকে বিষ্ণুপুরে। কিন্তু কেমন করে এল?

এখন এখানে এই যে রাজবাড়ি, এই যে মৃন্ময়ী প্রাঙ্গণ, এখানে এক সময় ছিল গভীর অরণ্য। সেই অরণ্যে শিকার করতে এসেছিলেন মল্লরাজ জগৎমল্ল। সঙ্গে ছিল এক বাজপাখি। শিকারের সন্ধানে ক্লান্ত রাজা বিশ্রাম করছিলেন এক কেলি-কদম্ব গাছের ছায়ায়। হঠাৎ দেখেন ওই গাছের ওপর বসে আছে একটি বক। রাজা বাজপাখিটিকে ছেড়ে দেন শিকার ধরার জন্য। কিন্তু খুবই অবাক হন তিনি। দেখেন ওই পাখিটিই তাড়া করেছে তাঁর শিকারী বাজপাখিটিকে। অনুমান করেন তিনি, হয়তো বা কোনো অলৌকিক শক্তির পীঠস্থান হবে এই জায়গাটি। প্রত্যাদেশ শুনলেন রাজা, দেবী মহামায়া আদ্যাশক্তি বলছেন—এখানেই তিনি আছেন, তাঁর পুজোর আয়োজন করা হোক আর রাজধানীও প্রতিষ্ঠা হোক এখানেই।

সেই শুরু হল বিষ্ণুপুরের ইতিহাস। প্রতিষ্ঠিত হল রাজধানী। মাটির নীচ থেকে দেবীমূর্তি বের করে মন্দির নির্মাণ করলেন জগৎমল্ল। প্রতিষ্ঠিত হল মল্লভূম। বহু যুগের বহু ঘটনার কথা নীরব হয়ে আছে এই মল্লভূমের মাটিতেও! সেই কিংবদন্তীর আদিমল্ল-র পর ঐতিহাসিক মল্লবংশের শুরু প্রথম বীরমল্ল থেকে। ইতিহাস বলে তিনিই এই বনবিষ্ণুপুর রাজধানীর প্রতিষ্ঠাতা।

এর পরের রাজা ধাড়ী মল্ল। তাঁরই ছেলে বীর হাম্বির, যাঁর আমলে বিষ্ণুপুরের ইতিহাসে ঘটে যায় এক চমকপ্রদ ঘটনা, যে ঘটনার ঘনঘটায় সম্পূর্ণ পালাবদল ঘটে যায় বিষ্ণুপুরের ইতিহাসে—বাংলার সংস্কৃতিতে যুক্ত হয় এক নতুন অধ্যায়।

এই সেই রাসমঞ্চ। এটি নির্মাণ করেছিলেন বীর হাম্বির ষোড়শ শতকের শেষভাগে বা সপ্তদশ শতকের প্রথম দিকে। এখানে কার্তিক পৌর্ণমাসীতে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা উৎসব উৎযাপন করতেন বিষ্ণুপুরের রাজারা। স্থাপিত হত ১০৮টি কৃষ্ণবিগ্রহ। শুরু হত যাত্রাভিনয়। সেও রাসলীলাকে ঘিরে।

কিন্তু যে রাজারা ছিলেন ক্ষত্রিয়, মল্ল উপাধির পাশাপাশি ব্যবহার করতেন সিংহ উপাধি—তাঁরা এমন পরমবৈষ্ণব হলেন কি করে?

ইতিহাস আর কিংবদন্তী দ্বৈতকণ্ঠে শোনায় এক আশ্চর্য কাহিনি।

একদিন দরবারে বসেছিলেন বীর হাম্বির। খবর পেয়েছিলেন তিনি এক দুর্লভ রত্ন বোঝাই পেটিকা পার হয়ে যাবে এই বিষ্ণুপুর রাজ্যেরই কোনো পথ ধরে। রাজমহিমার সবই তাঁর ছিল, ছিল একটি অভাবের বেদনাও। সে হল রত্নের অভাব। আর তাই সংবাদ পাওয়ামাত্র ওই গড় দরজা পেরিয়ে তাঁর নির্দেশে ছুটে গিয়েছিল সৈনিকেরা একটি গো-শকটকে লক্ষ্য করে।

কিন্তু হতাশই হয়েছিলেন তাঁরা। রত্নপেটিকা আছে কিন্তু কোনো প্রহরী তো নেই। শুধু কয়েকজন দীনবেশী নিরীহ মানুষ চলেছেন ধীর গতিতে। তবু সেই পেটিকা নিয়ে এলেন তাঁরা। কে জানে কোন্ রত্ন লুকোনো আছে এতে!

পরদিন রাজভবন দ্বারে এলেন এক ভক্ত বৈষ্ণব। মনে হল নিদ্রাহীন রাত্রি কাটিয়েছেন তিনি। তখন রাজদরবারে ভাগবত পাঠ হচ্ছে। কিন্তু ভক্ত বৈষ্ণবের তা ভালো লাগল না। তিনি বিনীতভাবে জানালেন, নিজে তা পাঠ করবেন। করলেনও। আর তখনই সচকিত বীর হাম্বির জিজ্ঞাসা করলেন :

—আপনি কে?

—আমি শ্রীনিবাস আচার্য।

—এখানে এসেছেন কেন?

—এসেছি, আমাদের এক পরম সম্পদ লুণ্ঠিত হয়ে গেছে তারই খোঁজে।

এবার বীর হাম্বির চমকে ওঠেন। বলেন :

—কি সেই সম্পদ?

—একটি পুঁথি। রত্নাধিক এই পুঁথির নাম শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। আমরা তা নিয়ে যাচ্ছি বৃন্দাবনধাম থেকে নবদ্বীপধামে। গতকাল তা লুণ্ঠিত হয়েছে। আমার দু'জন সঙ্গীও গেছে তার সন্ধানে। আমিও সারারাত খুঁজেছি।

বীর হাম্বির বিস্মিত হন। তারপর সেই পেটিকা খুলে পুঁথি বের করা হয়। সেটাই পাঠ করেন শ্রীনিবাস আচার্য।

এই পরমরত্নের সন্ধান পেয়ে সব রত্নের তৃষ্ণা ভুলে শ্রীনিবাসের কাছে বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষা নেন বীর হাম্বির। শুরু হয় বিষ্ণুপুরের নতুন অধ্যায়। রাসমঞ্চে বেজে ওঠে রাসলীলার ছন্দ। পিরামিডের আকৃতির অপূর্ব গঠন-কৌশল আনন্দিত হয় দেশজ সুরের স্পন্দনে।

আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে এ সময়। মোঘল সেনাপতি মানসিংহের মাধ্যমে মোগল দরবারে স্বীকৃতি পায় বিষ্ণুপুর। ঘটনাটি ঘটে ১৫৯০-তে। মানসিংহ বিহার প্রদেশের বিদ্রোহীদের দমন করে উড়িষ্যা জয়ের জন্য মাঝপথে জাহানাবাদ-এ (এখন আরামবাগ) শিবির স্থাপন করলেন। কুৎলু খাঁ নিজ সেনাপতি বাহাদুর কুরুকে পাঠালেন মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহকে পরাস্ত করতে। জগৎসিংহ মদ্যপানে প্রমত্ত হয়ে যুদ্ধে পরাস্ত হলেন। আকবরনামা জানায়, গড় বিষ্ণুপুরের জমিদার হাম্বির জগৎসিংহকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে উদ্ধার করে রাজধানী বিষ্ণুপুরে নিয়ে আসেন। এর ফলে মানসিংহ খুশি হয়ে বীর হাম্বিরের সঙ্গে মোঘল দরবারের যোগাযোগ করিয়ে দেন। বিষ্ণুপুর দুর্গনগরী হিসেবে গড়ে ওঠে।

এরপর এলেন রঘুনাথ মল্ল বা রঘুনাথ সিংহ। তিনি একে একে গড়ে তুললেন ওই কালাচাঁদ মন্দির।

চারচালা ঘরের মতো নীচু চালের ওপর ওড়িশি ধাচের বড়ো চূড়া, ঝামা পাথরে তৈরি। একে বলে একরত্ন মন্দির। এমন একরত্ন মন্দির এখানে আরো ছ'টি আছে। সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত আজও এদের সৌন্দর্যের বন্দনা গায়।

ওই তো সেই শ্যামরায় মন্দির। নীচু চারচালার ওপর পাঁচটি চূড়া বসানো পঞ্চরত্ন মন্দির। ইটের তৈরি। অপূর্ব টেরাকোটার সূক্ষ্ম কাজে অলংকৃত মন্দিরটি সেই সজ্জিত রত্নপেটিকার কথা মনে করিয়ে দেয়। গর্ভগৃহ ও দক্ষিণ দেওয়ালে রাসমণ্ডল, পূর্ব দেওয়ালে রামায়ণ, উত্তর দেওয়ালে যোধামূর্তি আর আছে রাধাকৃষ্ণের মূর্তির সারি।

আর ওই সেই কৃষ্ণরায় মন্দির, জোড়বাংলা নামে যা আজ সবার কাছে পরিচিত। দুটো বাংলাঘর পাশাপাশি জুড়ে মাঝখানে একটা চারচালা চূড়া বসিয়ে এক চমৎকার শিল্পরূপময় স্থাপত্যে গড়া হয়েছে মন্দিরটি।

আর আছে এর সর্বাঙ্গ জুড়ে অসামান্য টেরাকোটার কাজ। মহাভারত থেকে শুরু করে সেকালের শিকারোৎসব, রণতরী আর জীবনযাত্রার এক নীরব মিছিল যেন চলেছে কালস্রোত পেরিয়ে। বিষ্ণুপুরের যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি সাহিত্য পরিষদ (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ)-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা গবেষক চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্তের মতে ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ —এই সময়ে বিষ্ণুপুরে যে সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটে তা প্রধানত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের ফলেই সম্ভব হয়। প্রচুর সংখ্যক মন্দির নির্মিত হয় এ সময়, যেগুলি আকার, আয়তন ও নির্মাণ-চাতুর্যে অনুপম। বিষ্ণুপুর দুর্গের অভ্যন্তরে মন্দিরের প্রাচুর্য দেখে প্রখ্যাত গবেষক বিনয় ঘোষ লিখেছিলেন, 'দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করলে প্রথমেই মনে হয় যেন বাংলার দেবালয়ের ঐতিহাসিক যাদুঘরে এলাম। দুর্গটি যেন দেবালয় সংরক্ষণের জন্যই তৈরি হয়েছিল।.... দেবালয় স্থাপত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাস দুর্গের ভেতরেই রচিত হয়ে আছে, নির্মাণকালের দিক থেকে নয় গড়নের দিক থেকে। যিনি বিষ্ণুপুরের দেবালয় দেখেননি, তিনি বাঙালি হয়েও বাংলার শিল্পকলার অমরাবতী দর্শন থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।' সন্দেহ নেই, বিষ্ণুপুরের মাটি স্পর্শ করলেই মন্দির নগরীর শোভার অসামান্য সমারোহ পর্যটকের কল্পনাকে অভিভূত করে।

মন্দির নির্মাণে শিখর মন্দিরের ওপরেই মল্লরাজের পক্ষপাতিত্ব ছিল। চালাঘরের আদলে তৈরি ছাদের ওপর এক বা একাধিক চূড়া বসিয়ে রত্নমন্দির নির্মাণেও শিখর মন্দিরের প্রভাব স্পষ্ট। মৎস্যপুরাণের অনুমোদন রয়েছে এই স্থাপত্যকর্মে।

বৈষ্ণবধর্ম বিষ্ণুপুরে প্রবেশের আগে পাল-সেন যুগের প্রভাব যে ছিল তার প্রমাণ ভগবান বিষ্ণুর অনন্তশায়ী মূর্তি যার আধিক্য এখানে লক্ষ করা যায়। বিষ্ণুপুর সংলগ্ন বাসুদেবপুর গ্রামে কষ্টিপাথরে তৈরি বিষ্ণু-বাসুদেব মূর্তিও এর প্রমাণ।

শ্রীনিবাস আচার্য-র কাছ থেকে মল্লরাজা ভাগবত পাঠ শুনছেন— এমন একটি টেরাকোটার নিদর্শন মদনমোহন মন্দিরের প্রবেশদ্বারের কাছে আছে যা নিশ্চিতভাবে মল্লরাজাদের বৈষ্ণবধর্মানুযায়ী মন্দির নির্মাণের ইতিহাস-লগ্নের নির্ভুল প্রমাণ। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের কৃষ্ণলীলার বিবিধ রূপ—শ্যামরায়, জোড়বাংলা, মদনমোহন মন্দিরে উৎকীর্ণ আছে এই কারণেই।

শুধু কৃষ্ণলীলাই নয়, বৈচিত্র্যেও মন্দির টেরাকোটাগুলোর রূপময় অস্তিত্ব পর্যটকের দৃষ্টি এড়ায় না। চোখে পড়ে টেরাকোটা নির্মাণের অভিনবত্বও। পার্শ্বগত ভঙ্গিতে বেসরিলিফে নির্মিত টেরাকোটাগুলোতে যেন চিত্রকর্মের আভাস। রাজস্থানী চিত্রকলার রূপবিভঙ্গও যেন ছায়া ফেলেছে টেরাকোটাগুলোতে। মন্দিরে ওড়িশার প্রভাবও লক্ষণীয়। শিল্পী রামকিঙ্করের লেখায় পড়েছি, উনি যখন এইসব টেরাকোটার ছবি আঁকতেন তখন লক্ষ করেছেন, যামিনী রায়ও এখানে স্কেচ করতে আসতেন। বস্তুত যামিনী রায়ের ছবিতেও টেরাকোটার শিল্পরীতিরও আভাস আছে একথা শিল্প রসিকরাও বলেন।

বিনয় ঘোষ 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি'তে সঠিক সিদ্ধান্তেও গেছেন, 'গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে বীর হাম্বিরের এই দীক্ষাগ্রহণ শুধু মল্লভূমের নয়, বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে সেদিন যুগান্তর এনেছিল।'

এই সেই বিষ্ণুপুর শুধু মন্দির বৈচিত্র্যে নয়, সংগীত আর শিল্পচর্চাতেও যা এক সময় বঙ্গ সমাজকে প্রাণিত করেছে। নব্যন্যায় এবং নব্যস্মৃতির চর্চাও হত এখানে। ছিল অসংখ্য টোল আর চতুষ্পাঠী। লেখা হয়েছে হাজার হাজার পুঁথি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সংগ্রহশালা সেইসব অমূল্য পুঁথি সযত্নে রক্ষা করে চলেছে।

এই সেই বিষ্ণুপুর, বঙ্গের স্বাধীন বাঙালি রাজাদের মধ্যে যাঁরা নিঃসন্দেহে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছিলেন। শুধু শৌর্য নয়, সাংস্কৃতিক সৌকর্যের আধার ছিলেন তাঁরা। পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়রে মতে, 'সংগীতের সাধনায় বিষ্ণুপুর দিল্লি ঘরানার গৌরবস্পর্শী হইয়া উঠিয়াছিল।'

একথা অনস্বীকার্য যে, মার্গসংগীতে গৌড়ীয়-রীতির একটি বিশেষ অবদান ছিল দীর্ঘদিন থেকেই। গৌড়সারং গৌড়মল্লার রাগ তার নিদর্শন। কিন্তু পরবর্তীকালে আর দু'টি বিশেষ ঘরানার উল্লেখ সংগীতগুণীদের আলোচনায় প্রাধান্য পায়। একটি মুর্শিদাবাদ ঘরানা, অপরটি বিষ্ণুপুর ঘরানা। প্রথমটির অস্তিত্বের নিদর্শন আজ দুর্লভ, কিন্তু বিষ্ণুপুর ঘরানা আজও সপ্রাণ। বিষ্ণুপুরের রাজা চৈতন্য সিংহের সভাগায়ক ছিলেন রামশঙ্কর ভট্টাচার্য। সে সময় রাজসভায় বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসতেন সংগীত শিল্পীরা। শ্রুতিধর রামশঙ্কর, সভায় আগত বিভিন্ন শিল্পীর গান আত্মস্থ করতেন। একাধিক ঘরানায় গান আয়ত্ত করে সৃষ্টি করেন নতুন এক গায়ন-রীতি। ধ্রুপদ গানেই তার পূর্ণ বিকাশ ঘটে। সেই বিশেষ রীতি চিহ্নিত হয় 'বিষ্ণুপুর ঘরানা' নামে। পরবর্তীকালে যদুভট্ট, অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, রামকেশব ভট্টাচার্য প্রমুখের গায়নে সারা ভারতে এই ঘরানার পরিচয় ছড়িয়ে পড়ে। এঁদের মধ্যে

যদুনাথ ভট্টাচার্য বা যদুভট্ট-র নামই সবচেয়ে বেশি উচ্চারিত তার কারণ রবীন্দ্রনাথ কৈশোরে এঁর গান শুনেছেন, শিখেছেন, রচনা করেছেন তাঁর অনুসরণে 'ভাঙাগান' এবং সর্বোৎকৃষ্ট প্রতিভাবান গায়ক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন যদুভট্টকে।

বিষ্ণুপুরের বাতাসে আজও মর্মরিত হয় ধ্রুপদের এই বিশেষ সুর-মূর্চ্ছনা! এখনো বহু গুণীজন প্রতিষ্ঠানগত এবং ব্যক্তিগত চর্চায় ধরে রেখেছেন বাংলা সংগীতের এই বিশেষ ঘরানাকে। শুনেছি পশ্চিমবঙ্গ সরকারও উদ্যোগ নিয়েছেন এই ঘরানার সংরক্ষণে।

বিষ্ণুপুরের ইতিহাসের পথে পথে ঘুরি। একের পর এক এসেছেন মল্লরাজারা। এক একটি কীর্তির নিদর্শন স্থাপন করে দীর্ঘ ঐতিহ্যের ধারাকে বহমান রাখার প্রচেষ্টা করেছেন।

রঘুনাথ সিংহের পর এলেন বীরসিংহ তৃতীয়। যে রঘুনাথ সিংহ নিজের বলদীপ্ত হাতে একাই একটি ঘোড়াকে বশ করে নবাব দরবার থেকে সিংহ উপাধি পান, তাঁর পরবর্তী রাজা বীরসিংহ কিন্তু শুধু শৌর্যে নয়—প্রজাবাৎসল্যেও স্মরণীয় হয়ে আছেন আজও। তিনিই বিষ্ণুপুরকে উপহার দিয়েছিলেন তৃষ্মাহর সাতটি সায়র বা বাঁধ।

ওই তো সেই বীরবাঁধ—যা আজ পোকাবাঁধ নামে পরিচিত। ওই সেই কৃষ্ণবাঁধ, যমুনাবাঁধ, গাঁতাইতবাঁধ, শ্যামবাঁধ, কালিন্দীবাঁধ আর লালবাঁধ।

লালবাঁধ আমার স্মৃতিকে আলোড়িত করে রেখেছে। ওই লালবাঁধের ঢেউয়ের গভীরে লুকোনো আছে এক মর্মন্তুদ ঘটনার কথা।

কিন্তু সে গল্প বলার আগে এই বীরবাঁধেরই পাড়ে দাঁড়িয়ে মনে পড়ে প্রজাবৎসল এই বীরসিংহও নিষ্ঠুরতায় এক দুঃসহ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি নাকি তাঁর আঠারোটি সন্তানকে হত্যা করেছিলেন। আর তাই হয়তো ওই গুমঘরকে ঘিরে তৈরি হয়েছে এক ভয়ানক স্মৃতির গল্প। ওখানে নাকি অপরাধীদের নিক্ষেপ করে শাস্তি দেওয়া হত। কে জানে এ গল্প সত্যি কি না! অথবা ওখান থেকে জল সরবরাহ হত সারা শহরে তাই বা কে জানে! নাকি ওখানে ছিল শস্যভাণ্ডার? ইতিহাস নীরব হয়ে গেছে। কথা বলে শুধু কিংবদন্তী আর নীরব মন্দিরগুলো। ওই সেই লালজীর মন্দির, যা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বীরসিংহেরই মহিষী চূড়ামণি বা শিরোমণি দেবী। এই মন্দিরেই একমাত্র রঙিন ফ্রেসকোর কিছু আভাস মেলে। রাজমহিষীদের তৈরি আর একটি মন্দিরের কথা এই লালজিউ মন্দির প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে মনে পড়ে।

সে হল ১ম রঘুনাথ সিংহের মহিষীর তৈরি রাধামাধব মন্দিরের আটচালার আদলে গড়া মন্দিরটিতে বড়ো বড়ো মূর্তির ফলক ও নকশি অলংকার শোভাময় হয়ে আছে।

বীর সিংহের পরে এলেন দুর্জন সিংহ। হ্যাঁ, ইনিই বীর সিংহের পুত্র, একমাত্র যিনি পিতার নিষ্ঠুরতার হাত এড়াতে পেরেছিলেন। তিনি তৈরি করেছিলেন ওই মদনমোহন মন্দির, বিষ্ণুপুরের নগরদেবতা যেখানে পূজিত হতেন।

কিন্তু হায়! এই দেবতা পরবর্তীকালে চৈতন্য সিংহের আমলে নিতান্ত অর্থের প্রয়োজনে বাঁধা পড়েছিলেন কলকাতার বাগবাজারের গোকুল মিত্রের কাছে। সেই দেবতা ফিরে আসেননি অপরূপ মন্দিরের অপরূপ টেরাকোটার টানে। কিন্তু সে গল্প এখন থাক। আমি যেন এবার স্পষ্ট শুনি লালবাঁধের জলকল্লোল মুখরিত এক বিচিত্র কাহিনি—যে কাহিনির নায়ক ২য় রঘুনাথ সিংহ, দুর্জন সিংহের পুত্র। আর নায়িকা?

আমি জানি না, সে কাহিনির নায়িকা লালবাঈ না রাজমহিষী চন্দ্রপ্রভা!

দুর্গপ্রাসাদে বসেই সেদিন শুনেছিলেন রানি চন্দ্রপ্রভা, দুর্দান্ত শোভা সিংহের তরবারির আঘাতে পরাজিত ও নিহত হয়েছেন বর্ধমানরাজ রামকৃষ্ণ। রাজপুত্র জগৎরাম পালিয়ে গেছেন নারীবেশে। আর শোভা সিংহকেই হুগলির যুদ্ধে পরাস্ত করে ফিরে এসেছেন রঘুনাথ মল্ল। যুদ্ধযাত্রার আগে জিজ্ঞাসা করেছিলেন রাজা রঘুনাথ :

—তোমার জন্য কি আনব রানি?

মৃৎপাত্র হাতে তুলে দিয়ে বলেছিলেন রানি চন্দ্রপ্রভা : গঙ্গার জল নিয়ে এসো আমার জন্য।

ফিরে এসেছেন রঘুনাথ। গঙ্গার জল এনেছেন কিনা জানেন না চন্দ্রপ্রভা। কিন্তু দেখেছেন পালকিতে এসেছে এক নর্তকী। নর্তকী লালবাঈ যার আকর্ষণ এড়িয়ে অন্দরমহলে আসার সময়ই পাননি রঘুনাথ সিংহ। শুধু তাই নয় মদনমোহনের পূজাও বন্ধ হতে চলেছে। ধর্মান্তরিত হবার জন্যও নাকি প্রস্তুত হচ্ছেন রঘুনাথ সিংহ।

—না, আর চুপ করে থাকেননি চন্দ্রপ্রভা।

তাঁরই নির্দেশে সৈনিকের দল টুকরো টুকরো করে কেটে ওই লালবাঁধের জলে ভাসিয়ে দেয় লালবাঈকে আর ওই গড় প্রাসাদ থেকে তির মেরে হত্যা করা হয় রঘুনাথ সিংহকে। কিন্তু গল্পের এখানেই শেষ নয়। শেষে মৃত স্বামীর চিতায় আত্মাহুতি দেন চন্দ্রপ্রভা। এই নিয়ে ভিন্ন আর একটি কাহিনিও অবশ্য আছে।

—না, লালবাঁধের জলে আর বাজে না নৃত্যগীত বা মর্মান্তিক আর্তনাদের বিলাপ। প্রায় ধ্বংস হয়ে আসছে সেই গড় প্রাসাদও। অথচ সংগীতরসিক ওই রঘুনাথ সিংহের আমল থেকেই শুরু হয়েছে বিষ্ণুপুর ঘরানায় গান, যা বাংলার এবং সংগীত-সংস্কৃতির এক বিশিষ্ট নাম। কিন্তু ওই যে ধ্বংসম্মুখ রাজপ্রাসাদ তার সূচনা বুঝি রঘুনাথ সিংহের পর রাজা গোপাল সিং-এর আমল থেকে। পরম বৈষ্ণব ছিলেন গোপাল সিংহ। আদেশ করেছিলেন প্রতি সন্ধ্যায় সকল মল্লভূমবাসীকেই নির্দিষ্ট সংখ্যায় হরিনাম করতে হবে। এই প্রথাই পরে 'গোপাল সিংহ-এর ব্যাগার' নামে চালু হয়।

তখন বর্গী এল দেশে।

গল্প জানায়, বর্গীর আক্রমণে ভীত বিষ্ণুপুরবাসীকে মহারাজ গোপাল সিংহ নাকি আদেশ দিয়েছিলেন, সকলে দুর্গপ্রাকারে প্রবেশ করে নগর রক্ষার জন্য মদনমোহনের কাছে প্রার্থনা জানাতে।

আর তারপরেই ঘটে যায় অত্যাশ্চর্য ঘটনা। সংকীর্তনরত নগরবাসী এবং গোপাল সিংহও শোনেন গর্জে উঠেছে কামান। কে এই সৈনিক, যে তার আদেশ অমান্য করে? ছুটে আসে গোলন্দাজ। বলে নীল পোশাকপরা সাদা ঘোড়ায় চড়া এক বালক নাকি দুর্গপ্রাকারে বর্গীদল আসামাত্র চারদিক আলোয় আলোময় করে ছুটে আসে। তারপরেই কামান গর্জন। স্তম্ভিত হয়ে গোলন্দাজ দেখেন বর্গীরা পালিয়ে যাচ্ছে। একজন দধি বিক্রেতাও এই সময় এসে জানান একজন নীল পোশাক পরে ঘোড়ায় চড়ে তার ঘরে গিয়ে নাকি বলেছে সে ভারি পরিশ্রান্ত। সে দই খেয়ে একটি সোনার হার উপহার দিয়ে চলে গেছে। বুঝতে পারেন পরমভক্ত গোপাল সিংহ, এ হল স্বয়ং মদনমোহন কৃষ্ণের কাজ। গল্প আরো জানায়, মদনমোহন বিগ্রহের হাতেও নাকি পরদিন বারুদের গন্ধ পাওয়া যায়।

এই সেই দলমাদল কামান।

নীরব হয়ে গিয়েছে এর বজ্রনির্ঘোষ। কিন্তু মুখর হয়ে আছে এর এক বিচিত্র কাহিনি। অনেকে বলেন, ওই দলমর্দন থেকেই এর নাম হয়েছে দলমাদল। কেউ বলেন, দল ও মাদল দুটি কামান থেকে এবং আবার কেউ বলেন, ধর্মঠাকুরের নাম থেকেই দলমাদল নামের সৃষ্টি। দলমাদলের গর্জন স্তব্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন নীরব হয়ে আসতে থাকে বিষ্ণুপুরের ইতিহাস।

বর্গীর পর আসে দুর্ভিক্ষ।

গোপাল সিংহ-এর পর কৃষ্ণ সিংহ এবং শেষে চৈতন্য সিংহ। সাধক নৃপতি চৈতন্য সিংহ-এর আমলে মন্ত্রী কমল বিশ্বাসের অত্যাচার বাড়ে। কমল বিশ্বাস নিজেকে 'ছত্রপতি' বলতেন। মোঘল আমলের সময়ে রাজা-উজিরের পার্থক্য নির্ণীত হত 'ছত্র' বা ছাতা দিয়ে। রাজা চেনা যেত মাথায় ছাতা থাকলে। আইন-ই-আকবরীতেও একথার উল্লেখ আছে। শুরু হয় গৃহবিবাদ। মুর্শিদাবাদ থেকে সিরাজদৌল্লা সৈন্য পাঠান। আসে মীরজাফরের বাহিনী। চৈতন্য সিংহ হেরে যান। মদনমোহন বিগ্রহ নিয়ে চৈতন্য সিংহ পালিয়ে যান। বিচারের জন্য হাজির হন দেওয়ান গঙ্গা গোবিন্দ সিংহ-এর কাছে। অর্থের প্রয়োজনে বাগবাজারের গোকুল মিত্রের কাছে বাঁধা দেন সেই বিগ্রহ। কিন্তু মূল বিগ্রহ আর ফিরে আসেননি বিষ্ণুপুরে। কে জানে! হয়তো মল্ল রাজবংশের শেষ পরিণতির সাক্ষী হতে তিনি অনিচ্ছুকই ছিলেন। বিষ্ণুপুরকে কেন্দ্র করে বর্ধমানের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছিল বর্গীরা। খুল্লতাত ভ্রাতা দামোদর সিংহ শরিকি মামলা রুজু করলেন চৈতন্য সিংহের বিরুদ্ধে। ঘাটোয়ালি ব্যবস্থা রোধ করা হল। কিন্তু ঘাটোয়ালরা জমি হারালেন না। প্রচুর দেবোত্তর সম্পত্তি ছিল তাদের নামে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিনিধি হেসিল রিজ এইসব সম্পত্তির ওপর কর ধার্য করতে কোম্পানিকে নিষেধ করেছিলেন।

১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে বিষ্ণুপুরের জমিদারি নিলামে বিক্রি হয়ে যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে উদ্ভূত হল দশটি এস্টেট। বিষ্ণুপুর, বড়হাজারি, করিশুণ্ডা, জঙ্গলমহল, কুচিয়াকোল, পাঁচাল, জামতাড়া, সাহারজোড়া, কালিয়াড়া এবং কিসমৎ সাহারজোড়া। এভাবেই বিষ্ণুপুর রাজের অবসান ঘটে।

এত বিপর্যয়েও চৈতন্য সিংহ নির্মাণ করেছিলেন রাধাশ্যাম মন্দির। ওই সেই মন্দিরের প্রত্ন অবশেষ রিক্ততার বেদনায় যেন হাহাকারে ভরিয়ে দিয়েছে মল্লভূমির বাতাস।

অন্তর্কলহে জীর্ণ রাজতন্ত্রে প্রবেশ করেছিল সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ। রাজছত্র ভেঙে পড়ে, থেমে যায় রণডঙ্কার শব্দ।

শুরু হল আধুনিক বিষ্ণুপুরের ইতিহাস। তবু হারিয়ে যায় না অতীতের বিষ্ণুপুর। ওই গড় দরজা, ওই দুর্গপ্রাকার, ওই জোড়বাংলো, ওই লালবাঁধ অজস্র টেরাকোটার অক্ষরে এবং জলের মৃদু গুঞ্জনে শোনায় বিষ্ণুপুরের ইতিহাস। হাতছানি দিয়ে ডাকে আপনাকে, আমাকে এবং বাংলার সকল মানুষকে।

বিলুপ্ত
জনপদ
১

তাম্রলিপ্ত

তবু ভরিল না চিত্ত।...
সবতীর্থ সার
তাই মা, তোমার পাশে এসেছি আবার।
—দেবেন্দ্রনাথ সেন

সপ্তম-অষ্টম শতকের বিখ্যাত সামুদ্রিক বন্দর তাম্রলিপ্ত আজ প্রেমেন্দ্র মিত্রের ভাষায় 'সকরুণ স্মৃতি'। অথচ মহাভারত, পুরাণ, কথাসরিৎসাগর, দশকুমার চরিত; হিউ-এন-সাঙ, ফাহিয়ান, ইৎসিঙে, টলেমির লেখনীতে উচ্চারিত হয়েছে এই নাম, কখনো তাম্রলিপ্ত, কখনো তাম-লিপ্ত, কখনো বা তাম্রলিপ্তি, তাম্রলিপ্তক, তমালিনী, বিষ্ণুগৃহ, স্তম্বপুর, তামালিকা, বেলাকূল, তামোলিত্তি, দামলিপ্ত, টমালিটেস, টালুক্‌টেই এবং তম্বলুক নামে। সম্ভবত এই তম্বলুক থেকেই আধুনিক তমলুক নামের উৎপত্তি। এই বন্দর থেকেই ফা হিয়ান সিংহল, ইৎ সিঙ, শ্রীভোজ, শ্রীবিজয়রাজ সুমাত্রা যবদ্বীপে যাত্রা করেছিলেন। পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যসূত্রে তাম্রলিপ্তের যোগাযোগ ছিল জলপথে। স্থলপথে রাজগৃহ, শ্রাবস্তি, গয়া, বারাণসীর সঙ্গে ছিল নিয়মিত যোগাযোগ। সম্রাট অশোক সিংহলে প্রেরিত দূতদের বিদায় সম্বর্ধনা জানানোর জন্য স্থলপথে ছোটনাগপুর পাহাড় অতিক্রম করে সাতদিনে পৌঁছেছিলেন তাম্রলিপ্ত বন্দরে—এ কাহিনি সিংহলী মদাবংশ গ্রন্থে রয়েছে। ফা হিয়ান বা ইৎ সিঙ শুধু তাম্রলিপ্তে ভ্রমণার্থেই আসেননি, এখানে বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন, শব্দবিদ্যা শিখেছিলেন, দেবদেবীর ছবিও এঁকেছিলেন।

কিন্তু আজ সেই সমৃদ্ধনগরী রূপনারায়ণের তীরে তমলুক নামে এক জনপদ মাত্র। প্রাচীন ঐতিহ্যের স্মৃতি নিকটবর্তী কিছু ধ্বংসস্তূপের আড়ালে আত্মগোপন করে আছে। বেশিরভাগ নিদর্শনই সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত, কেবল কিছু স্মৃতি-কাহিনি স্থানীয় ইতিহাস সচেতন গবেষক এবং সাধারণ মানুষের মণিকোঠায় সযত্নে সংরক্ষিত। পুরনো সরস্বতী বা যে গঙ্গার প্রাণপণ চেষ্টাতেও তাম্রলিপ্ত ধনজনপূর্ণ ছিল—সেই খাতের অবলুপ্তিই তাম্রলিপ্ত বন্দর-নগরী হিসেবে মর্যাদা হারায়। একইভাবেই হারিয়ে গেছে সপ্তগ্রাম বন্দর-নগরীর সব গৌরব।

তবু প্রাচীন তাম্রলিপ্ত আজকের তমলুকে এবং প্রাচীন সপ্তগ্রাম আজকের আদি সপ্তগ্রাম নামের মধ্যে অতীতের সাক্ষী হিসেবে আত্মগোপন করে এখনো অনুসন্ধিৎসু মানুষের প্রেরণার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে আছে।

বাংলার নিম্ন ব-দ্বীপ অঞ্চলে রূপনারায়ণ নদীর কূলে গড়ে উঠেছিল তাম্রলিপ্ত। উৎখনন প্রমাণ করেছে মহাস্থানগড়, বাণগড়, চন্দ্রকেতুগড়ের মতোই তাম্রলিপ্ত জনবসতিপূর্ণ ছিল। কিন্তু তাম্রলিপ্তের ইতিহাসের শুরু তাম্রপ্রস্তর যুগে। উৎখননের ফলে পাওয়া গেছে নব্যপ্রস্তর ও তাম্রপ্রস্তর যুগের বহু প্রত্নসাক্ষ্য। সর্ব নিম্নস্তরের এই নিদর্শনগুলোর উপরের স্তরে পাওয়া গেছে মৌর্য-সুঙ্গ যুগের নিদর্শন। তৃতীয় স্তরে কুষাণ যুগের চিহ্ন। পোড়া ইটের ঘরবাড়ি, মৃৎপাত্র, পোড়ামাটির ফলক, খোদাই কাজ, মুদ্রা, সিলমোহর এমনকি সুদূর রোম থেকে আমদানী করা পাত্রও। পাওয়া গেছে খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মী লিপির নিদর্শন। তাম্রলিপ্তের এই সমৃদ্ধি যে বিনষ্টপ্রায় তার ইঙ্গিত মিলেছে চতুর্থ স্তর উন্মোচনের পর।

এইসব আবিষ্কার একথা প্রমাণ করে যে, তাম্রলিপ্তের গৌরব প্রায় এক হাজার বছরব্যাপী ছিল। এবং সে গৌরব মূলত সমুদ্র-বন্দর হিসেবেই। ভাগীরথীর পশ্চিমের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপিত হত এই বন্দরের মাধ্যমেই। আবার পদ্মা-মেঘনার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল গঙ্গে বন্দরের। ফলে নিম্ন ব-দ্বীপের এই ভূখণ্ডের সঙ্গে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের যোগাযোগ সম্ভব হয়েছিল। যোগাযোগ ছিল ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গেও।

সুবৃহৎ বন্দর-নগরী তাম্রলিপ্ত শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য জনপদ হিসেবে গণ্য হত। ফা হিয়ান এখানে এসেই বৌধসূত্রের পাণ্ডুলিপি অধ্যয়ন ও পুনর্লিখন করেছিলেন। এমনকি বৌধ দেবদেবীর ছবিও এঁকেছিলেন। ইৎ সিঙও এখানেই শব্দবিদ্যা ও সংস্কৃত শিক্ষালাভ করেছিলেন।

সেই তাম্রলিপ্ত এখন তমলুক নামের আধুনিক শহর। বন্দরের কাল শেষ হয়েছে। খুব নিকটেই গড়ে উঠছে হলদিয়া বন্দর। সমুদ্রই সেতু বেঁধে দিচ্ছে সে যুগের সঙ্গে এ-যুগের।

সপ্তগ্রাম/সাতগাঁও/হুসেনবাদ/আদি সপ্তগ্রাম

'গ্রীনল্যান্ডের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে; মাওরি জাতীর ইতিহাসও আছে; কিন্তু যে দেশে গৌড়-তাম্রলিপ্তি-সপ্তগ্রামাদি নগর ছিল, সে দেশের ইতিহাস নাই।'

—বঙ্কিমচন্দ্র

'বালাদেশের প্রথম যে শহরে আমরা প্রবেশ করলাম, তা হল সোদকাওয়াৎ। এটি মহাসমুদ্রের তীরে অবস্থিত একটি বিরাট শহর, এরই কাছে গঙ্গা নদী, যেখানে হিন্দুরা তীর্থ করেন; ওখানে যমুনা নদীও একসঙ্গে মিলেছে এবং সেখান থেকে প্রবাহিত হয়ে তারা সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে। গঙ্গা নদীর তীরে অসংখ্য জাহাজ ছিল, সেইগুলো দিয়ে এরা লখ্‌নৈতির লোকেদের সঙ্গে যুদ্ধ করে—'।

আজ থেকে প্রায় ছয়শো সাঁইত্রিশ বছর আগে সুপরিচিত আফ্রিকান মুর পর্যটক ইবন বতুতা তাঁর 'রেহ্‌লা' নমাক ভ্রমণ বিবরণীতে বাংলায় যে সমৃদ্ধ নগরী 'সোদকাওয়াৎ'-এর উল্লেখ করেছেন সংখ্যাগরিষ্ঠ ঐতিহাসিকের সিদ্ধান্ত, ওই সোদকাওয়াৎই বর্তমান সপ্তগ্রাম, বাংলার প্রাচীনতম বন্দর নগরীগুলোর মধ্যে অন্যতম—মুসলমান যুগের শুরু থেকেই দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের শাসনক্ষেত্র, রাজধানী।

কিন্তু এ সিদ্ধান্তের সঙ্গে কিছু দ্বি-মতের বিতর্কও জড়িয়ে আছে। যদিও আচার্য যদুনাথ সরকার লিখেছেন :

'While Ibn Batuta entered Bengal through the port of Satgaon, admits of no doubt. The traveller's own statements dissipate all misgivings on this point.... he says that it lay near the confluence of Ganges and the Jamuna where the Hindus went on pilgrimage and was situated on the Sea-cost.... What the Ganga and the Jamuna meeted near Satgaon not near Chittagong. তবু কয়েকজন ঐতিহাসিকের ধারণা, ওই সোদকাওয়াৎ আসলে চট্টগ্রাম বন্দর। 'আমি সোদকাওয়াৎ ত্যাগ করে কামরূপ পর্বতমালার দিকে রওনা হলাম। সোদকাওয়াৎ থেকে ওই জায়গায় যেতে এক মাস সময় লাগে।' —ইবন বতুতার এই মন্তব্য এবং তাঁর বিবরণীর কিছু বর্ণনা এই সিদ্ধান্ত গড়ে তোলার সহায়ক।

কিন্তু বিজয় ঘোষ প্রমুখ গবেষকদের দৃঢ় বিশ্বাস, ওই সোদকাওয়াৎই সপ্তগ্রাম, চট্টগ্রাম নয়।

সে যাই হোক, এই বিতর্ক সপ্তগ্রামের প্রবীণত্ব এবং ঐতিহাসিক গুরুত্বকে কিছুমাত্র ম্লান করে না।

সেই অষ্টম শতাব্দী থেকে যখন প্রাচীন তাম্রলিপ্ত বন্দর নগরীর গুরুত্ব কমতে থাকে, তখন থেকেই অভ্যুদয় সপ্তগ্রাম বন্দরের। নবম শতাব্দীতে অর্থাৎ পালযুগে এবং পরবর্তী সেন আমলেই সপ্তগ্রাম ছিল অন্যতম প্রধান বন্দর-নগরী। পরবর্তী মুসলমান শাসকদের আমলে এর পূর্ণ সমৃদ্ধি এবং ষোড়শ শতক পর্যন্ত এর সুবর্ণময় অধ্যায়। এর সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে যখন হুগলি-ব্যাণ্ডেল এবং কলকাতা বাণিজ্যকেন্দ্র ও নগর হিসেবে গড়ে উঠতে থাকে—শুকিয়ে যায় সরস্বতীর ধারা, তখন থেকেই হারিয়ে যায় ক্রমে সপ্তগ্রামের বৈভব আর সমৃদ্ধি।

ইবন বতুতা এসেছিলেন চতুর্দশ শতাব্দীতে ধনে-জনে পরিপূর্ণ বন্দর নগরীতে। আমি বিংশ শতাব্দীতে এসে কল্পনার চোখে দেখার চেষ্টা করি সেই অতীত গৌরবের ঐতিহ্যের আর সমৃদ্ধির এক রূপময় স্মৃতির নগরীকে, যার চিহ্ন ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছড়ানো। কিছু নিদর্শন আর সরস্বতী নদীর শীর্ণ ধারা ছাড়া কোথাও প্রবহমান নয়। না, ইবন বতুতার মতো কোনো ভ্রমণ-তরণীকে ওই সরস্বতী নদী তার বুকে করে বয়ে এনে আজ পৌঁছে দেয় না সপ্তগ্রামের ঘাটে। এখন সেই নদী ম্রিয়মাণ ক্ষীণস্রোতা একটি খালমাত্র। তার দু'পারে বিস্তীর্ণ এলাকায় এখন চাষ-আবাদ হয়। তবু অনুমান করতে অসুবিধে হয় না—বর্তমানের এই শুষ্ক নদীখাতই একদা পূর্ণ ছিল জলাভারে। আজ আর বন্দর নয়, সরস্বতীর মজাখাতের পাশে তৈরি হয়েছে অসংখ্য কলকারখানা।

আর হাওড়া-বর্ধমান মেইন লাইনে ট্রেনে করে গেলে ব্যাণ্ডেলের পরের স্টেশন আদি সপ্তগ্রাম ও মগরার মাঝখানে দিয়ে বয়ে চলে আর এক শীর্ণধারা ও শুকনো নদীখাত। ওটা কুন্তী নদীর খাত।

সপ্তডিঙা মধুকর বাণিজ্য-তরী নিয়ে আর আসে না সপ্তগ্রামের ঘাটে। শুধু বর্ষার সময় ওই ক্ষীণস্রোতে যখন কিছুটা প্রাণসঞ্চার হয়, তখন মাটির হাড়ি-কলসি ও খড় বোঝাই নৌকো আসে তার বুক বেয়ে। ব্যথিত হয় কল্পনা, গভীর বিষাদে অভিভূত হয় ইতিহাসপ্রিয় এক স্বপ্নের চিত্রমায়া, বিস্মিত হয় ভাবনা—সময়ে কত স্বপ্ন কি দ্রুতই না হারিয়ে যায়! হারিয়ে যায় একটি প্রাণচঞ্চল বন্দরের স্পন্দন। এখন আদি সপ্তগ্রাম রেল স্টেশনের অনতিদূরে প্রচ্ছন্ন আছে সপ্তগ্রামের হারানো অতীত, এ যুগের কর্মমুখর বন্দর-নগরী কলকাতা থেকে যার দূরত্ব মাত্র ২৭ মাইল। আমি বাতাসে কান পাতি, কল্পনার চোখ মেলি—অনুভবে পেতে চাই সপ্তগ্রামের আদি গৌরবের স্মৃতিময় সৌরভকে। এক সময় গঙ্গা ত্রিবেণীর কাছে এসে ত্রি-ধারায় বিভক্ত হয়েছিল। যমুনার ধারা দক্ষিণ-পূর্বে ভাগীরথীর ধারা হুগলির আদি বন্দরপথ ধরে সমুদ্রে, আর সরস্বতীর ধারা দক্ষিণ-পশ্চিমে এই সপ্তগ্রামের পাশে প্রবাহিত হত। দামোদর রূপনারায়ণের প্রবাহের সঙ্গে মিশে ভাগীরথীর দক্ষিণাভিমুখী ধারার সঙ্গে মিলিত হয়ে এই ধারা বিলীন হত বঙ্গোপসাগরে। সপ্তগ্রামে বাণিজ্য-তরী তাই আসত অবাধে। বর্তমান ২৪ পরগনা, নদিয়া জেলার পশ্চিমাংশ এবং দক্ষিণ ডায়মণ্ডহারবার পর্যন্ত ছিল সপ্তগ্রামের শাসন-সীমা।

কিন্তু কেন এর নাম সপ্তগ্রাম?

পৌরাণিক কাহিনি বলে, সপ্তঋষির সাধনার স্থান হল এই ত্রিবেণী তীর্থপথের সপ্তগ্রাম। বহুদিন আগে কান্যকুব্জে প্রিয়বন্ত নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর অগ্নিত্র, মেধাতিথি,

বপুস্মান, জ্যোতিস্মান, দ্যুতিস্মান, সবন ও ভব্য নামে সাত পুত্র ছিল। তাঁরা গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে সাতটি গ্রামে বসে সাধনা করেছিলেন। গ্রামগুলো হল—বাসুদেবপুর, কৃষ্ণপুর, খামারপাড়া, বাঁশবেড়িয়া, দেবানন্দপুর, শিবপুর ও ত্রিশবিঘা। এই সাতটি গ্রামের সমাহারেই এই সপ্তগ্রাম।

বর্তমান আদি সপ্তগ্রাম স্টেশনটি ওই ত্রিশবিঘারই এলাকায়। সম্রাট লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি ধোয়ী তাঁর পবনদূত কাব্যে উল্লেখ করেছেন :

'স্কন্ধা বারং বিজয়পুরম্ ইত্যুন্নতাং রাজধানীং
দৃষ্টা তাবদ্ ভুবনবিজয়িনস্তস্য রাজ্ঞেধিগচ্ছ।
গঙ্গাবাতস্তমিব চতুরো যত্র গৌরাঙ্গনাণাং
সম্ভোগান্তে সপদি হিতনোত্যঙ্গ সংবাহনানি ॥'

এই শ্লোকের অন্তরালে বিজয়পুর নগরীর যে উল্লেখ আছে, রমাপ্রসাদ চন্দ প্রমুখ ঐতিহাসিকের অনুমান, সেন রাজাদের রাজধানী ওই বিজয়পুর রাজসাহী জেলার বিজয়নগর গ্রাম। আবার মনোমোহন চক্রবর্তী ইত্যাদি কয়েকজনের অনুমান বর্তমান নবদ্বীপই এই বিজয়পুর। আবার ওই শ্লোকের ভৌগোলিক ব্যাখ্যা অনেক ঐতিহাসিককে এই সিধান্ত প্রচারে প্ররোচিত করেছে যে, আসলে ওই বিজয়পুর ত্রিবেণীর কাছে গঙ্গার তীরে কোথাও অবস্থিত ছিল। ত্রিবেণীর পূর্বতীরে হালিশহরের কাছে বীজপুর অঞ্চলই সেই বিজয়পুরের স্মৃতি বহন করছে। ইতিহাস বলে সেন আমলে বিজয়পুর, লক্ষ্মণাবতী ও বিক্রমপুরে ছিল রাজধানী। যখন বিক্রমপুর থেকে সোনারগাঁ-এ রাজধানী স্থানান্তরিত হয়, সম্ভবত সেই ১২৮০ সালের কাছাকাছি সময়ে বিজয়পুর থেকে সপ্তগ্রামেও শাসনকেন্দ্র সরে আসে। ১২৪২-৪৩ খ্রিস্টাব্দেও যে সপ্তগ্রাম হিন্দু নরপতিদের দ্বারা শাসিত হত তার প্রমাণ আছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত বাংলার ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ডে—'Saptagram (Satgaon) was still unsabduced and the District of Nadia was strewn with semi-independent Hindu Rajas.'

তাহলে কে ছিলেন এই হিন্দু রাজা? তার সঠিক বৃত্তান্ত এখনো অনুদ্ঘাটিত। এরপর বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গ বিজয়ের এক শতাব্দী পরে সপ্তগ্রামের উল্লেখ পাওয়া যায় একাধিক আরবি-ফারসি শিলালিপিতে। ত্রিবেণীর জাফর খাঁ গাজীর জিহাদের কাহিনি থেকে জানা যায়—এই সময় মুসলমানরা অধিকার করেন সপ্তগ্রাম নগরী। ১৩২৮ সাল থেকে মহম্মদ-বিন-তুঘলকের সময়ে দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গেব প্রধান শাসনকেন্দ্র হয়ে ওঠে সপ্তগ্রাম। শাসনকর্তা হন আজম্-উল্-মুলুক ইয়াইয়া।

এর পরের সুলতান হলেন ফখরুদ্দীন। এঁরই সময় বঙ্গ ভ্রমণে এসেছিলেন ইবন বতুতা। লিখছেন ইবন : 'সুলতান ফখরুদ্দীন, ডাকনাম ফখ্রা। ইনি ছিলেন গুণী রাজা। বিদেশিদের বিশেষত ফকির ও সুফীদের ইনি ভালোবাসেন। বাংলা রাজ্যের মালিক আসলে ছিলেন সুলতান গিয়াসুদ্দীনের পুত্র সুলতান নাসিরুদ্দীন। .....যখন ফখরুদ্দীন দেখলেন যে, সুলতান নাসিরুদ্দীনের বংশের রাজত্ব শেষ হয়েছে, তখন তিনি... সোদকাওয়াৎ ও বাংলার অবশিষ্ট অংশে বিদ্রোহ করলেন। ...শীতকালে এবং বর্ষার কাদার মধ্যে ফখরুদ্দীন জলপথে লখনৌতি আক্রমণ করলেন, কারণ জলে তিনি শক্তিশালী ছিলেন। ...ফকিরদের প্রতি

সুলতানের শ্রদ্ধা এত গভীর ছিল যে, তিনি শায়দা নামে একজন ফকিরকে সোদকাওয়াতে তাঁর নায়েব নিযুক্ত করেছিলেন। তারপর সুলতান তাঁর এক শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য যাত্রা করেন। কিন্তু শায়দা নিজে স্বাধীন হবার মতলব করে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসল। সে সুলতানের একমাত্র পুত্রকে হত্যা করল। সুলতান রাজধানীতে ফিরে এলেন। শায়দা সোনারগাঁয়ে পালিয়ে গেলেন। সেখানকার অধিবাসীরা শায়দাকে সৈন্যবাহিনীর কাছে পাঠিয়ে দিল। সুলতান বিদ্রোহীদের মাথা ফাটিয়ে দিতে আদেশ দিলেন।

......আমি যখন সোদকাওয়াতে গিয়েছিলাম তখন সুলতানকে আমি দেখিনি, কারণ তিনি তখন ভারতের সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছিলেন।'

এই বিবরণ পড়লে বুঝতে অসুবিধে হয় না, সেই সময় বাংলার সপ্তগ্রাম সামরিক শক্তিতে এবং সমৃদ্ধিতে দিল্লিশ্বরকে পরাস্ত করার ক্ষমতার অধিকারীও ছিল এবং এই সমৃদ্ধির কারণেই গাজী জাফর খাঁ সপ্তগ্রাম অধিকার করেন।

সপ্তগ্রামের ইতিহাসে এই জাফর খাঁ এক আশ্চর্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। সঠিকভাবে এঁর জীবনবৃত্তান্ত কিছু জানা যায় না। শান্তিপুরের মহীউদ্দিন ওস্তাগরের 'পাঁড়ুয়ার কেচ্ছাকাব্যে' ত্রিবেণীর এই জাফর গাজীর উল্লেখ আছে মাত্র :

জাফর খাঁ গাজী রহিল ত্রিবেণী স্থানে,
গঙ্গা যারে দেখা দিল ডাক শুনি কানে ॥

সন্দেহ কি, অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন জাফর খাঁ। বস্তুত তিনি ছিলেন জালালুদ্দীন তাব্রেজীর মতোই একজন ইসলাম ধর্মপ্রচারক। স্টেপলটন সাহেবের মতে, এইসব ধর্মপ্রচারকদের দিল্লি থেকে বিভিন্ন স্থানে পাঠানো হয়েছিল ধর্মবিজয়ের জন্য; এঁরা ছিলেন 'পঞ্চম বাহিনী'। যদিও যদুনাথ সরকার মনে করেন, এঁরা তা ছিলেন না। অবশ্য ধর্মবিজয়ের পর ক্রমে রাজনৈতিক বিজয়ও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এঁরাই ঘটিয়েছিলেন। জাফর গাজীর ক্ষেত্রেও সেই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি হয়েছিল।

সে সময় সপ্তগ্রাম অঞ্চলের হিন্দু সামন্ত-নৃপতি, মান-নৃপতি ও ভূদেব-নৃপতির সঙ্গে এর যুদ্ধ হয়। জাফর খাঁ-র পুত্র উলুন খাঁ সপ্তগ্রামের রাজাকে পরাজিত করে রাজবংশের সকলকে ধর্মান্তরিত করেন এবং ১৩১৩ সালে জাফর খাঁ সপ্তগ্রামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এসব ঘটনা আজ স্মৃতিভারে স্তব্ধ হয়ে আছে ত্রিবেণীতে। জাফর খাঁ গাজীর মসজিদে, যাকে আচার্য যদুনাথ বলেছেন—'a museum of Muslim epigraphy' এবং সেটি এখন পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে পুরনো মসজিদ। আছে পাথরের একটি লৌহখণ্ড; স্থানীয় মানুষ যাকে বলেন 'গাজীর কুড়ুল'। সিংহবিক্রম জাফর খাঁ যে খড়্গ ও বল্লম নিয়ে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন, গাজীর কুড়ুল তার স্মৃতি-সাক্ষী। স্মৃতি আর শুধু স্মৃতি নিয়ে, কিছু প্রত্ন নিদর্শন ছাড়া আর কোনো চিহ্নই নেই সেই সপ্তগ্রামের ঐশ্বর্যময় রূপের। কয়েকটি মসজিদ আর সমাধির নীরবতার গভীরে নীরব হয়ে আছে ইতিহাসের ভাষা।

ওই সেই মসজিদের ভগ্নাবশেষ, যেটি মামুদ শাহের রাজত্বকালে ১৪৫৭ খ্রিস্টাব্দে তরবিয়ৎ খাঁ নির্মাণ করেছিলেন। ১৫২৯ সালে জামাল দিন হুসেনের তৈরি এবং ১৪৮৭ সালে উলুগসুরের তৈরি মসজিদের গায়ে জমেছে দীর্ঘকালের ঘটনার বলিরেখা। সৈয়দ ফখরুদ্দীন, তাঁর স্ত্রী এবং খোজার সমাধি ঘিরে রয়েছে শুধু বিষণ্ণতার বাতাস।

এ বিষণ্ণতা শুধু ব্যক্তি বিশেষের হারিয়ে যাওয়ার জন্য নয়—একটি সম্প্রীতিময়তা মানবিক গুণে উজ্জ্বল এক ছবির ক্রম অবলুপ্তির জন্য। সপ্তগ্রামের চারপাশের প্রায় প্রত্যেকটি প্রত্নচিহ্ন ঘিরেই রয়েছে হিন্দু-মুসলমানের যৌথ সংস্কৃতির সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। হিন্দু ভাস্কর্যের চিহ্ন আজও মসজিদের দেওয়ালে, গাজী সাহেবের দরগায় প্রার্থনা করেন হিন্দুরাও।

ষোড়শ শতাব্দীতে মহাপ্রভুর সঙ্গী নিত্যানন্দ প্রভু এসেছিলেন সপ্তগ্রামের বণিকদের ঘরে ঘরে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করতে। এঁর প্রায় দু'শো বছর আগে গাজী জাফর খাঁ এসেছিলেন মুসলমান ধর্ম প্রচারে। তখন সপ্তগ্রামে বিষ্ণুপূজা, সূর্যপূজার প্রচলন ছিল—যার চিহ্ন রয়ে গেছে মসজিদ-মাদ্রাসার কাছে দেবদেবীর মূর্তিগুলোয়।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য ও প্রীতির নির্মল হৃদ্যতার পরিমণ্ডল। কবি বৃন্দাবন দাস চৈতন্যভাগবত-এর অন্ত্য, পঞ্চম অধ্যায় লিখেছেন :

'অন্যের কি দায়, বিষ্ণুদ্রোহী যে যবন
তাহারাও পাদপদ্মে লউল শরণ ॥
যবনের নয়নে দেখিতে প্রেমধার
ব্রাহ্মণেও আপনারে জন্মায়ে ধিক্কার ॥'

আজ থেকে প্রায় চারশো বছর আগে সপ্তগ্রামের বাতাসে জেগে ওঠা নাম সংকীর্তনের প্রবল জোয়ারে হিন্দু-মুসলমান সব শ্রেণির মানুষের সমবেত ঐকতান যেভাবে উল্লসিত হয়েছিল, আজও তা যেন আছড়ে পড়ে আমার শ্রবণে—

'সপ্তগ্রামে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ রায়
গণসহ সংকীর্তন করেন লীলায় ॥
সপ্তগ্রামে যত হৈল কীর্তন বিহার
শত বৎসরেও তাহা পারি বর্ণিবার ॥'

সপ্তগ্রামের এই ছবি ইবন বতুতা আসার দুশো বছর পরের। বাংলার বর্ণনায় লিখেছেন ইবন : 'সারা পৃথিবীতে আমি এমন একটিও দেশ দেখিনি, যেখানে বাংলাদেশের চেয়ে জিনিসপত্রের দাম সস্তা।... আমি দেখেছি এক রুপোর দিনার-এর বিনিময়ে ২৫ রুৎল্ (রুৎল্ = ১৪ সের) চাল বিক্রি হতে।... তিনটি রুপোর দিনারে একটি দুগ্ধবতী গাভী বিক্রি হয়।... সবচেয়ে মিহি পাতলা একখানা কাপড় আমি দুই দিনারে ত্রিশ হাত দরে বিক্রি হতেও দেখেছি।

একটি সুন্দরী ক্রীতদাসী, যে উপপত্নী হতে সমর্থ, তার দাম এক সোনার দিনার। এই দরে আমি অশুরা নামে অত্যন্ত সুন্দরী একটি ক্রীতদাসী ক্রয় করলাম। আমার সঙ্গী লুলু নামে একটি অল্পবয়স্ক সুদর্শন বালককে দুই সোনার দিনারে কিনলেন।'

বিপ্রদাস তাঁর মনসা বিজয়কাব্যে লিখেছেন :

বুহিত্র চাপায়্যা কূলে চাঁদো অধিকারী বলে
দেখিব কেমন সপ্তগ্রাম
তথা সপ্তঋষি স্থান সর্বদেব অধিষ্ঠান
লক্ষ মোক্ষ রমান্তর ধাম।...
অভিনব সুরপুরী দেখি ঘর সারি সারি
প্রতি ঘরে কনকের বায়া

নানা রতম্ভ অবিশাল   জ্যোতির্ময় কাঁচা চাল
গজমুক্ত প্রলম্বিত সায়া।
সবে দেবে ভক্তি অতি   প্রতি ঘরে নাগমূর্তি
রত্নময় সকল প্রাসাদে...
নিবসে যবন জত   তাহা বা বলিব কত
মোঘল পাঠান কোমাদীম
ছৈয়দ মোল্লা কাজী   কেতাব কোরাণ রাজি
দুই ভক্ত করে তছলিম ॥

সন্দেহ নেই, বিশ্বাস করতে অসুবিধেও নেই, ইবন বতুতা বা বিপ্রদাসের সপ্তগ্রাম বর্ণনা একটি ধনজন পরিপূর্ণ ধর্মবিদ্বেষ শূন্য কাঙ্ক্ষিত অমরাপুরীরই বন্দর। কবি কৃষ্ণরাম 'ষষ্ঠীমঙ্গল' কাব্যে লিখেছেন :

সপ্তগ্রাম যে ধরণী তার নাহি তুল
চালে চালে বৈসে লোক ভাগীরথী কূল ॥
নিরবধি যজ্ঞদান পূণ্যবান লোক
একাল মরণ নাহি, নাহি দুঃখ শোক ॥

পরবর্তী শতাব্দীতে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম লিখেছেন :

এ সব সফরে যত সদাগর বৈসে
যত ডিঙা লৈয়া তারা বাণিজেতে আইসে ॥
সপ্তগ্রামের বণিক কোথাও না যায়
ঘরে বসে সুখ মোক্ষ নানা ধন পায় ॥

না, আজ আর সপ্তগ্রামের মাটিতে দাঁড়িয়ে সহজে কল্পনায় আঁকা যায় না দূর অতীতের সেই ঐশ্বর্যের ছবি। সেই গৌরবময় দিনের গাথা কখনো 'কথাসরিৎসাগর', কখনো পর্তুগিজদের বিবরণ, কখনো র‍্যালফ ফিচের রিপোর্ট আর অসংখ্য কাব্যকাহিনি শিলাখণ্ডেতে আজও মূক সাক্ষী হয়ে আছে।

ওই তো সেই উধারণ দত্তের শ্রীপাট, যেখানে গেলে মনে পড়ে চৈতন্য ভাগবতের বর্ণনার ভাষা আর সেই বণিককুলের কথা, যাঁরা এক সময় সপ্তগ্রামে এসে এক স্বতন্ত্র 'সপ্তগ্রামী' কুলমর্যাদা লাভ করেছিলেন। প্রভু নিত্যানন্দ এঁদেরই ঘরে ঘরে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেছিলেন। পরে এঁরাই হুগলি, চুঁচুড়া হয়ে কলকাতায় আসেন। এঁদের মধ্যে চোরবাগানের মল্লিকরা উল্লেখযোগ্য। আকবরের আমলে সপ্তগ্রামের জনৈক মুকুন্দরাম শেঠ বড়বাজারে বস্ত্র-ব্যাবসা শুরু করেন। তাঁর গৃহদেবতা গোবিন্দ জীউরের নামে ওই স্থানের নাম দেন গোবিন্দপুর, যা পরে কলকাতার অন্তর্ভুক্ত হয়।

হায়রে কবে কেটে গেছে মুকুন্দরামের সেই কাল!

কথা প্রসঙ্গে বন্ধুবর প্রভাতরঞ্জন গোস্বামী বলছিলেন, সপ্তগ্রামে তিনি লক্ষ করেছেন অনেক পুকুরের মাঝখানে উঁচু স্তম্ভ। স্থানীয় মানুষেরা অনেকেই কল্পনার গল্পে রঙিন করে তুলেছেন এই ঘটনাকে যে, ওইগুলো হল জাহাজের মাস্তুল। আসলে ওগুলো তা নয়, পুকুর প্রতিষ্ঠার সময় একটা বিশেষ রীতির পরিচায়ক ওই স্তম্ভগুলো। তিনি বলেছিলেন, আজও বণিক সম্প্রদায়ের অনেকে নৌকোয় যাত্রা করলে আগে নৌকো পুজো করেন।

হয়তো তাঁদের প্রার্থনার সঙ্গে মিশে যায়, হারিয়ে যাওয়া বন্দর-নগরীর বণিকদের বাণিজ্য যাত্রার আগে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষার জন্য নিবেদিত পূজার্চনার প্রথারই একটি অঙ্গ।

ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে পর্তুগিজরা সপ্তগ্রামে আসতে শুরু করেন। ১৫৩৭-৩৮ সালেই সেখানে বাণিজ্যকুঠি নির্মাণ করেন তাঁরা এবং ১৫৬৫ সালের মধ্যেই নিয়মিত খাদ্যবস্তু ও বস্ত্র রপ্তানি করতে থাকেন।

১৫৬৫ সালে সীজার ফ্রেডারিক সপ্তগ্রাম সম্বন্ধে লেখেন :

'The citie of Satgaon is a reasonable fair citie for a citie of the Moores... and was governed by the King of Patane and now is subject to the great Mogol. I was in this kingdom for four months.'

এর প্রায় ত্রিশ বছর পর র‍্যালফ ফিচ লেখেন :

'—A fairie citie for a citie of the Moores, and very plentiful of things.'

কিন্তু সপ্তগ্রামের সমৃদ্ধি তখন নিভে আসছে—সরস্বতীর জলধারা শুকিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। যেমন, কৃষ্ণরামের ষষ্ঠীমঙ্গল কাব্যে সপ্তগ্রামের যে বর্ণনা আছে, বিনয় ঘোষ প্রমুখ গবেষকদের অনুমান, তা মুখ্যতই ত্রিবেণীর বর্ণনা।

কেননা, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ থেকে সপ্তগ্রামের উল্লেখ তৎকালীন বাংলা সাহিত্যে আর দেখা যায় না। বিজয়রামের 'তীর্থমঙ্গল' বা দীনবন্ধু মিত্রের 'সুরধনীকাব্য'তেও সপ্তগ্রামের উল্লেখ নেই।

হারিয়েই গেছে সেই সপ্তগ্রাম শুধু 'আদি সপ্তগ্রাম' এই নামের স্মৃতি ছাড়া। লুপ্ত সরস্বতীর গভীর খাতচিহ্ন আর কয়েকটি প্রত্নুনিদর্শন ব্যতীত সপ্তগ্রামের অতীত ঐতিহ্য আর কোথাও এই শতাব্দী ধরে রাখেনি।

খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে প্লিনি লিখেছিলেন :

'That the Ships near the Godavari sailed from Thence to cape Palinurous, thence to Tennigale opposite Fulta, thence to Tribeni.'

রেভারেন্ড লঙের মতে প্লিনির সময় থেকে পর্তুগিজদের আগমনকাল পর্যন্ত সপ্তগ্রাম ছিল রয়েল পোর্ট। সরস্বতী ছিল সাতগাঁ রীভার। সপ্তগ্রামকে বলা হত 'গ্যাঞ্জেস রেজিয়া'।

স্মার্তপণ্ডিত রঘুনন্দন তাঁর 'প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্বে' লিখেছেন :

'—দক্ষিণ প্রয়াগ উন্মুক্তবেণী সপ্তগ্রামোখ্যা দক্ষিণ দেশে ত্রিবেণীতে খ্যাতঃ।'

আজ হারিয়ে গেছে সপ্তগ্রামের সেই খ্যাতি। ১৩২৫ সালে যেখানে টাঁকশাল তৈরি হয়েছিল, যার স্থিতি ছিল ১৫৫৩ সাল পর্যন্ত। আজ আর তার কোনো চিহ্ন-ই অবশিষ্ট নেই। 'ক্যাটালগ অব কয়েনস ইনি দি ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম'-এর ৫৭১ পৃষ্ঠায় সপ্তগ্রামের মুদ্রা নিয়ে বিশদ আলোচনাই আজ শুধু ইতিহাস-কৌতূহলী মানুষের জিজ্ঞাসার নীরব উত্তর।

বহু যুগের বহু ঘটনার কথাই এখন নীরব হয়ে আছে সপ্তগ্রামের বাতাসে। গৌড়ের সুলতান হুসেন শাহ্ এর নামকরণ করেন 'হুসেনবাদ।' তিনি গোবর্ধন দাস ও হিরণ্য দাস নামে দুই ভাইকে সপ্তগ্রামের অধিকারী বা রাজা হিসেবে নিয়োগ করেন। ওদের বার্ষিক আয় ১২ লক্ষ টাকার ওপর ছিল। হিরণ্য দাসের পুত্র এই বিপুল ঐশ্বর্য হেলায় ত্যাগ করে শ্রীচৈতন্যের অনুগামী হন। এঁর নাম রঘুনাথ। ইনি পরে বৈষ্ণবকূলে ষট গোস্বামীর অন্যতম রূপে পরিগণিত হন। সুলতান সুলেমান কারনানির সময়ে ১৫৬৫ খ্রিস্টাব্দে উড়িষ্যারাজ

মুকুন্দদেব হরিচন্দনের জ্ঞাতি ভ্রাতা রাজীবলোচন সপ্তগ্রাম নিজ অধিকারে রাখেন। এরও বহুকাল আগে নবম শতাব্দীতে সপ্তগ্রামে পরম ভট্টায়ক রূপনারায়ণ সিংহ নামে বাগদী জাতীয় বৌধ ধর্মাবলম্বী এক পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। ইনি একটি বিহারও প্রতিষ্ঠা করেন। শুধু রাজ চক্রবর্তীরাই নন, বহু স্মরণীয় মানুষের লীলাভূমিও ছিল এই সপ্তগ্রাম। চণ্ডী রচয়িতা পরাশর পুত্রের জন্ম এই সপ্তগ্রামে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত শ্রীমৎ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর পিতৃব্য হিরণ্য দাস ও পিতা গোবর্ধন দাস সপ্তগ্রামের নাগরিক ছিলেন। প্রাচীন সরস্বতীর পূর্বতীরে ছিল তাঁর প্রাসাদ। এখন আদি সপ্তগ্রাম স্টেশন থেকে মাইল দেড়েক দূরে আছে সেই পাটবাড়ি।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বেনের মেয়ে' আর বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা'য় আছে প্রাচীন সপ্তগ্রামের বর্ণনা।

১২৯৬ সালে যোগেন্দ্র বসু লিখেছিলেন :

'সপ্তগ্রাম এখন বিজনকানন বলিলে অত্যুক্তি হয় না, কয়েকঘর মাত্র লোকের বসবাস আছে। ইস্ট ইন্ডিয়া রেল কোম্পানির হুগলি এবং মগরা এই স্টেশনদ্বয়ের মধ্যবর্তী ত্রিশবিঘা স্টেশনের কাছেই বিঘাকয়েক জমি পরেই বর্তমান সপ্তগ্রাম বা সাতগাঁয়ের শেষ চিহ্ন— কঙ্কালবিশিষ্ট বিদ্যমান, প্রান্তর বা ইস্টক নির্মিত অতি প্রাচীন যুগের ধূলিসাৎ ধ্বংস ব্যাপার এখনও সেখানে অতি কষ্টে ঈষৎ দেখা যায়। মহাকালের কি বিচিত্র লীলা আজ ত্রিশবিঘার নামে সপ্তগ্রামের পরিচয় করিতে হইল!'

'কপালকুণ্ডলা'য় লিখেছেন বঙ্কিমচন্দ্র: 'সকলেই অবগত আছেন যে, পূর্বকালে সপ্তগ্রাম মহাসমৃদ্ধশালী নগর ছিল। এককালে যবদ্বীপ হইতে রোমক পর্যন্ত সর্বদেশের বণিকেরা বাণিজ্যার্থে এই মহানগরে মিলিতে হইত। কিন্তু বঙ্গীয় দশম-একাদশ শতাব্দীতে সপ্তগ্রামের প্রাচীন সমৃদ্ধির লাঘব জন্মিয়াছিল। ইহার প্রধান কারণ এই যে, তন্নগরের প্রান্তভাগ প্রক্ষালিত করিয়া যে স্রোতবতী বাহিত হইত, এক্ষণে তাহা সঙ্কীর্ণ শরীর হইয়া আসিতেছিল, সুতরাং বৃহদাকার জলযান সকল আর নগর পর্যন্ত আসিতে পারিত না।.... বাণিজ্য নাশ হইলে সকলই যায়। সপ্তগ্রামের সকলই গেল।'

অথচ সুলতানি আমলের বিখ্যাত চট্টগ্রাম বন্দরের পরেই ছিল সপ্তগ্রাম বন্দর। ১২৯৮ সালে জাফর খাঁ গাজীর অভিযানের আগে এটি ছিল একটি বড়ো শহর। তৎকালীন বাংলার তিনটি শাসনতান্ত্রিক অঞ্চল ছিল লখনৌতি, সোনারগাঁও এবং সাতগাঁও বা সপ্তগ্রাম। ১৩২৯ সালে প্রথম এখানকার টাঁকশাল থেকে মুদ্রা পাওয়া যায় ১৫৫২ সাল অবধি। এখান থেকেই পাওয়া গেছে বারবাক শাহ এবং হোসেন শাহ'র সাতটি শিলালিপি। পাওয়া গেছে নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহর শিলালিপিও। বলাবাহুল্য এসবই সপ্তগ্রামের গুরুত্বের-ই পাথুরে প্রমাণ।

আবুল ফজল তাঁর আইন-ই-আকবরীতে সপ্তগ্রামকে উনিশটি সরকারের মধ্যে একটি বলে গণ্য করা হয়েছে। গঙ্গার পূর্বদিকে তেপান্নটি রাজস্ব মহাল ছিল এই সরকারের অধীনে। এই তথ্য প্রমাণ করে সপ্তগ্রাম সরকার মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, চব্বিশ পরগনা এমনকি যশোর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইতিহাস জানায়, ১২৯৮-এর আগে থেকেই সপ্তগ্রামের শুরু যখন পার্শ্ববর্তী ত্রিবেণী তীর্থ-শহর হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। টাঁকশাল হবার পর সপ্তগ্রামের গুরুত্ব বাড়ে। বণিকদের আনাগোনা শুরু হয়। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় জানান ১৪৭৫ সালে সপ্তগ্রামের সমৃদ্ধির খ্যাতি চূড়া স্পর্শ করে। এর কারণ হিসেবে বলা যায়

অপর বন্দর চট্টগ্রামে রাজনৈতিক গোলমাল শুরু হয় পর্তুগিজদের আধিপত্যে। সপ্তগ্রাম ক্রমে গৌড়বঙ্গের অন্যতম প্রধান বন্দর হয়ে ওঠে। সুলতান হোসেন শাহ্ ত্রিবেণী ও সপ্তগ্রামের মধ্যে একটি সেতু করে দেন যাতায়াতের জন্য। ফলে গুরুত্ব আরো বেড়েছিল।

সপ্তগ্রামের আকৃতি ছিল অর্ধবৃত্তাকার। ভাগীরথী এবং সরস্বতীর পূর্বপাড় ধরে। প্রত্নতাত্ত্বিক অন্বেষণ তেমন আগ্রহী হয়ে ওঠেনি এই জনপদের সম্যক পরিচয় দানে। ফলে আদি সপ্তগ্রাম স্টেশনের কাছে পাওয়া কিছু প্রত্নবস্তুই অতীতের সাক্ষী হিসেবে সংগৃহীত হয়েছে মাত্র। ১৫৬৭ সালে সিজার ফ্রেডারিক নামে একজন পর্যটক সপ্তগ্রামে আসেন। সপ্তগ্রামের বেতোড় বন্দরে তিনি জাহাজ ভিড়তে দেখেছিলেন। ১৫৮৩-তে পর্যটক র‍্যালফ ফিচ সপ্তগ্রামের সমৃদ্ধির বিবরণ দিয়েছেন। বহু মন্দির, বাজার, বাজারে সুলভে পসরা, ধনীদের বাড়িঘর। এই ষোড়শ শতকের শেষার্ধ থেকেই সরস্বতী নদী মজে আসতে থাকে। বেতোড়ের কাছে ভাগীরথীর সঙ্গে সংযোগ ছিন্ন হয়ে আসে। ১৬৩২-এ মোঘলরা হুগলি-দুর্গ দখল করে পর্তুগিজদের হটিয়ে সপ্তগ্রাম থেকে প্রশাসন দপ্তর সরিয়ে আনে হুগলিতে।

এইসব পর্যটকরা ছাড়াও সপ্তগ্রামের ছবি আঁকা আছে বাসুদেব ঘোষের কড়চাতে। এই সম্পদময় জনপদে বহু ধরনের অধিবাসী বাস করতেন। কবিরাজ, নাপিত, তাঁতি, সুবর্ণ বণিক, গন্ধ বণিক ও কংস বণিক প্রভৃতি বিভিন্ন পেশার মানুষ ছিলেন। বণিক সম্প্রদায় বসবাস করলেও বিদেশি বণিকদেরই প্রাধান্য ছিল এখানে।

কিন্তু ১৫৩০ থেকে যে পতনের শুরু সরস্বতী মজে যাওয়ায় তার শেষ। এখানকার বণিক সম্প্রদায় ছড়িয়ে পড়েন নবদ্বীপ, শান্তিপুর ইত্যাদি বৈষ্ণব প্রধান অঞ্চলে। সপ্তগ্রাম শ্রীহীন হয়ে শুধু একটি স্মরণীয় নাম হয়ে—হ্যাঁ—রয়ে যায়।

হ্যাঁ, প্রাচীন সমৃদ্ধির সবই হারিয়ে গিয়েছে বর্তমান সপ্তগ্রামের। নতুন যুগের নতুন মানুষ এসেছেন এখানে। গড়ে উঠেছে নতুন জনজীবন।

নতুন জীবনের কোলাহলে মুখর সপ্তগ্রামে যখন গভীর রাত নামে, তখন সরস্বতীর হারানো স্রোতধারা খুঁজে পাবার জন্য হাজার হাজার জোনাকি স্মৃতিচারী অতৃপ্ত আত্মার মতো ঘুরে বেড়ায় অন্ধকারে। বহু দূর থেকে ছোটো পাণ্ডুয়ার মিনার অপলক চোখে তাকিয়ে দেখে সেই অন্বেষণ। মাঝে মাঝে ক্ষ্যাপা হাওয়া ছটফট করে কোনো অনাগত বাণিজ্য-তরীর পালে আঘাত হেনে তাকে আবার সচল করার জন্য। কিন্তু না, শ্রীমন্ত সওদাগরের সপ্তডিঙা মধুকর আর ভেড়ে না সপ্তগ্রামের ঘাটে। বহুদূরের আকাশ থেকে নক্ষত্রেরা অপলক চোখে শুধু দেখে যুগ যুগ ধরে প্রবহমান সপ্তগ্রামের ইতিহাসের পালাবদলের ঘটনামুখর দিন-রাত্রির আবর্তনকে। আজ যেখানে আদি সপ্তগ্রাম রেল স্টেশন তার অনতিদূরেই ছিল সপ্তগ্রাম নগরের মূল অংশ। না, কোনো সপ্তডিঙায় নয়, আধুনিককালে যন্ত্রযান ট্রেনে যেতে যেতে যখন আদি সপ্তগ্রাম পার হই, তখন দু'চোখ উৎসুক হয়ে খোঁজে অতীত বৈভবের কোনো নিদর্শন, কল্পনা ব্যথিত হয় বর্তমান শ্রীহীনতা দেখে, মন ক্ষুব্ধ হয় এমন ঐতিহাসিক একটি স্থান সরকারি পর্যটন দপ্তরের অবহেলায় ধীরে ধীরে বাঙালির স্মৃতি থেকে লুপ্ত হতে দেখে! সন্দেহ কি, বাঙালি আত্মবিস্মৃত জাতি, আত্মঘাতীও! শুনেছি, সম্প্রতি গড়ে উঠেছে সপ্তগ্রামকে ঘিরে গবেষণার আয়োজন। ইতিহাসের স্রোতে সপ্তডিঙা ভাসিয়ে হয়ত একদিন পুনরায় সপ্তগ্রাম সগৌরবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

যশোহর

'যুধ করিল প্রতাপাদিত্য
তুই তো মা সেই ধন্য দেশ।'
—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

গৌড়ের পাসাদোম অট্টালিকায় অস্থির পদাচরণা করছিলেন শ্রীহরি, সুলতান দায়ুদ খাঁর কোষাধ্যক্ষ। স্পষ্টই বুঝতে পেরেছেন তিনি, গৌড়ের দুর্দিন সমাগত। ভাগীরথী খাত পরিবর্তন করছে। আবহাওয়া বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। মোঘল সম্রাটদের দর্পিত আগ্রাসনের পদধ্বনি নির্ভুল ভাবে শোনা যাচ্ছে। গৌড় দখলে এসেছেন মোঘল প্রতিনিধি মুনিম খাঁ। দায়ুদ খাঁর ছিন্ন শির উপহার হিসেবে পৌঁছে দিয়েছেন দিল্লির দরবারে। গৌড় আর নিরাপদ নয়। তাঁকে এখান থেকে অবিলম্বে চলে যেতে হবে। কিন্তু কোথায়? শুনেছেন শ্রীহরি, লক্ষ্মণ সেন চলে গিয়েছিলেন পূর্ববঙ্গের সোনারগাঁয়ে। পরবর্তীকালে কেশব সেন বাকলাতে চলে যান, বাকলার নাম এখন বাখরগঞ্জ। আর তারও আগে যার নাম ছিল কচুয়া, যেখানে দনুজমর্দন দেব রাজত্ব করতেন। খুবই সমৃধ নগর ছিল। সেও এক ঐশ্বর্যপূর্ণ নগর সেখানে নগর রমণীরা সোনা আর হাতির দাঁতের অলংকার ব্যবহার করেন। এর পাশাপাশি যে বড়ো নগরগুলো আছে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো যশোহর। গৌড়ের যশ হরণ করে যে নগর হয়ে উঠেছে গৌড়ের-ই সমতুল্য এক মহানগর।

মনস্থির করে সেই যশোহরেই চলে এলেন শ্রীহরি। বিশাল জমিদারির পত্তন করলেন। যোড়শ শতাব্দীর প্রায় শেষার্ধে মৃত্যু হলো তাঁর। রাজত্বভার নিলেন প্রতাপাদিত্য রায়।

প্রকৃতই প্রতাপান্বিত ছিলেন প্রতাপাদিত্য রায়। শ্রীহরি যশোহরে অবস্থান করেও মূল শাসন কেন্দ্র সরিয়ে নিয়েছিলেন যমুনা ও ইছামতীর সঙ্গমস্থলে ধূমঘাট থেকে কিছু দূরে মুকুন্দপুরে। হেনরি বেভারিজ, সতীশচন্দ্র মিত্রের লেখায় এর সমর্থন আছে। সেখানকার দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখে তাঁরা এই সিধান্তে আসেন। ধূমঘাটের দশ মাইল দূরে এই মুকুন্দপুরের মধ্যবর্তী স্থানগুলি ক্রমে জনপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং সমগ্র জায়গাটিই যশোহর নামে পরিচিতি পায়।

১৬০০ সালে জেসুইট পাদরি ফনসেকা বাকলা থেকে নৌকোয় করে সুন্দরবন হয়ে যশোহরে আসেন। সেখানে তখন প্রতাপশালী প্রতাপাদিত্য। পর্তুগীজ জলদস্যুদের উৎপাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য তিনি পর্তুগীজদেরকেই নিজ শাসন কাজে নিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু এর ফলে দাঙ্গা শুরু হয় পর্তুগীজ এবং আফগানদের মধ্যে। কেননা গৌড় থেকে আফগানরা এই সময় অনেকেই যশোহরে চলে আসেন। এই সংঘর্ষ দমনে হস্তক্ষেপ করেন জেসুইট পাদরিরা। প্রতাপাদিত্যের আনুকূল্যে তাঁরা যশোহরে একটি গীর্জাও বানায়। এবং

গীর্জার ব্যয়ভার লাঘবের জন্য জমির পাট্টাও দি'য় ছিলেন তাঁদের। প্রতাপাদিত্য সব ধর্মের প্রতি শ্রধাবান ছিলেন এমন অনুমান করা চলে, কেননা তিনি বৈষ্ণবদের মন্দির নির্মাণেও সহায়তা করেন। তাছাড়া যশোরেশ্বরী কালীতে ভক্তিমান তো ছিলেনই। কবি ভারতচন্দ্র তাঁকে 'বরপুত্র ভবানী'-র বলে উল্লেখও করেছেন।

ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায় সাগরদ্বীপকে প্রতাপাদিত্যের রাজধানী বলে বর্ণনা দিয়েছেন। যদিও সতীশচন্দ্র মিত্র প্রমুখের অনুসন্ধান জানিয়েছে ধূমঘাট-ই তাঁর রাজধানী ছিল যা যশোহরেরই অংশ বিশেষ। সতীশচন্দ্র মিত্র দুর্গের পাঁচিল বুরুজের ধ্বংসাবশেষ দেখেছিলেন বিংশ শতাব্দীতেও। এর কাছেই বিখ্যাত যশোরেশ্বরীর মন্দির। দুর্গের পূর্বদিকে রাজবাড়ির অংশ। প্রাসাদ চত্বরের ভেতরে দিঘি। মন্দিরের পাশে যে ধ্বংসাবশেষ তাকে হাবশিখানা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তিনি। যা নাকি স্নানঘর হিসেবে ব্যবহৃত হতো। হামামের কাছে রয়েছে টেঙ্গা মসজিদ। মসজিদের উত্তরে অষ্টকোণী বাড়ি যা হিন্দুমতে লক্ষ্মী মন্দির, মুসলমানরা বলেন মহিলাদের প্রার্থনাস্থল। বিভিন্ন দেশের আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য প্রতাপাদিত্য দক্ষিণদিকে দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন, মোঘলরা প্রবেশ করেন উত্তরদিক থেকে।

ফলত প্রতাপাদিত্য যশোচিত সংগ্রাম করা সত্ত্বেও পরাজিত হন। ক্রমে যশোহরের যশ বিলীন হতে থাকে। ষোড়শ শতাব্দীতে মোঘলরা দুর্বার হয়ে ওঠে, গড়ে ওঠে নতুন রাজধানী ঢাকা।

আমি যশোহরে পা রাখি ঝিনাইদহ থেকে বাসে এসে। বগুড়া থেকে ট্রেনে সান্তাহার হয়ে ঝিনাইদা যেতে হয়েছিল সহযাত্রী নীহার ঘোষের পিতৃভূমি দেখার উদ্দেশ্যে। তার আগে দেখে এসেছি কুশুম্বি, আমার পিতৃভূমি। পাল সম্রাট রামপালের রাজ্যপুনরুধারে সেখানকার অধিপতি দ্বোপরবর্ধন সহায়তা করেছিলেন। ইতিহাসের এক একটি অধ্যায় যেন অতিক্রম করে চলেছি। বাংলার ইতিহাসের এক একটি পর্ব যেন দ্রুত পৃষ্ঠা উল্টে চলেছে। বাংলায় হারানো গৌরবের কাহিনি যেন শুনিয়ে যাচ্ছে চিরপ্রবাহিত বাতাস, সে বাতাসে মিশে আছে ভারি অদ্ভুত এক কিংবদন্তির গল্প। ওই যে যশোরেশ্বরী আজ পশ্চিমাস্যা কালিকা মূর্তি হয়ে বিরাজমানা, তার কারণ নাকি অসীম প্রতাপী আদিত্যসম তেজী সম্রাট শিবানন্দ গুহের পৌত্র গোপীনাথ গুহ ওরফে প্রতাপাদিত্যের মূঢ়তার অন্যায় দেখে। কি সেই অন্যায়? কাহিনি জানায়, ওই ধ্বস্ত ধূমঘাট দুর্গের ভেতর থেকে যে খাল বেরিয়ে এসে কামারখালি নামে এক বড়ো খালের সঙ্গে মিশেছে সেখানে একদিন প্রতাপাদিত্যের মহিষী শরৎকুমারী আত্মবিসর্জন দিয়েছিলেন দুরন্ত ক্ষোভে, দুঃসহ লজ্জায়।

রাজা হবার পর একবার কল্পতরু হয়েছিলেন প্রতাপাদিত্য। যে যা চাইবে তাকে তাই দেবেন এই প্রতিজ্ঞায় নিজের স্ত্রীকেও এক ব্রাহ্মণের হাতে তুলে দিয়েছিলেন অকাতরে প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থে। নিতান্ত কৌতুকের বশেই হয়ত প্রতাপাদিত্যের সংকল্পের সততা পরীক্ষা করতে গিয়ে শরৎকুমারীকে দান হিসেবে চেয়েছিলেন সেই ব্রাহ্মণ। প্রতাপাদিত্যের অহংকার তা বোঝেনি। কিন্তু বিব্রত হন স্বয়ং ব্রাহ্মণই। তিনি ফিরিয়ে দেন শরৎকুমারীকে। অর্থমূল্য গ্রহণ করে সেও প্রতাপাদিত্যের জেদের কাছে পরাস্ত হয়ে। কিন্তু নিদারুণ এই অপমানে খুবই মর্মাহত হন শরৎকুমারী। বুঝে উঠতে পারেন না প্রতাপাদিত্যের চরিত্র কি ধাতুতে তৈরি। পিতৃব্য বসন্ত রায়কে হত্যা করেছেন প্রতাপাদিত্য। অবশেষে মোঘল সুবেদার

ইসলাম খাঁর সেনাপতি নায়েৎ খাঁ যখন ধূমঘাট দুর্গ আক্রমণ করেন তখন প্রতাপাদিত্যের প্রতাপ মুহূর্তেই ধুলিসাৎ কেন যে হলো তাও বোধগম্য হয় না শরৎকুমারীর। দুর্গের অভ্যন্তরে বিষণ্ণ চিন্তিত প্রতাপের কাছে এসে দাঁড়ান শরৎকুমারী। প্রতাপাদিত্য সহসা বলেন, আর নয় এবার যাত্রা করা দরকার। ভেবেছিলেন শরৎকুমারী, নতুন আশায় উদ্দীপ্তও হয়েছিলেন, এবার বোধহয় আবার ঝলসে উঠবে প্রতাপের তরবারি। কিন্তু না সমস্ত আশার আলোকে একটি ভয়ংকর পরিণামের আগাম বার্তায় নিভিয়ে দিলেন প্রতাপ। তিনি মোঘল শিবিরে যাবেন আত্মসমর্পন করতে।

বজ্রাহতের মতো স্তম্ভিত হলেন শরৎকুমারী। পদপ্রান্তে অনুরোধ অনুনয় রাখলেন শেষবারের মতো। কোনো কথাতেই কর্ণপাত না করে ধূমঘাট দুর্গ থেকে মোঘল শিবিরের দিকে পা বাড়ালেন প্রতাপাদিত্য।

তাই লজ্জায় গ্লানিতে প্রতাপের এই দীনহীন অপমানের বেদনা সহ্য করতে না পেরে ধূমঘাট দুর্গ থেকে এই গুপ্তখাল দিয়ে বেরিয়ে এসে কামারখালি খালে নৌকো দাঁড় করালেন। প্রণাম করলেন যশোরেশ্বরীকে। তারপর সমস্ত পরাজয়ের কালিমা ধুয়ে মুছে দিতে নিজের হাতেই নৌকো ডুবিয়ে মরণ বরণ করলেন। ওই সেই খাল, লোক মুখে আজও যা শরৎকুমারী দহ নামে পরিচিত।

ধূমঘাটের দুর্গের চূর্ণ অবশেষে ক্রমে মাটির গর্ভে হারিয়ে যাবে একদিন। শুধু জেগে থাকবেন যশোরেশ্বরী কালের এই বিচিত্র ঘটনার সাক্ষী হয়ে।

আর সেইসব ঘটনার স্মৃতি মনে রেখে যশোহরে আসবেন আমার মতো পর্যটকেরা।

আহা মরি 'স্বদেশ' কি সুধা-মাখা নাম
মনে হয় তার কাছে তুচ্ছ স্বর্গধাম।
—মনোমোহন বসু

প্রিয়ঙ্গু

দশম-একাদশ শতকের দণ্ডভুক্তির কম্বোজ-রাজদের রাজধানী প্রিয়ঙ্গু নগরীর কোনো অস্তিত্বই আজ নেই। তার অবস্থিতি মেদিনীপুর বা হুগলিতে ছিল কিনা তা সঠিকভাবে কিছুই বলা যায় না।

দণ্ডভুক্তি

তবে পশ্চিম-দক্ষিণবঙ্গের অন্যতম বৃহৎ নগর দণ্ডভুক্তি যে মেদিনীপুর জেলার দাঁতন শহর— এ বিষয়ে কোনো সংশয় নেই। প্রিয়ঙ্গু কি এর কাছাকাছি কোথাও ছিল? সপ্তম শতকে দণ্ডভুক্তি গৌড়রাজ শশাঙ্কের অধীনে ছিল। শশাঙ্কের মেদিনীপুর লিপি জানিয়েছে, দণ্ডভুক্তি দেশ সামন্তরাজ সোমদত্ত এবং মহাপ্রতীহার শুভকীর্তির দ্বারা শাসিত হত। উৎকলও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইর্দা লিপি জানায়, দণ্ডভুক্তিমণ্ডল বর্ধমান ভুক্তির অন্তর্গত। আবার একাদশ শতকে রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয় লিপি বলে, 'তণ্ডবুত্তি' একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন ভূখণ্ড। যদিও দ্বাদশ শতকে তা আবার বর্ধমান ভুক্তির অন্তর্গত হয়। এখানকার রাজা পাল সম্রাট রামপালের বন্ধু ছিলেন।

বর্ধমান

জৈন কল্পসূত্র, সোমদেবের কথাসরিৎসাগর বা বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় যে প্রাচীন বর্ধমান নগরের উল্লেখ পাওয়া যায়—আধুনিক বর্ধমান শহরের সঙ্গে তার যোগাযোগটা হয়তো আত্মিক, কিন্তু শারীরিক অস্তিত্বের দিক থেকে এই বর্ধমান ততটা প্রাচীন নয়। তবু বর্ধমান শহরে যখন পথ হাঁটি তখন প্রাচীন বর্ধমানের অনেক স্মৃতিই মনকে আপ্লুত করে। এই বর্ধমানের কাছে নিকটবর্তী পানাগড়ের ভরতপুরে পাণ্ডুরাজার ঢিবি খুঁড়ে বেরিয়েছে বহু প্রত্নসম্পদ। এই বর্ধমানকেই 'বসুধার অলঙ্কার' বলে বর্ণনা করেছিলেন সোমদেব। জৈনতীর্থঙ্কর মহাবীর একদা এখানে কিছুকাল বাস করেছেন, তখন এর নাম ছিল অস্থিকনগর। কিন্তু এই নামের চেয়ে বর্ধমান নামই বিভিন্ন শিলালেখতে বারংবার উল্লেখিত হয়েছে। পরবর্তীকালে আধুনিক বর্ধমানকে ঘিরে মোঘল সম্রাটদের বিজয় অভিযান, শের আফগানের সমাধি, বর্ধমান মহারাজাদের কীর্তি, বিষ্ণুপুর রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক ইত্যাদি

ইতিহাসের ধারাকে বিচিত্রমুখী করেছে। বর্ধমানের মাটিতে রয়েছে বহু যুগের ইতিহাসের বহু অধ্যায়। ষষ্ঠ শতকের মল্লসারুল লিপি, দশম শতকের ইর্দা লিপি, দ্বাদশ শতকের নৈহাটি লিপিতে বর্ধমান ভুক্তির রাজধানী. হিসেবে বর্ধমানের নাম আছে। আবার নবম শতকের কান্তিদেবের চট্টগ্রাম লিপিতেও হরিকেল মণ্ডলের অন্তবর্তী আর এক বর্ধমানপুরের নাম আছে—যেখানে ছিল কান্তিদেবের রাজধানী। কিন্তু সে বর্ধমান পূর্ববঙ্গে।

হরিকেল

এই হরিকেল সম্বন্ধে হেমচন্দ্র তাঁর অভিধান চিন্তামণিতে লিখেছেন—'চম্পাস্তু অঙ্গা বঙ্গাস্তু হরিকেলিয়াঃ।' অর্থাৎ বঙ্গ হবিকেল একই জনপদ। দ্বাদশ শতকের এই বিবৃতির আগে অষ্টম শতকের 'আর্যমঞ্জুশ্রী মূলকল্প' গ্রন্থে বঙ্গ, সমতট, হরিকেলকে তিনটি প্রতিবেশী জনপদ বলা হয়েছে। আবার পঞ্চদশ শতকের রূপচিন্তামণি কোয-এ শ্রীহট্ট ও হরিকেলকে একই জনপদ এবং সমর্থক বলে চিহ্নিত হয়েছে। আসলে সপ্তম শতক থেকে একাদশ শতক পর্যন্ত হরিকেল— বঙ্গ এবং সমতট সংলগ্ন ছিল। এটি একটি স্বাতন্ত্র রাজ্য এবং এর বিস্তৃতি শ্রীহট্ট পর্যন্ত ছিল, পরে তা বঙ্গের অন্তর্গত হয়।

বঙ্গ

এখন এই বঙ্গের অবস্থিতি কোথায়?

সাধারণভাবে এখনও একদা অখণ্ড বাংলাকে 'বঙ্গ' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে উত্তরবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ ইত্যাদি অঞ্চল বিভাজনের রাজনৈতিক জটিলতায় বিভ্রান্ত সাধারণ মানুষ সঠিকভাবে কখনোই বুঝে উঠতে পারে না প্রকৃতপক্ষে 'বঙ্গ' বলতে প্রাচীনকাল থেকে কোন্ অঞ্চলটিকে চিহ্নিত করা হতো।

এমনকি এই বিভ্রান্তির জটিলতা এমন বিচিত্র-সম্ভব অজ্ঞতাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে যে, পশ্চিমবঙ্গের অনেক বনেদী বাসিন্দা আজো বলেন, পূর্ববঙ্গের অধিবাসীরা 'বাঙাল' এবং পশ্চিমবঙ্গের মানুষ 'বাঙালি'। আবার এপার বাংলার অধিবাসীরাই শুধু বাঙালি —এ ধারণাটাও অসম্পূর্ণ। জন্মসূত্রে এপার-ওপার দু'পার বাংলার মানুষই বাঙালি। যদিও ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক সূত্র জানায় প্রাচীনকালের 'বঙ্গ' প্রকৃতপক্ষে আজকের 'বাংলাদেশ'কেই চিহ্নিত করত—বাংলার অপর অংশগুলো পুণ্ড্র, বরেন্দ্র, রাঢ়, গৌড়, সমতট ইত্যাদি বিভিন্ন যুগে নানা নামে পরিচিত ছিল।

ঐতরেয় আরণ্যকের একটি শ্লোক, 'বয়াংসি বঙ্গাবগধা-শ্চেরপাদাঃ'—একথা জানায় যে, বঙ্গ মগধের (বগধ) পার্শ্ববর্তী রাজ্য। বোধায়ণ ধর্মসূত্র কলিঙ্গের প্রতিবেশী বলেছে বঙ্গকে—যা আর্যসংস্কৃতি বহির্ভূত রাজ্য এবং সে দেশে গেলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। মহাভারতের আদিপর্বে এবং রামায়ণে উল্লেখ আছে বঙ্গের। সিংহলী মহাবংশে লাল বা রাঢ়ের মানুষদের সঙ্গে 'বঙ্গ' জনপদের উল্লেখ আছে। এত উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও সঠিকভাবে বঙ্গের অবস্থিতি কোথায় এ নিয়ে মতবিরোধ থেকেই গিয়েছিল। গুপ্তযুগে পাওয়া গেল বঙ্গের দুটি বিভাগের নাম—বঙ্গ ও পুণ্ড্র—একটি ঢাকা-ফরিদপুর অঞ্চল এবং অপরটি উত্তর-পশ্চিম মণ্ডল। পাল ও সেনযুগে 'বঙ্গ' বিভিন্ন প্রশস্তিতে, লিপিতে বারংবার উচ্চারিত হয়েছে। সেনরাজাদের সময় বঙ্গ বিক্রমপুর পরগনা এবং ফবিদপুর-বাখরগঞ্জ নিয়ে ছিল 'বঙ্গ', সেনযুগে যার জয়স্কন্ধাবার বা রাজধানী ছিল বিক্রমপুর।

মদনাবতী

ইতিহাস রচয়িতারা এমনই নারব মালদহের মদনাবতী গ্রামটি সম্পর্কেও। অথচ অনেকের অনুমান রামাবতী যেমন সম্রাট রামপালের নামের স্মৃতি জড়িত, মদনাবতী তেমনিই মদনপালের স্মৃতিবাহী। মালদা শহরের প্রায় ৩২ মাইল উত্তর-পশ্চিম দিনাজপুরের সীমানার কাছে এর অবস্থিতি। উনবিংশ শতাব্দীতে এখানে উইলিয়াম কেরী এবং রামরাম বসু দীর্ঘদিন বাস করেছেন এবং প্রথম ছাপাখানা তৈরির পরিকল্পনা করেন। কেরী সাহেব এখানে একটি স্কুলও স্থাপন করেন—যা বাংলায় ইউরোপীয় ধারায় দ্বিতীয় স্কুল। ১৭৯৪ থেকে ১৭৯৯ সাল পর্যন্ত ছিল তাঁর অবস্থানের সময়। এরপর তিনি শ্রীরামপুর চলে যান। ময়নাবতী বঞ্চিত হয় প্রথম ছাপাখানা স্থাপিত হবার গৌরব থেকে। এছাড়া অনেকের মতে, এই স্থান পাল-সম্রাট মদনপালের স্মৃতি-বিজরিত। তাদের মতে, রামপালের স্ত্রী অর্থাৎ মদনপালের মায়ের নামানুসারেই এর স্থাননাম। জেলার প্রাচীনতম শিবমন্দিরটি এখানেই রয়েছে। এর নাম ভীমডাঙ্গির বা ভীমতোস্থের শিব। আর রয়েছে কেরীর স্মৃতিবাহক নীলকুঠিরের ধ্বংসাবশেষ। অতীতের সৌরভই এখন এখানকার ঐশ্চর্য।

বিজয়নগব

সেন রাজবংশের সম্রাট বিজয়সেন যে নগরের পত্তন করে সাময়িকভাবে রাজধানী স্থাপন করেন, তার নাম দেন বিজয়নগর। এই বিজয়নগর সঠিক কোথায় তা নিয়ে সংশয় আছে। কেউ বলেন তা নদিয়া জেলায়, কেউ বলেন উত্তর-চব্বিশ পরগণার বীজপুর, কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন বাংলাদেশের রাজসাহী শহরের সাত মাইল পশ্চিমে গোদাগরী থানার দেওপাড়া বা দেবনগর গ্রামের অদূরে বিজয়নগর গ্রামটিই প্রাচীন বিজয়নগর। অসংখ্য প্রত্ন-নিদর্শন এমন মতের সমর্থক হিসেবে আজও ছড়িয়ে আছে দেবপাড়া এবং সংলগ্ন বিজয়নগরে। অট্টালিকা-প্রাসাদ-মন্দির-মূর্তি-দিঘিতে পূর্ণ জনপদটি আর একটি প্রমাণ ইতিহাসের হাতে তুলে দিয়েছে—সেটি হলো বিজয় সেনের দেওপাড়া প্রশস্তি লিপি। এই লিপিতে প্রদ্যুম্নেশ্বর মন্দিরের কথা উল্লেখ রয়েছে।

চম্পা

আর ঐ যে বর্ধমান-বাঁকুড়া সীমানায় দামোদর নদের ধারে চম্পা গ্রাম, অনেকের অনুমান প্রাচীন গ্রন্থে উল্লিখিত চম্পা নগরীরই ভগ্নাবশেষ সেটি। এখানো স্থানীয় অধিবাসীরা উঁচু কিছু ঢিবি দেখিয়ে বলেন এখানেই ছিল চাঁদ সওদাগরের বাড়ি। কিছু মূর্তিও আছে।

সিংহপুর/সিঙ্গুব

একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়—কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতার এই পংক্তিতে যে বিজয়-এর উল্লেখ আছে সেই বিজয় সিংহের রাজধানী ছিল সিংহপুর। সন্দেহ নেই, বিজয় সিংহ প্রবল পরাক্রমী রণ-নিপুণ এক রাজ্যশাসক ছিলেন, সুদুর লঙ্কা অভিযানেও যিনি সফলতা অর্জন করেছিলেন। এখনও কথিত আছে যে, তাঁরই নামে লঙ্কার নাম হয় সিংহল।

বিজয় সিংহেব রাজধানী ছিল সিংহপুর, ইতিহাসবিদ্‌দের অনুমান, তার অবস্থান ছিল হুগলি জেলার সিঙ্গুরে, যে সিঙ্গুর ভিন্ন কারণে এখন খ্যাতনামা। প্রধান ইতিহাস মুখ লুকিয়েছে ঘটমান বর্তমানের ঘনঘটায়!

হরিপাল

হুগলি জেলারই কবিরামের 'দিগ্বিজয় প্রকাশ' গ্রন্থের প্রশস্তিতে 'হরিপালো মহাগ্রাম হট্টবাপী সমন্বিত' বলে চিহ্নিত হয়েছে হরিপাল। এই নগরের পাশ দিয়ে একদা বয়ে যেত কৌশিকী নদী যা আজ স্রোতহারা। শুধু স্মৃতিধারার ওই নদী আজ হরিপাল নামের এক রাজার কন্যা কুমারী কানেড়াকে ঘিরে কিংবদন্তির গল্প নিয়ে বয়ে চলেছে। ইতিহাসের একটি ক্ষীণধারাও সংযোজিত হয়েছে তার সঙ্গে। প্রতাপী গৌড়েশ্বর বিশাল বাহিনী নিয়ে বলদর্পে এগিয়ে আসছেন হরিপালের দিকে। ধর্মমঙ্গল জানিয়েছে, এই গৌড়েশ্বর হলেন ধর্মপাল। বৃধ্ব হয়েছেন তিনি, কিন্তু গৌড়ের রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুরে শতপুষ্পের সমাহার হলেও আর একটি অনাঘ্রাত কুসুম চয়নে উদগ্র বাসনা তাঁকে তাড়িত করেছে হরিপালের দিকে। শুনেছেন তিনি, হরিপাল কন্যা কানেড়ার সৌন্দর্য অপ্সরার রূপের চেয়েও সমধিক। হরিপালের কাছে দূত মারফৎ বিবাহের প্রস্তাব পাঠিয়ে ছিলেন ধর্মপাল। হরিপাল সম্মত হলেও নির্দ্বিধায় সেই দূতকে ফিরিয়ে দিয়েছেন কুমারী কানেড়া। বৃধ্ব গৌড়েশ্বরের কামনার ইন্ধন জোগাতে তিনি রাজী নন। আর তাই সামান্য এক মণ্ডলাধিপতির কন্যার দুর্মর স্পর্ধা বাহুবলে দমন করতেই গৌড়েশ্বরের এই সশস্ত্র অভিযান।

ইতিহাসে এ ঘটনার কোনো উল্লেখ নেই। কিন্তু মানিক গাঙ্গুলি আর ঘনরাম চক্রবর্তীর কবি কল্পনা এই ঘটনার এক চমৎকার ছবি এঁকেছেন তাঁদের কাব্যগাথায়। নিশ্চিত সিধ্বান্তে এসেছেন কুমারী কানেড়া তাঁর এই দেহকে কিছুতেই বৃধ্বের কামনার স্পর্শে কলুষিত হতে দেবেন না। না, কৌশিকীর গভীরেও আত্মগোপন করবেন না তিনি। সুতীক্ষ্ণ তরবারির আঘাতই হানবেন তিনি এই কামনার শরীরে। রাজা হরিপাল আসন্ন সর্বনাশের শঙ্কায় মৃয়মান। বলাধ্যক্ষ আত্মহত্যা করেছেন। তবু কানেড়ার দৃপ্ত আহ্বানে রণসাজে সজ্জিত হয়েছে হরিপালের সৈন্যবাহিনী। মুক্ত তরবারি হাতে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে সসৈন্য ঝাঁপিয়ে পড়লেন কানেড়া গৌড়েশ্বর বাহিনীর ওপর। না, গৌড়েশ্বর আসেন নি, সৈন্যদল পরিচালনা করছেন তরুন এক সেনাপতি। অগ্নিশিখার মতো কানেড়ার হাতের তরবারি সেই তরুণ সেনাপতির অস্ত্রাঘাতে ভূলুণ্ঠিত হল। কুমারী কানেড়ার বিস্ময় এক মুগ্ধতার আবেশে যেন বিহ্বল হয়ে উঠল। না, কোনো খেদ নেই। যদি ওই তরুণ নায়ক তাঁকে হত্যাও করেন তবুও তা হবে বৃধ্ব গৌড়েশ্বরের কামনার হাত এড়িয়ে সগর্ব মৃত্যু। আর যদি ওই তরুণের চোখেও ফুটে ওঠে মুগ্ধতার আবেশ! কল্পনা করতে গিয়ে শিহরিত হন কানেড়া। কিন্তু সেনাপতির কণ্ঠে তো নেই প্রেমাভিলাষের কোনো অভিব্যক্তি। বরং কঠিন এবং কঠোর এক আদেশে মুহূর্তের মধ্যে তার হাতে পরিয়ে দিয়েছে শৃঙ্খল। অধিকৃত রাজপ্রাসাদে তাঁকে বন্দি করে তরুণ সেনানায়ক, রেখেছেন সৈন্য শিবিরের কাছে বন্দিপুরে। আর কোনো উপায় নেই, এমনকি কৌশিকার জলে আত্মবিসর্জনের সুযোগও নেই। এবার কামনালোলুপ ওই বৃধ্বের হাতে চিরকালের মতো বন্দি হওয়াই বুঝি তাঁর নিয়তি!

বিনিদ্র রত কাটে তাঁর। অতি প্রত্যুষে আসেন গৌড়েশ্বরের এক অনুচর। সেনাপতি লাউসেন তাঁকে আহ্বান জানিয়েছেন। কিসের আহ্বান! সন্দেহ প্রত্যাশায় অধীরচিত্তে কানেড়া অনুসরণ করলেন অনুচরের। রাজাপ্রাসাদে নয়, রাজা হরিপালেরই চিত্রশালায় তাঁকে নিয়ে এলেন সেই অনুচর। কিন্তু একি! ভবনদ্বারে মঙ্গল কলস কেন? পুষ্প পল্লবের সজ্জাই বা কিসের সম্ভাবনার সৌরভ ছড়িয়ে দিচ্ছে বাতাসে! বিভ্রান্ত মনে চিত্রশালায় প্রবেশ করেন কানেড়া আর সমস্ত শঙ্কা এক অনাস্বাদিত পূর্ব বিস্ময়ের আঘাতে যেন থমকে দাঁড়াতে বাধ্য করে তাঁকে। চিত্রশালায় রক্ষিত তাঁরই এক প্রতিকৃতির গলায় নিবিড় আলিঙ্গনের আভাস এনে দুলছে এক রক্তপলাশের মালা!

এগিয়ে এলেন রূপবান তরুণ সেনানায়ক লাউসেন। বন্দিনীকে এবার বন্দি করলেন দৃঢ় আলিঙ্গনে। হরিপালের আকাশ-বাতাস মুখর হয়ে উঠল দুটি প্রেমিক হৃদয়ের বন্দনা আর অভিনন্দনে।

নবম শতাব্দীর এই ঘটনায় কোনো চিহ্ন আজ আর নেই। শুধু হরিপালের নিকটবর্তী চিত্রশালা আর বন্দিপুর নামের দুটি গ্রাম এই কিংবদন্তি গল্পের সমর্থনে আজও দাঁড়িয়ে আছে।

কৌশিকীর স্রোতধারা আজ নেই, আছে শুধু স্মৃতিধারা!

আটঘরা

অবস্থান দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বারুইপুর স্টেশনে নেমে অটোয় দশ মিনিট। জনশ্রুতি, এখানেই মহাভারতের জতুগৃহ দাহ হয়েছিল। মাটির রং কালো অনেক জায়গায়। ইতিহাসের বহু উপকরণ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এখানে। এর নিকটেই রয়েছে আর এক প্রাচীন বন্দর হরিনারায়ণপুর।

সমতট

লুপ্তপ্রায় প্রাচীন সমতট নগর ছিল খড়্গ রাজাদের রাজধানী। দেবখড়্গের আস্রফপুর লিপিতে জয়কর্মান্ত শাসক নামে যে নগরের উল্লেখ রয়েছে কারও কারও অনুমান বর্তমান ত্রিপুরার বড়োকামতা গ্রামই সেই নগর। হিউ-এন-সাঙের বিবরণীতেও এর উল্লেখ রয়েছে। সমতট একসময় বঙ্গের একটি বিভাগ হিসিবেও পরিচিত ছিল।

চন্দ্রহার /ছান্দাব

বাঁকুড়া-বর্ধমান ভায়া সোনামুখি যে বাস রাস্তা, তার পাশেই বেলিয়াতোড়েই পরেই ছান্দার। মল্লরাজাদের আমলে শীতলমল্ল নামধারী এক অঞ্চলিক শাসনকর্তা এখানে থাকতেন। অবশ্য মল্লপর্বের আগেও মধ্যযুগের অনেক নিদর্শন আজও ছান্দার নিজের বুকে ধরে রেখেছে। বাঁকুড়ার ছান্দার গ্রামের উত্তর-পূর্বে যে বোধপুকুর আছে—স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস, এর নিচে আছে মনসাদেবীর মন্দির এবং সুড়ঙ্গ পথ যা সরাসরি চম্পার সঙ্গে যুক্ত। এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে একটি লোককাহিনিও প্রচলিত আছে।

বহুকাল আগে ঐ বোধপুকুরেরই নিকটবর্তী এক গ্রামের লাহা পরিবারের জনৈক ব্যক্তি বাঁকুড়া সোনামুখীর পথ ধরে ব্যাবসার জন্য যাত্রা পথে ঐ পুকুরের ধারে বিশ্রামার্থে আসেন। তখন জল থেকে এক লোহার শিকল উঠে এসে তাঁকে টেনে নিয়ে যায় পুকুরের ভেতর এবং সেখানে তিনি মনসীদেবীর মন্দির দেখেন। তারপর সাতদিন পর ফিরে আসেন।

দেবীর নিষেধ সত্ত্বেও এ কাহিনি জনসমক্ষে বলার অপরাধে তাঁর মৃত্যু হয়। দেবীর ভক্তরা অপেক্ষা করেন, জলে চম্পাই নগর থেকে দেবীর ঘাট ভেসে এলে সেটা মাথায় নিয়ে এসে রাখেন ছান্দারের মনসামন্দিরে। ছান্দারে তখন রাজত্ব করতেন মল্লরা। তাদের আমলের *এক রাজা শীতলমল্ল। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের ঘাটোয়াল। সীমান্ত* রক্ষী। স্থানীয় বেসিক ট্রেনিং কলেজ তৈরির সময় পাওয়া গেছে দেবীর মূর্তি। এখানকার জাম্বুলীদেবীর স্থান মাদানা থান প্রমাণ করে বৌদ্ধধর্মের একদা অস্তিত্ব।

ওই বোধপুকুরও বোধহয় বৌদ্ধদের স্মৃতিবাহী। কোনো কোনো স্থানে বাড়ি তৈরির সময় পাওয়া গেছে প্রাচীনকালের কিছু পোড়ামাটির নিদর্শন। পার্শ্ববর্তী গ্রাম কাদাকুলিতে আছে বড়ো একটি গোল-পাথর। স্থানীয় গল্প বলে, ওটাতে বসে নাকি রানি স্নান করতেন। কাছেই আছে রানি-সায়র। ইতিহাসের অনুমান পাথরটি কোনো মন্দিরের অবশিষ্টাংশ। শীতলমল্ল জলসেচের সুবিধার্থে সাতটি সায়র খনন করেছিলেন। শঙ্খ সায়র, রানি সায়র, সপ্তঘাট, ইন্দ্রভঙ্গ ইত্যাদি সায়রগুলি চন্দ্রহার মালার মতো বেষ্টনি ছিল বলে স্থানটির নাম হয় চন্দ্রহার। তার-ই অপভ্রংশ ছান্দার। আবার কেউ কেউ বলেন, বিষ্ণুপুর রাজাদের সভার ছন্দকারেরা এখানে থাকতো বলে জায়গাটির নাম ছান্দার। অনেকের মতে, আদিশূর বাংলায় যে পঞ্চ-ব্রাহ্মণকে এনেছিলেন তার মধ্যে ছান্দড় গোত্রের ব্রাহ্মণেরা এখানে থাকতেন বলে ছান্দার নামকরণ। আবার কারো মতে চাঁদা বাউরি নামে আদিকালে এখানে যিনি আধিপত্য বিস্তার করে থাকতেন, তার নামে চাঁদার গ্রাম থেকেই ছান্দার কথাটির উৎপত্তি। এর মধ্যে কোন্‌টি সঠিক তা এখনও সঠিকভাবে জানা যায় নি।

তবে প্রত্নসাক্ষ্য থেকে একথা বলা চলে, ছান্দার অঞ্চলে একদা বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ছিল। এগুলি জম্বুলি থান বা মহাদান থান বা মাদানা থান নামে পরিচিত। এইসব অতীত-স্মৃতি বুকে ধরেই রেখে কালের প্রহর গুণে চলেছে ছান্দার।

ছান্দার আজ গ্রামমাত্র। ঠিক যেমন গৌড়, কর্ণসুবর্ণ, বাণগড়, মহাস্থানগড় —এমন অনেক রাজধানী।

সব রাজধানী কি একদিন গ্রাম হয়ে যায়? নাকি অনেক গ্রামও একদিন রাজধানী হয়ে ওঠে! যেমন কলকাতা। সুতানটী-গোবিন্দপুর-কলকাতা গ্রামই তো একদিন সমগ্র ভারতেরই রাজধানী হয়ে উঠেছিল। সেই গৌরব আজ বিলুপ্ত। তবু কলকাতা এখন পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী। অনন্য তার পথচলা। অতীত, বর্তমান এবং সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ নিয়ে আজও সে প্রাণবন্ত। তাই এর ইতিহাস ও গ্রন্থের বিষয় নয়।

সে তো আর বিলুপ্ত রাজধানী নয়।

বর্ণানুক্রমিক সূচি

ভ

ম

য

র

ল

শ

স

হ

সহায়ক গ্রন্থসমূহ

বাঙ্গালার ইতিহাস — রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
বাঙ্গালার ইতিহাস — ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার
বাঙালীর ইতিহাস — ডঃ নীহাররঞ্জন রায়
বৃহৎ বঙ্গ — দীনেশচন্দ্র সেন
গৌড় রাজমালা — রমাপ্রসাদ চন্দ
বাংলায় ভ্রমণ — রেলওয়ে বোর্ড প্রকাশিত
বাঁকুড়ার পুরাকীর্তি — অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
বাঁকুড়ার মন্দির — অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
জেলা গেজেটিয়ার — বাঁকুড়া, মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর
বাঙ্গালার ইতিহাস (অষ্টাদশ শতাব্দী) নবাবী আমল — কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়
বাংলা ইতিহাসে দুশো বছর (স্বাধীন সুলতানদের আমল) — সুখময় মুখোপাধ্যায়
বাঙালীর ইতিহাস — কমল মজুমদার
মেময়ার্স অব্ গৌড় অ্যান্ড পাণ্ডুয়া — আবিদ আলী
কয়েন্স ফ্রম চন্দ্রকেতুগড় — গৌরীশঙ্কর দে
সায়াহ্নে নবাব মসনদ — অরুণ ভট্টাচার্য
কিংবদন্তীর দেশে — সুবোধ ঘোষ
পশ্চিম রাঢ় তথা বাঁকুড়ার সংস্কৃতি — মানিকলাল সিংহ
হুগলি জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ — সুধীরকুমার মিত্র
পশ্চিবঙ্গের সংস্কৃতি — বিনয় ঘোষ
মালদহ প্রদর্শিকা — ডঃ ফণী পাল
শ্রীচৈতন্য ভাগবত বিচিত্রা — কমলেন্দু চক্রবর্তী
চন্দ্রহার — শ্রীমানিকচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
পুষ্করণা — শ্রীসুজয় ঘোষাল
প্রাচীন মুর্শিদাবাদ—কর্ণসুবর্ণ ও মহীপাল — বিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
মধ্যযুগের ভারতীয় শহর — অনিরুদ্ধ রায়
প্রসঙ্গ : শহর মুর্শিদাবাদ — ডঃ রমাপ্রসাদ পাল
মহাস্থানগড়ের ইতিহাস ও সুলতান সাহেবের জীবনী — তবিবুর রহমান
ঐতিহাসিক পাহাড়পুর ও সত্যপীরের জীবনী — তবিবুর রহমান
গৌড় ও পাণ্ডুয়া ভ্রমণ সহায়িকা — কৃষ্ণকমল সরকার
কৌশিকী — জানুয়ারি, ১৯৯৫
দি ফ্রেডারিকস্ ট্র্যাভেলস্ — ভলুম-৩
পৌন্ড্রবর্ধন — দেবব্রত মালাকার
কপালকুণ্ডলা — বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা — বাঁকুড়া সংখ্যা